সমাজবিজ্ঞান

দ্বিতীয় পত্র

কোর্স কোডঃ HSC 2859

হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট (এইচএসসি) প্রোগ্রাম

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সমাজবিজ্ঞান

দ্বিতীয় পত্র

কোর্স কোড : HSC2859

হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট (এইচএসসি) প্রোগ্রাম

রচনায়

ড. মাহবুবা নাসরীন
ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন
ড. ইকবাল হুসাইন
ড. মো. আব্দুস সাত্তার
দেবাশীষ কুমার কুণ্ডু
দিলীপ কুমার ঘোষ

সম্পাদনায়

ড. মাহবুবা নাসরীন
ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন

সমন্বয়কারী

ড. ইকবাল হুসাইন
ড. মো. আব্দুস সাত্তার

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সমাজবিজ্ঞান

কোর্স কোড : HSC 2859
এইচএসসি প্রোগ্রাম

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ২০১৮
পুনঃমুদ্রণ : জুন, ২০১৯; ফেব্রুয়ারি, ২০২০; এপ্রিল, ২০২২; জানুয়ারি, ২০২৩; জানুয়ারি, ২০২৪; জুন, ২০২৪
অনলাইন সংস্করণ : জানুয়ারি, ২০২২
পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০২৫
(বাউবি কর্তৃক গঠিত 'বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস বিষয়ক রিভিউ কমিটি'র তত্ত্বাবধানে পরিমার্জিত)

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস

কভার গ্রাফিকস
আবদুল মালেক

কম্পিউটার কম্পোজ
মোঃ শরিফুল ইসলাম

© বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ISBN : 978-984-34-3156-1

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫

মুদ্রণ
বাংলাবাজার প্রেস এন্ড পাবলিকেশন
৫৩, নথব্রুক হল রোড, ঢাকা।

কোর্সবই অনুসরণ করার নির্দেশনা

কোর্স পরিচিতি (Course Overview)

কোর্সের নাম : সমাজবিজ্ঞান (২য়পত্র) **কোর্স কোড : HSC 2859**

জাতীয় জীবনের উন্নয়নে ও গতিশীল জাতি গঠনে শিক্ষার বিকল্প নেই। সুশিক্ষিত জনশক্তি ছাড়া দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা ও প্রাথমিক স্তরের অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে গড়ে তোলা। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত উন্নতি, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, সমকালীন চাহিদা ও পরিবেশগত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়েছে। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক সমাজ ব্যবস্থায় টিকে থাকার জন্য যুগোপযোগী শিক্ষা গ্রহণের বিকল্প নেই। এ বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়ে সমাজবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র বইটি প্রণিত হয়েছে।

দূরশিক্ষণ পদ্ধতির শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে এইচএসসি প্রোগ্রামের স্ব-শিখন পাঠসামগ্রী হিসেবে সমাজবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র বইটি রচিত হয়েছে। দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মূল কথাই হল স্বনির্ভর পাঠ ব্যবস্থাপনা। এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজ দায়িত্বে নিজের সুবিধামতো সময়ে শেখার কাজে নিয়োজিত হন। পাঠসামগ্রী উপস্থাপনার এ পদ্ধতি মড্যুলার পদ্ধতি নামে পরিচিত। এটি একইসাথে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। এতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের প্রত্যক্ষ সহায়তা ছাড়া নিজেই পড়াশোনা করতে পারেন। এ কারণে বইটির বিষয়বস্তু যতদূর সম্ভব নিজে পড়ে বোঝার উপযোগী করে রচনা করা হয়েছে। কোর্সবইটি মোট ১০ টি ইউনিটে বিভক্ত। প্রতিটি ইউনিট আবার কতগুলো পাঠে বিন্যস্ত। প্রতিদিন গড়ে একটি করে পাঠ অধ্যয়ন করলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই কোর্সটি সম্পন্ন হবে।

প্রতি ইউনিটের শুরুতে ভূমিকা এবং পাঠসমূহের শিরোনাম দেয়া হয়েছে। ইউনিটটি অধ্যয়নে ক'দিন ব্যয় হবে তাও ইউনিটের শুরুতে বলা আছে। প্রতিটি পাঠের শুরুতে ঐ পাঠের শিখনফল/উদ্দেশ্য যুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিখনফল অনুযায়ী জ্ঞান অর্জিত হলো কি না শিক্ষার্থী তা যাচাই করতে পারবেন। প্রতিটি পাঠের শেষে ঐ পাঠের সার-সংক্ষেপ দেয়া আছে। শিক্ষার্থীদের স্ব-মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রতিটি পাঠের শেষে পাঠোত্তর মূল্যায়ন এবং ইউনিটের শেষে চূড়ান্ত মূল্যায়নে নমুনা আকারে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, বহুপদি সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন এবং সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে।

কোর্সটি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা

শিক্ষার্থীরা যাতে এ বইটি পড়ে অধিকতর সুফল লাভ করতে পারেন সেজন্য নিচে কিছু নির্দেশনা তুলে ধরা হল:

- ইউনিটের শিরোনাম, ভূমিকা এবং পাঠ-শিরোনাম পড়ে সম্ভাব্য বিষয়বস্তু কী হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা করুন।
- পাঠের সবগুলো 'উদ্দেশ্য' পড়ে এই পাঠ থেকে কী কী শিখতে পারবেন তা জেনে নিন।
- এরপর মূলপাঠ ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। অধ্যয়নের পর শিখনফলগুলো অর্জিত হল কি না তা ভালোভাবে যাচাই করুন। যদি শিখনফল অর্জিত না হয় তাহলে বিষয়বস্তু পুনরায় অধ্যয়ন করুন।
- কোনো পাঠের বিষয়বস্তু অধ্যয়নের সময় যে বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত কঠিন/দুর্বোধ্য মনে হয়েছে তা চিহ্নিত করে আপনার নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করুন এবং কঠিন বিষয়গুলো সমাধানের জন্য বিষয়বস্তু পুনরায় অধ্যয়ন করুন।
- বিষয়বস্তু ভালোভাবে বোঝার ক্ষেত্রে অনুশীলনের জন্য প্রতিটি পাঠে "শিক্ষার্থীর কাজ" সংযোজন করা রয়েছে। পাঠের বিষয়বস্তু ভালোভাবে অধ্যয়ন করে "শিক্ষার্থীর কাজ" সম্পন্ন করুন।
- অধ্যয়ন শেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নের প্রশ্নগুলো নিজে নিজে সমাধান করার চেষ্টা করুন এবং ইউনিটের শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন। সবগুলো প্রশ্নের উত্তর সঠিক না হলে এই পাঠটি আবারও ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। চূড়ান্ত মূল্যায়নেও নমুনা আকারে বহুনির্বাচনি (নৈর্ব্যক্তিক), বহুপদি সমাপ্তিসূচক এবং সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। এগুলোও সঠিকভাবে অনুশীলন করুন। প্রয়োজনে আপনার স্টাডি সেন্টারের টিউটর এবং সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করুন। দেখবেন সমাধানের পথ সহজ হয়ে গেছে।

মার্জিন আইকন (Margin Icons)

অধ্যয়ন শুরু করার পূর্বে কোর্সটিতে পর্যায়ক্রমে যে সব আইকন/প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে আপনাকে পরিচিত হতে হবে। এতে পূরো কোর্স-মডিউল এর কোনটি শিখনফল, কোনটি বিষয়বস্তু/মূলপাঠ, কোনটি পাঠোত্তর মূল্যায়ন, কোনটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন এবং কোনটি উত্তরমালা সে সম্পর্কে সহজেই অবহিত হতে পারবেন। নিম্নে এ পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বিভিন্ন আইকন বা প্রতীকগুলো দেখানো হলো।

কোর্সবই অনুসরণের নির্দেশনা	কোর্স /ইউনিট সমাপ্তির সময়	উদ্দেশ্য	বিষয়বস্তু/মূলপাঠ	শিক্ষার্থীর কাজ	সারসংক্ষেপ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন	চূড়ান্ত মূল্যায়ন	উত্তরমালা	ভিডিও বা দেখা	অডিও বা শোনা	সাহায্য/প্রয়োজনে

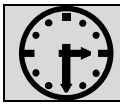 **কোর্স সমাপ্তির সময়**	**কোর্সটি সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৮৫ দিন**

অডিও/ভিডিও	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এইচএসসি প্রোগ্রামের সমাজবিজ্ঞান প্রথম পত্র কোর্সটির বেশকিছু ভিডিও প্রোগ্রাম বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে। শিক্ষার্থীবন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ের প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন। বাউবি-টিউবেও বিভিন্ন ভিডিও-লেকচার আপলোড করা হয়েছে। বাউবি'র ওয়েব টিভি এবং ওয়েব রেডিও'তেও নিয়মিত প্রোগ্রাম প্রচারিত হয়। বাউবি'র ওয়েব সাইটে কোর্সটির 'ই-বুক' রয়েছে। উল্লিখিত মাধ্যমগুলোর যেকোনোটি থেকে আপনি আপনার শিখন প্রক্রিয়া সমৃদ্ধ করতে পারেন।

	সহায়তা প্রয়োজন হলে পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন:	**আপনার স্টাডি সেন্টারের কোর্স-টিউটর** **অথবা,** **ড. ইকবাল হুসাইন** এবং **ড. মো. আব্দুস সাত্তার** ওপেন স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫।

সূচিপত্র

ইউনিট-১: বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চা ---------- ১-৮

পাঠ- ১.১: বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি ---------- ২
পাঠ- ১.২: বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ ---------- ৪
পাঠ- ১.৩: বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা ---------- ৬

ইউনিট- ২: বাংলাদেশের সংস্কৃতি ----------৯-১৮

পাঠ- ২.১: সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও ধরন ---------- ১০
পাঠ- ২.২: সংস্কৃতির উপাদানসমূহ ---------- ১২
পাঠ- ২.৩: বাংলাদেশের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ---------- ১৪
পাঠ- ২.৪: বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনধারা ---------- ১৬

ইউনিট- ৩: প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ ----------১৯-৪০

পাঠ- ৩.১: প্রত্নতত্ত্বের সংজ্ঞা এবং এর উৎসসমূহ ---------- ২০
পাঠ- ৩.২: প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে সমাজের শ্রেণি বিভাগ এবং প্রাচীন, মধ্য ও নব্যপ্রস্তর যুগের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য ---- ২২
পাঠ- ৩.৩: তাম্র, ব্রোঞ্জ ও লৌহযুগের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য ---------- ২৬
পাঠ- ৩.৪: বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানসমূহ : ময়নামতি ---------- ২৮
পাঠ- ৩.৫: পাহাড়পুর ---------- ৩১
পাঠ- ৩.৬: মহাস্থানগড় ---------- ৩৪
পাঠ- ৩.৭: উয়ারি-বটেশ্বর ---------- ৩৭

ইউনিট-৪: মানুষের নৃগোষ্ঠীগত পরিচয়----------৪১-৬৪

পাঠ- ৪.১: নরগোষ্ঠীর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য ---------- ৪২
পাঠ- ৪.২: পৃথিবীর প্রধান নরগোষ্ঠীসমূহ ---------- ৪৪
পাঠ- ৪.৩: বাঙালি জাতির নৃগোষ্ঠীগত পরিচয় ---------- ৪৬
পাঠ- ৪.৪: বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহ ---------- ৪৮
পাঠ- ৪.৫: চাকমা ---------- ৫০
পাঠ- ৪.৬: মারমা ---------- ৫৩
পাঠ- ৪.৭: ত্রিপুরা ও গারো ---------- ৫৫
পাঠ- ৪.৮: সাঁওতাল ---------- ৫৮
পাঠ- ৪.৯: মণিপুরি ও রাখাইন ---------- ৬০

ইউনিট- ৫: বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের আর্থ-সামাজিক পটভূমি ----------৬৫-৭৮

পাঠ- ৫.১: ভাষা আন্দোলন ---------- ৬৬
পাঠ- ৫.২: পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ---------- ৭০
পাঠ- ৫.৩: বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ---------- ৭৪

ইউনিট- ৬: বাংলাদেশের গ্রামীণ ও নগর সমাজ ---------- ৭৯-৯৮

পাঠ- ৬.১: বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো ---------- ৮০
পাঠ- ৬.২: বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ এবং এর সামাজিক স্তরবিন্যাস ---------- ৮৩
পাঠ- ৬.৩: গ্রামীণ সমাজের ক্ষমতাকাঠামো ---------- ৮৭
পাঠ- ৬.৪: বাংলাদেশের নগর সমাজ ---------- ৯০
পাঠ- ৬.৫: নগর সমাজের স্তরবিন্যাস ও ক্ষমতাকাঠামো ---------- ৯২
পাঠ- ৬.৬: গ্রাম ও নগর সমাজের তুলনামূলক চিত্র ---------- ৯৫

ইউনিট- ৭: বাংলাদেশের পরিবার, বিবাহ ও জ্ঞাতিসম্পর্ক ---------- ৯৯-১১৪
পাঠ- ৭.১: বাংলাদেশের পরিবারের ধরন ও কার্যাবলি ---------- ১০০
পাঠ- ৭.২: বাংলাদেশের সমাজজীবনে পরিবারের গুরুত্ব----------১০৪
পাঠ- ৭.৩: বাংলাদেশে বিবাহের ধরন ও গুরুত্ব---------- ১০৬
পাঠ- ৭.৪: বাংলাদেশে জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরন ও সম্বোধন রীতি ---------- ১০৯
পাঠ- ৭.৫: বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল পরিবার, বিবাহ ও জ্ঞাতিসম্পর্ক----------১১১
ইউনিট- ৮: বাংলাদেশের নগরায়ণ ও শিল্পায়ন ----------১১৫-১৩০
পাঠ- ৮.১: নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ধারণা----------১১৬
পাঠ- ৮.২: বাংলাদেশের নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রকৃতি ----------১১৮
পাঠ- ৮.৩: বাংলাদেশে শিল্পায়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ ----------১২১
পাঠ- ৮.৪: বাংলাদেশের সমাজে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রভাব----------১২৪
পাঠ- ৮.৫: বাংলাদেশের পোশাক শিল্প ও এর আর্থ-সামাজিক প্রভাব----------১২৭
ইউনিট- ৯: বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন ----------১৩১-১৪৬
পাঠ- ৯.১: সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের ধারণা---------- ১৩২
পাঠ- ৯.২: বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ ---------- ১৩৪
পাঠ- ৯.৩: বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষা ও গণমাধ্যমের ভূমিকা---------- ১৩৭
পাঠ- ৯.৪: বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে প্রযুক্তির প্রভাব ----------১৪০
পাঠ- ৯.৫: বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাব---------- ১৪৩
ইউনিট- ১০: সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ----------১৪৭-১৫৮
পাঠ- ১০.১: সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ও এর প্রকৃতি ---------- ১৪৮
পাঠ- ১০.২: বাংলাদেশে নারীর সামাজিক নিরাপত্তাজনিত সমস্যা:
যৌন নিপীড়ন, সাইবার অপরাধ এবং কর্মজীবী নারীর সমস্যা----------১৫০
পাঠ- ১০.৩: জেন্ডার বৈষম্য, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ---------- ১৫২
পাঠ- ১০.৪: বাংলাদেশে বার্ধক্যসমস্যা ---------- ১৫৫

মানবণ্টন **পূর্ণমান : ১০০**

১) সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন – ৬০ নম্বর (৬×১০ = ৬০)
০৯টি প্রশ্ন হতে ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০ নম্বর।

প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে-

ক. জ্ঞানমূলক
খ. অনুধাবনমূলক
গ. প্রয়োগমূলক
ঘ. উচ্চতর দক্ষতামূলক

২. বহুনির্বাচনি (নৈর্ব্যক্তিক/MCQ) অভীক্ষা – ৪০ নম্বর (৪০×১ = ৪০)
৪০টি প্রশ্ন থাকবে, সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চা
Study of Sociology in Bangladesh

ইউনিট ১

সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক প্রাচীন জনপদ হচ্ছে বাংলাদেশ। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নানা বাক পেরিয়ে বাংলাদেশ আজ এক অপার সম্ভাবনার দেশ। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দরিদ্র দেশটি আজ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে। সনাতন কৃষি অর্থনীতির পরিবর্তে নগরকেন্দ্রিক শিল্প ও সেবাভিত্তিক অর্থনীতি বিকশিত হওয়ায় এদেশের সমাজ কাঠামো এবং সামাজিক সম্পর্ক ভীষণভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল সমাজ সম্পর্কে অধ্যয়নের অপরিহার্য শাস্ত্র হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান। ভারতীয় দার্শনিক কৌটিল্য (খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০-২৭৫ অব্দ) বিক্ষিপ্তভাবে সমাজবিজ্ঞানের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি তাঁর 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে তৎকালীন ভারত বর্ষের আইন, রাষ্ট্র, রাজনীতি, প্রশাসন, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, সমাজনীতি ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করেন। যুগে যুগে অনেক পর্যটক, পরিব্রাজক, যোদ্ধা, ধর্ম প্রচারক, দার্শনিক, ইতিহাসবেত্তা এই বঙ্গভূমিতে এসেছেন। যেমন- হিউয়েন সাং, আবুল ফজল, আলবেরুনি, ইবনে বতুতা প্রমুখ এর গ্রন্থে তৎকালীন বাংলার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও জীবনধারার বিশেষ করে উৎপাদন ব্যবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়। এদেশের অর্থনীতি, সমাজনীতি, কৃষি, শিল্প, সমাজ কাঠামো, পরিবার, বিবাহ, জ্ঞাতি সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তাঁরা আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন। সামাজিক জীব হিসেবে বাংলাদেশের মানুষের বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানএবং ব্যবহারিক বিষয়াদি নিয়ে সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করে বিধায় বাংলাদেশে এর পাঠের গুরুত্ব রয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ কীভাবে জীবন-যাপন করে, তাদের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজন রয়েছে। সামাজিক উন্নয়ন, সমাজ সংস্কারমূলক কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ে জানার জন্য সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশে যে মনীষী কাজ করেছেন তিনি অধ্যাপক নাজমুল করিম। তাঁর বিভিন্ন লেখা বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

	ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ১.১ : বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি
পাঠ- ১.২ : বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ
পাঠ- ১.৩ : বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা

পাঠ-১.১ বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি
Background of the Study of Sociology in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বাংলাদেশ, সমাজবিজ্ঞান, অধ্যয়ন, চর্চা, পটভূমি।

মানব সমাজকে বুঝতে হলে এবং সমাজ কাঠামো অনুধাবন করতে হলে সমাজবিজ্ঞান চর্চার বিকল্প নেই। সমাজ কাঠামো, সামাজিক পরিবর্তনের গতিধারা, সামাজিক পরিবর্তনের কারণ, সামাজিক সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়াদি, পরিবার, রাষ্ট্র, সম্পত্তি, সামাজিক শ্রেণি, ধর্ম-বর্ণ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং বিশ্লেষণে সমাজবিজ্ঞান চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা এবং এর গতি প্রকৃতি সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নের পটভূমি তৈরি করেছে। বাংলাদেশের মানুষের সংস্কৃতি, সংস্কৃতির পরিবর্তন, সামাজিক পরিবর্তন, রাজনীতির দর্শন, ঐতিহাসিক দর্শন ইত্যাদি বিষয় সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি তৈরি করেছে।

খ্রিস্টের জন্মের পূর্ব থেকেই সমাজবিজ্ঞান চর্চার প্রমাণ ভারতীয় উপমহাদেশে রয়েছে। ভারতীয় দার্শনিক কৌটিল্য (খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০-২৭৫ অব্দ) গভীরভাবে সমাজ কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি তাঁর 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে তৎকালীন ভারতের আইন, রাষ্ট্র, রাজনীতি, প্রশাসন, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, সমাজনীতি ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়সমূহ আলোচনা করেন। গ্রিক পণ্ডিত প্লেটো (খ্রিস্টপূর্ব ৪২৭-৩৪৭ অব্দ), এরিস্টটল (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২ অব্দ) প্রমুখের সমাজচিন্তা সমাজবিজ্ঞান উদ্ভবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। মধ্যযুগের বিখ্যাত মুসলিম চিন্তাবিদ ইবনে খালদুন সমাজচিন্তার বিকাশের ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখেছেন। অনেকের মতে তিনিই সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃত জনক। কিন্তু ফরাসি সমাজচিন্তাবিদ অগাস্ট কোঁতকে সমাজবিজ্ঞানের জনক হিসেবে অভিহিত করা হয়। যেহেতু ১৮৩৯ সালে তিনিই প্রথম সমাজবিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহার করেন।

কার্ল মার্কস উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের আলোকে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের বিষয়ে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি তাঁর আলোচনায় নির্দিষ্ট একটি উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত একটি সমাজব্যবস্থাকে চিহ্নিত করেছেন। সমাজ বিকাশের ধারায় তাঁর উৎপাদন ব্যবস্থা বিষয়ক আলোচ্য স্তরগুলো হলো, আদিম সাম্যবাদী উৎপাদন পদ্ধতি (Primitive Communal Mode of Production); দাস উৎপাদন পদ্ধতি (The Slave Mode of Production); সামন্তবাদী উৎপাদন পদ্ধতি (The Feudal Mode of Production); পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি (The Capitalist Mode of Production), সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি (The Socialistic Mode of Production) এবং সাম্যবাদী উৎপাদন পদ্ধতি (The Communist Mode of Production)। কার্ল মার্কসের উৎপাদন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হলো এশিয় উৎপাদন ব্যবস্থা (Asian Mode of Production)। এশিয় উৎপাদন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য অন্যান্য উৎপাদন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য থেকে আলাদা। এটি মূলত এমন একটি উৎপাদন ব্যবস্থা যা শুধু ভারতীয় উপমহাদেশেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এ উৎপাদন ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য ছিলো 'স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সম্প্রদায় বা Self Sufficient Village Community.

যুগে যুগে অনেক পর্যটক, পরিব্রাজক, যোদ্ধা, ধর্ম প্রচারক এই বঙ্গভূমিতে এসেছেন। যেমন- হিউয়েন সাং, আবুল ফজল, আলবেরুনি, ইবনে বতুতা প্রমুখ। তাঁদের লেখায় তৎকালীন বাংলার বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। এদেশের অর্থনীতি, সমাজনীতি, কৃষি, শিল্প, সমাজের বৈচিত্র্য, সমাজ কাঠামো, পরিবার, বিবাহ, জ্ঞাতি সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তাঁরা বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের আলোচনায় সামাজিক প্রেক্ষাপট, সমাজকাঠামো, সামাজিক স্তরবিন্যাস, শ্রেণি কাঠামো ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় নি, যা সমাজবিজ্ঞান চর্চায় বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

ইংরেজদের হাতে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের পর ব্রিটিশ কোম্পানির শাসন ও ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসনকালে বাংলার অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমাজকাঠামো ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চায় নতুন ধ্যান ধারণার তৈরি হয়। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫৬ সালে সমাজবিজ্ঞান একটি আলাদা বিষয় হিসেবে পঠন-পাঠন শুরু হয়। ১৯৪৭ এর দেশভাগ, ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ সমাজবিজ্ঞান চর্চার আলাদা পটভূমি তৈরি করে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি খুব বেশি দিন আগে তৈরি হয়নি। বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন এদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি তৈরি করেছে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি আলোচনা করুন। **সময় : ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা এবং এর গতি প্রকৃতি সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি তৈরি করেছে। বাংলাদেশের মানুষের সংস্কৃতি, সংস্কৃতির পরিবর্তন, সামাজিক পরিবর্তন, রাজনীতির দর্শন, ঐতিহাসিক দর্শন ইত্যাদি বিষয় সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি তৈরি করেছে। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫৬ সালে একটি আলাদা বিষয় হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের পঠন-পাঠন শুরু হয়। ১৯৪৭ এর দেশ ভাগ, ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ সমাজবিজ্ঞান চর্চার আলাদা পটভূমি তৈরি করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি তৈরির কারণ কোনটি?

(i) অর্থনৈতিক পরিবর্তন

(ii) সামাজিক পরিবর্তন

(iii) রাজনৈতিক পরিবর্তন

(iv) কোনটিই নয়।

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) i, ii ও iii (ঘ) iv

২। কার্ল মার্কসের এশিয় উৎপাদন প্রণালী কোথায় বিদ্যমান ছিল

(ক) সমগ্র এশিয়ায় (খ) ভারতবর্ষে

(গ) বাংলাদেশে (ঘ) ইউরোপে

পাঠ ১.২ বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ
Development of Sociology in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বাংলাদেশ, সমাজবিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক এ.কে নাজমুল করিম, অধ্যাপক অজিত কুমার সেন, বিকাশ।

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ বাংলাদেশে খুব একটা বেশি দিন আগের নয়। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের আচার আচরণ, রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করে। কিন্তু বাংলাদেশে এ ধরনের বিজ্ঞানের আবির্ভাব মূলত বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অল্প কয়েক দশক আগে শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ

সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞান শাস্ত্রটির বিকাশ শুরু হয় ফরাসী মনীষী অগাস্ট কোঁত-এর হাত ধরে। সেইন্ট সাইমন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ১৮৩৯ সালে তিনিই প্রথম 'Sociology' শব্দটি ব্যবহার করেন। তবে তিনি প্রথমে একে Social physics বা সামাজিক পদার্থবিদ্যা বলে অভিহিত করেছিলেন। পরবর্তীতে বিষয়টিকে Sociology বা সমাজবিজ্ঞান নামে নামকরণ করেন।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশ হিসেবে সমাজবিজ্ঞান চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। ১৯৪০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিলেবাসে "Elements of Sociology" ও "Principles of Sociology" নামে দুটি কোর্স চালু করা হয়। এ বিষয়গুলো পড়ানোর জন্য বিদেশের অনেক অতিথি অধ্যাপককে নিয়ে আসা হতো। অতপর ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আলাদা বিভাগ হিসেবে সমাজবিজ্ঞান যাত্রা শুরু করে। ১৯৫৭-১৯৫৮ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি শুরু হয়। এর আগে ১৯৫০ সাল থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক এ.কে নাজমুল করিম এবং অধ্যাপক অজিত কুমার সেন সমাজবিজ্ঞানকে একটি আলাদা বিভাগ হিসেবে চালু করার বিষয়ে কাজ শুরু করেন। একই বছর ফরাসি অধ্যাপক লেভি স্ট্রস গবেষণার কাজে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে সমাজবিজ্ঞান আলোচনার নতুন ক্ষেত্র খুঁজে পান। তিনি অধ্যাপক নাজমুল করিম এবং অজিত কুমার সেন এর সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। অধ্যাপক নাজমুল করিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার হাত ধরেই সমাজবিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয়।

বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞান বিকাশে অধ্যাপক নাজমুল করিমের অনেকগুলো গ্রন্থ রয়েছে, তার মধ্যে-"The Changing Society of India, Pakistan and Bangladesh" গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাঁর প্রবন্ধসমূহে সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি, উন্নয়নের লক্ষ্য ও সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কে যে মতামত প্রকাশ করেন তা বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞান বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এছাড়াও দেশি বিদেশি বিভিন্ন সেমিনার এবং সিম্পোজিয়ামে অনেক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যা বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান বিকাশে গুরুত্ব বহন করে। তাঁর এ প্রবন্ধগুলোর মধ্যে চেঞ্জিং প্যাটার্নস অব এন ইস্ট পাকিস্তান ফ্যামিলি, উইম্যান ইন দি নিউ এশিয়া, রিলিজিয়নস অ্যান্ড সোসাইটি ইন বাংলাদেশ, রিলিজিয়নস ইন অরিয়েন্টাল সোসাইটিজ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ১৯৬৯ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১৯৭০ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আলাদা বিষয় হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের পঠন-পাঠন শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান ছাড়াও উচ্চতর গবেষণা হিসেবে এম.ফিল, পি-এইচ.ডি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বিভিন্ন কলেজে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সমাজবিজ্ঞান

অধ্যয়ন করা হয়। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ডিগ্রি দেওয়া হয়।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশের একটি ক্রমপঞ্জি তৈরি করুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মানুষের পারস্পারিক সম্পর্ক, আচার আচরণ, মূল্যবোধ, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, সমাজ পরিবর্তনের গতি-প্রকৃতি, সামাজিক পরিবর্তন এবং সামাজিক উন্নতি বিধানে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা ও সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পেতে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ শুরু হয়। বাংলাদেশে পরিবর্তনশীল সমাজ কাঠামো, সামাজিক আচরণ, মূল্যবোধ ইত্যাদি পাঠে সমাজবিজ্ঞান প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। Social Physics শব্দটি কে ব্যবহার করেন–

(ক) হার্বার্ট স্পেনসার (খ) অগাস্ট কোঁত

(গ) লেভি স্ট্রস (ঘ) অধ্যাপক এ. কে. নাজমুল করিম

২। বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের জনক কে?

(ক) অধ্যাপক এ.কে নাজমুল করিম (খ) অধ্যাপক অজিত কুমার সেন

(গ) ড. রংগলাল সেন (ঘ)) অগাস্ট কোঁত

পাঠ-১.৩ বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা
Necessity of the Study of Sociology in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বাংলাদেশ, সমাজবিজ্ঞান, সামাজিক সম্পর্ক, সমাজের গতি-প্রকৃতি, সামাজিক সমস্যা, পাঠের প্রয়োজনীয়তা।

সমাজবিজ্ঞান সমাজবদ্ধ মানুষের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষকে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে হয়। যেহেতু সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা পৃথিবীর সকল দেশেই রয়েছে, সেহেতু বাংলাদেশেও এর পাঠের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা

সামাজিক জীব হিসেবে বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক বিষয়াদি নিয়ে সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করে। ফলে বাংলাদেশে এর পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বাংলাদেশের মানুষ কীভাবে জীবন-যাপন করে, তাদের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজন রয়েছে। সামাজিক উন্নয়ন, সমাজ সংস্কারমূলক কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ে জানার জন্য সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

(১) **বাংলাদেশের সমাজের শ্রেণি কাঠামো সম্পর্কে জানা :** বাংলাদেশে বিভিন্ন শ্রেণি এবং পেশার মানুষ বাস করে। এছাড়াও বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বসবাসও এ অঞ্চলে রয়েছে। তাই এসব মানুষের শ্রেণি, তাদের পেশা, বৃত্তি, জীবন ধারণের উপায় ইতাদি বিষয়ে জানার জন্য সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

(২) **বাংলাদেশের সমাজ সম্পর্কে জানা :** বাংলাদেশের সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হলে সমাজবিজ্ঞান পাঠের বিকল্প নেই। বাংলাদেশের সমাজ কোন ধরনের, বাংলাদেশের সমাজের ক্রমবিকাশ, বাংলাদেশের সমাজের বিবর্তন ধারা, বাংলাদেশের সমাজের ধরণ, সমাজ পরিবর্তনের ধারা, গ্রামীণ এবং শহুরে সমাজ, সমাজে কাঠামো, বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস, বর্ণপ্রথা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান লাভের জন্য সমাজবিজ্ঞান পাঠ আবশ্যক।

(৩) **বাংলাদেশের মানুষ সম্পর্কে জানা :** বাংলাদেশের মানুষের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী, মানুষের সংস্কৃতি, চিন্তা চেতনা, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, ধর্ম, আচার আচরণ, রীতিনীতি, পরিবর্তনশীল আচার-আচরণ এবং রীতিনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে হলে সমাজবিজ্ঞান পাঠ আবশ্যক।

(৪) **বাংলাদেশের সমাজের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে জানা :** বাংলাদেশের সমাজের গতি-প্রকৃতি এবং গতিধারা সম্পর্কে জানতে, বাংলাদেশের সমাজের অতীত অবস্থান, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব রয়েছে।

(৫) **সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে জানা :** বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক সম্পর্ক, সম্পর্কের ধরন, পুঁজিপতি এবং পুঁজিহীনের সম্পর্ক সম্বন্ধে জানতে হলে, সামাজিক সম্পর্কের প্রভাব সম্পর্কে এবং গতি প্রকৃতি জানতে বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(৬) **বাংলাদেশের সমাজের উন্নতি বিধান :** সীমিত সম্পদ দিয়ে অসীম চাহিদা পূরণ করে কিভাবে সামাজিক উন্নতি সাধন করা যায়, সমাজবিজ্ঞান সে সম্পর্কে জ্ঞান দান করে থাকে। তাই সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন ব্যতীত বাংলাদেশের মানুষের চাহিদা, ভোগ প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা কখনও সম্ভব নয়।

(৭) **সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা :** বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে হলে সেগুলো কিভাবে পরিচালিত হয় সে সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ আবশ্যক। সমাজবিজ্ঞান পাঠের মধ্য দিয়েই সমাজকে সবচেয়ে ভালোভাবে জানা সম্ভব।

(৮) **বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে জানা :** অধিক জনসংখ্যা, ছোট্ট সীমানা, অসীম চাহিদা, সীমিত যোগান, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয় বাংলাদশের প্রধানতম আলোচনার বিষয়। সমাজবিজ্ঞান পাঠ করলে এসব সামাজিক সমস্যাবলী চিহ্নিত করার সুযোগ হয়। তাই বাংলাদেশের যেকোনো সামাজিক সমস্যার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে এবং এগুলোর সমাধানের পথ বের করতে হলে সমাজবিজ্ঞান পাঠ অত্যাবশ্যক।

উপর্যুক্ত আলোচনার সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি যে, বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, দলগত ইত্যাদি বিষয়ে জানতে হলে সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা লিপিবদ্ধ করুন। **সময় : ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশর মানুষের সাথে মানুষের পারস্পারিক সম্পর্ক, আচার আচরণ, মূল্যবোধ, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, সমাজ পরিবর্তনের গতি-প্রকৃতি, সামাজিক পরিবর্তন এবং সামাজিক উন্নতি বিধানে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা ও সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পেতে হলে সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সমাজবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের–

(i) সামজিক আচরণ সম্পর্কে জানা যায়

(ii) অর্থনৈতিক আচরণ সম্পর্কে জানা যায়

(iii) রীতি-নীতি, মূল্যবোধ জানা যায়

(iv) সবগুলোই সঠিক।

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) i , ii ও iii (ঘ) iv

২। বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞান পাঠের মূল কারণ হচ্ছে–

(ক) বাংলাদেশের সমাজের সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন

(খ) বাংলাদেশের সমাজের অর্থনৈতিক গবেষণা

(গ) বাংলাদেশের সমাজের পরিবেশবাদী অধ্যয়ন

(ঘ) বাংলাদেশের সমাজের রাজনৈতিক সংস্কার

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১ : ১। গ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২ : ১। খ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩ : ১। ঘ ২। ক
চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ১। গ ২। ঘ ৩। ক ৪। খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১। সমাজবিজ্ঞানের জনক কে?
(ক) হার্বার্ট স্পেনসার (খ) লেভি স্ট্রস
(গ) অগাস্ট কোঁত (ঘ) অধ্যাপক এ. কে. নাজমুল করিম

২। একটি আলাদা বিষয় হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের পঠন-পাঠন শুরু হয় কত সালে?
(ক) ১৯২১ সালে (খ) ১৯৪৭ সালে
(গ) ১৯৫২ সালে (ঘ) ১৯৫৬ সালে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞান শাস্ত্রটির বিকাশ শুরু হয় অগাস্ট কোঁত-এর হাত ধরে। তিনিই প্রথম 'Sociology' শব্দটি ব্যবহার করেন। তবে তিনি প্রথমে একে Social physics বা সামাজিক পদার্থবিদ্যা বলে অভিহিত করেছিলেন। পরবর্তীতে বিষয়টিকে Sociology বা সমাজবিজ্ঞান নামে নামকরণ করেন।

৩। অগাস্ট কোঁত কোন দেশের নাগরিক?
(ক) ফ্রান্স (খ) ইটালি
(গ) জার্মানী (ঘ) ব্রিটেন

৪। অগাস্ট কোঁৎ কার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে 'সমাজবিজ্ঞান' অধ্যয়নে ব্রতী হন?
(ক) এরিস্টোটল (খ) সেইন্ট সাইমন
(গ) ইবনে খালদুন (ঘ) সেইন্ট অগাস্টিন

খ) সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্নঃ

উদ্দীপকটি পড়ুন এব নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।
রসুলপুর একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামটি আগে কৃষি নির্ভর থাকলেও এখন বেশিরভাগ মানুষ শিক্ষিত এবং তারা কৃষি বহির্ভুত পেশায় সম্পৃক্ত। শহরের সাথে যোগাযোগ, আধুনিক প্রযুক্তি, পণ্য উৎপাদন ও বিপননসহ নানা ক্ষেত্রে গ্রামে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সামাজিক সম্পর্ক, ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ এমনকি খাদ্যাভ্যাসেও অনেক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। গ্রামের প্রবীণ ও তরুণদের আন্তঃসম্পর্কেও এর প্রভাব পড়ছে।

১) সমাজ এবং সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করে কোন শাস্ত্র? ১
২) বাংলাদেশে কীভাবে সমাজবিজ্ঞান বিকাশ লাভ করেছে? ২
৩) আপনি কি মনে করেন, রসুলপুর গ্রামের সামাজিক পরিবর্তনসমূহ সমাজবিজ্ঞানের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত? যুক্তিসহ আলোচনা করুন। ৩
৪) গত দশ বছরে আপনার এলাকায় সংঘটিত পরিবর্তনসমূহ চিহ্নিত করুন। এ বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখা করুন। ৪

বাংলাদেশের সংস্কৃতি
Culture of Bangladesh

ইউনিট ২

সংস্কৃতি মানুষের জীবনধারার প্রতিফলন। আমাদের আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, রীতিনীতি, রুচি, ব্যবহার্য বস্তুগত উপাদানসমূহ ইত্যাদিই সংস্কৃতি। সমাজের মানুষ হিসেবে আমরা প্রতিনিয়তই সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের মধ্যে বেড়ে উঠি। সাধারণ অর্থে সংস্কৃতি বলতে কৃষ্টি, সংস্কার, বিশ্বাস ইত্যাদিকে বোঝানো হলেও সমাজবিজ্ঞানে এর আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানে সংস্কৃতি পূর্ণাঙ্গ জীবন ধারাকে বোঝায়। সংস্কৃতির কারণেই মানুষের ব্যক্তি জীবন এবং সমাজজীবন অন্যদের থেকে স্বতন্ত্রতা পায়।

পৃথিবীর প্রত্যেক সমাজেরই নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। প্রতিটি সংস্কৃতিরই রয়েছে আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য। মূলত প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিন্নতা এবং এর সাথে খাপ খাওয়ানোর ভিন্ন ভিন্ন কৌশল ও উপকরণের কারণে সমাজের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিজস্ব হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সংস্কৃতিও এর বাইরে নয়। এ সংস্কৃতির রয়েছে আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য যা এটিকে অন্য সংস্কৃতি থেকে পৃথক করেছে। তবে নানা জাতির আগমনে এদেশের সংস্কৃতিতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটেছে। সংস্কৃতির এ সকল উপাদানের মধ্যে রয়েছে ভাষা, চিন্তা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ ইত্যাদি। আবার বাংলাদেশের সংস্কৃতি যুগে যুগে বহির্বিশ্বের নানাবিধ সাংস্কৃতিক উপাদান দ্বারা সমৃদ্ধ ও প্রভাবিত হয়েছে। বিশেষ করে পর্যায়ক্রমে বিদেশী শক্তির আগামন, আগ্রাসন, ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ এবং নানা সাংস্কৃতিক উপাদান একীভূতকরণের ফলে আমাদের সংস্কৃতি একটি মিশ্র সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে আগত জনগোষ্ঠীর (আর্য, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, মঙ্গোলীয়, আফগান, পাঠান, মারাঠী, পার্সিয়ান, মুঘল, সালতানাৎ, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ ইত্যাদি) কারণে এ অঞ্চলের বাঙালিরা যেমন সংকর জাতিতে পরিণত হয়েছে তেমনি এদের আচার-আচরণ, ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ, প্রথা, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, শিল্পকলা, ভাষা, সাহিত্য, অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবও ফেলেছে।

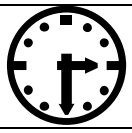	**ইউনিট সমাপ্তির সময়**	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ২.১ : সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও ধরন
পাঠ- ২.২ : সংস্কৃতির উপাদানসমূহ
পাঠ- ২.৩ : বাংলাদেশের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য
পাঠ- ২.৪ : বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনধারা

পাঠ-২.১ সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও ধরন

Definition and Types of Culture

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সংস্কৃতির সংজ্ঞা বলতে ও লিখতে পারবেন;
- সংস্কৃতির ধরন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- বস্তুগত এবং অবস্তুগত সংস্কৃতির পার্থক্য নিরুপণ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	সংস্কৃতি, জীবনপ্রণালী, বস্তুগত সংস্কৃতি এবং অবস্তুগত সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। প্রত্যেক সমাজের আলাদা ও নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। সাধারণ কথায়, সংস্কৃতি হলো এমন জীবন ধারা যা মানুষ তার জীবন নির্বাহ করতে গিয়ে নানা প্রয়োজনে নিজস্ব সাংস্কৃতিক উপাদান ছাড়াও বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ সংযোজনের মাধ্যমে নিজেদের সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধন করে। বিভিন্ন পথ উদ্ভাবন করতে শিখে থাকে।

সংস্কৃতির সংজ্ঞা: ইংরেজি Culture শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হলো 'সংস্কৃতি' যা ল্যাটিন শব্দ 'Cultura' থেকে এসেছে, যাকে এক কথায় কর্ষণ বা চাষ করা বোঝায়। অর্থাৎ মানসিক, বুদ্ধিভিত্তিক এবং দৈহিক চাহিদা পূরণের জন্য চর্চার মাধ্যমে প্রাপ্ত বিষয়বস্তুর নির্যাসই হলো সংস্কৃতি। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী এবং নৃবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সংস্কৃতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন-

ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী ই.বি টাইলর তাঁর '*Primitive Culture*' গ্রন্থে বলেছেন, "সংস্কৃতি হলো সমাজস্থ মানুষের সমগ্র জীবন প্রণালী।" তাঁর মতে, সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের অর্জিত জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নৈতিকতা, আইন, রীতিনীতি এবং অন্য যেকোনো দক্ষতা ও অভ্যাসের জটিল সমষ্টি (Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, moral, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.)

সংস্কৃতির সংজ্ঞায় Jones বলেন, "Culture is the sum total of man's creation." অর্থাৎ মানুষ তার চলার পথে জীবিকা নির্বাহের জন্য যা কিছু সৃষ্টি করে তা-ই সংস্কৃতি।

ম্যালিনোস্কি তাঁর '*A Scientific Theory of Culture*' গ্রন্থে বলেন, "সংস্কৃতি হলো মানুষের আপন কর্মের সৃষ্টি যার মাধ্যমে সে তার উদ্দেশ্য সাধন করে"(Culture is the handiwork of man and the medium through which he achieves his ends.) ।

সমাজবিজ্ঞানী স্পেনসার সংস্কৃতিকে একটি অধি-জৈবিক পরিবেশের সাথে তুলনা করেছেন, এই জৈবিক পরিবেশ বৃক্ষরাজি এবং পশুপাখি দ্বারা গঠিত এবং এটি জৈবিক বা প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে ভিন্ন। (Culture is the super organic environment as distinguished from the organic, or physical, the worlds of plants and animals).

Samuel Koenig তাঁর *Sociology* গ্রন্থে বলেন: "Culture may be defined as the sum-total of man's efforts to adjust himself to his environment and to improve his modes of livings." অর্থাৎ মানুষ তার চারপাশের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য যে প্রচেষ্টা চালায় এবং তার জীবনমান বৃদ্ধিতে যত কাজ করে তার সমষ্টিই হলো সংস্কৃতি।

উপরের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মানুষের সমাগ্রিক কার্যাবলি যা সে তার জীবন ধারণের জন্য করে থাকে তাকে সংস্কৃতি বলে। মানুষের আচার-আচরণ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মেধা, নীতিবোধ ইত্যাদির সমষ্টিই সংস্কৃতি।

সংস্কৃতির ধরন: সমাজে সাধারণত দুই ধরনের সংস্কৃতি বিদ্যামান। যথা- বস্তুগত সংস্কৃতি এবং অবস্তুগত সংস্কৃতি।

বস্তুগত সংস্কৃতি: সকল বস্তুগত জিনিসপত্র যা মানুষ দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য ব্যবহার করে তাকে বস্তুগত সংস্কৃতি বলে। এসব বস্তুগত জিনিসের মধ্যে ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, পোষাক, বাসন বা তৈজসপত্র, হাতিয়ার অন্যতম, আর

এগুলোই বস্তুগত সংস্কৃতি। সামাজিক পরিবর্তনের রেশ ধরে সভ্যতার উন্নয়নের ফলে সংস্কৃতির এসব উপাদানের মধ্যেও এসেছে পরিবর্তন। যেমন- মানুষের ব্যবহার্য জিনিসের মধ্যেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। আগে মানুষ লাঙল, কাস্তে, মাটির হাঁড়ি, ঘরবাড়ি, লুঙ্গি, শাড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করতো কিন্তু বর্তমানে কলের লাঙল, ধানকাটার মেশিন, স্টিলের হাড়ি পাতিল ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে।

অবস্তুগত সংস্কৃতি: যেসব বিষয়ের বস্তুগুণ নেই অথচ আমাদের সংস্কৃতির অংশ তাকে অবস্তুগত সংস্কৃতি বলে। যেমন- চিন্তাভাবনা, ধ্যান-ধারণা, রীতিনীতি, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, নীতিবোধ ইত্যাদি। এক কথায় ভাবগত সংস্কৃতিকে অবস্তুগত সংস্কৃতি বলে। এছাড়াও মানুষের ভাষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, আইন, আদর্শ, মূল্যবোধ, প্রথা, শিল্পকলা, অভ্যাস, বিশ্বাস, সামর্থ্য ইত্যাদি উপাদানও অবস্তুগত সংস্কৃতির অংশ।

বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য

বস্তুগত সংস্কৃতি	অবস্তুগত সংস্কৃতি
১। বস্তুগত সংস্কৃতি মানুষের জীবনকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে।	১। অবস্তুগত সংস্কৃতি মানুষের জীবনকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে।
২। উদাহরণ-ঘর-বাড়ি, আসবাব-পত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ, গাড়ি ইত্যাদি।	২। উদাহরণ-শিল্পকলা, সাহিত্য, সংগীত, প্রযুক্তি, ভাষা ইত্যাদি।
৩। বস্তুগত সংস্কৃতিকে দেখা যায় এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরানো যায়।	৩। অবস্তুগত সংস্কৃতিকে দেখা যায় না এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরানো যায় না।
৪। বস্তুগত সংস্কৃতি বৈষয়িক।	৪। অবস্তুগত সংস্কৃতি ভাবগত।
৫। বস্তুগত সংস্কৃতি বাহ্যিক দিকের পরিবর্তন ঘটায়।	৫। অবস্তুগত সংস্কৃতি মানসিক পরিবর্তন ঘটায়।
৬। বস্তুগত সংস্কৃতি দ্রুত পরিবর্তনশীল।	৬। অবস্তুগত সংস্কৃতি অপেক্ষাকৃত ধীর পরিবর্তনশীল।
৭। বস্তুগত সংস্কৃতি সঞ্চালন প্রক্রিয়া অবস্তুগত সংস্কৃতির তুলনায় বেশি সচল।	৭। অবস্তুগত সংস্কৃতি সঞ্চালন প্রক্রিয়া বস্তুগত সংস্কৃতির তুলনায় কম সচল।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বস্তুগত এবং অবস্তুগত সংস্কৃতির পার্থক্য নিরুপণ করুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সংস্কৃতি সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরত্বপূর্ণ প্রত্যয়। সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Culture যার উৎপত্তিগত অর্থ চাষ করা বা কর্ষণ করা। মানুষ তার জীবন চলার পথে বা জীবন মান বৃদ্ধির জন্য তার চার পাশের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য যে সমস্ত কার্যাবলি করে থাকে তাকে সংস্কৃতি বলে। সংস্কুতি দুই প্রকার। যথা-বস্তুগত সংস্কৃতি এবং অবস্তুগত সংস্কৃতি। সকল বস্তুগত জিনিসপত্র যা মানুষ দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য ব্যবহার করে তাকে বস্তুগত সংস্কৃতি বলে। যেসব বিষয়ের বস্তুগুণ নেই অথচ আমাদের সংস্কৃতির অংশ তাকে অবস্তুগত সংস্কৃতি বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন ($\surd$) দিন।

১। সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে-
(ক) Civilization (খ) Culture (গ) Music (ঘ) Fashion

২। Primitive Culture গ্রন্থটি কার লেখা?
(ক) রংগলাল সেন এর (খ) আবুল বারকাত এর
(গ) ই.বি টাইলর এর (ঘ) এডওয়ার্ড সাঈদ এর

পাঠ-২.২ সংস্কৃতির উপাদানসমূহ
Elements of Culture

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সংস্কৃতির উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	প্রতীক, ভাষা, আচরণবিধি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আচার-আচরণ।

কোনো একক বিষয় সংস্কৃতির উপাদান নয় বরং অনেকগুলো বিষয় বা উপাদান নিয়ে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এসব সাংস্কৃতিক উপাদান আমাদের সমাজেরই অংশ। নিম্নে সংস্কৃতির কয়েকটি উপাদান আলোচনা করা হলো:

(১) **প্রতীক বা সংকেতসমূহ** (Symbols)**:** প্রত্যেক সংস্কৃতিই কিছু প্রতীক বা সংকেত দ্বারা সন্নিবেশিত যা ইশারা, অনুভূতি বা প্রতিক্রিয়াকে নির্দেশ করে থাকে। আদিম কাল থেকেই এগুলো সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে পরিচিত।

(২) **ভাষা** (Language)**:** ভাষাই সম্ভবত প্রতীকসমূহের পূর্ণাঙ্গ সারণি যা মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে। গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ভাষা সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

(৩) **আচরণবিধি** (Norms)**:** সংস্কৃতির পৃথকীকরণ সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হয় আচরণবিধি বা আদর্শ আচরণ। দুই ধরনের আচরণবিধি সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে পরিচিত। যথা- (ক) আনুষ্ঠানিক আচরণবিধি এবং (খ) অনানুষ্ঠানিক আচরণবিধি।

(৪) **আচার-অনুষ্ঠান** (Rituals)**:** ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির অনুষ্ঠানের মাত্রা, অনুষ্ঠান পালনের পদ্ধতি, বিশেষ অনুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও এগুলো সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

(৫) **পরিবর্তিত আচরণবিধি ও বিশ্বাস** (Changing Norms and Beliefs)**:** সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের আচার-আচরণ এবং বিশ্বাসের ধরনেরও পরিবর্তন ঘটে থাকে। এসব পরিবর্তিত আচার আচরণএবং বিশ্বাস সংস্কৃতির উপাদান।

(৬) **মূল্যবোধ** (Values)**:** মূল্যবোধ সংস্কৃতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা মানুষকে ভাল ও মন্দের পার্থক্য শেখায়।

(৭) **নৈতিকতা** (Ethics)**:** নৈতিকতা সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোর মধ্যে অন্যতম। কর্মঠ, নিরলস পরিশ্রমী, কাজের প্রতি শ্রদ্ধা অনেক সংস্কৃতিরই অংশ।

(৮) **হস্তশিল্প** (Artifacts)**:** হস্তনির্মিত জিনিসপত্র সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। কোনো সামজের কৃষ্টি, শিল্পকলা ইত্যাদি হস্তশিল্পের মাধ্যমে ফুটে উঠে যা সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে পরিচিত।

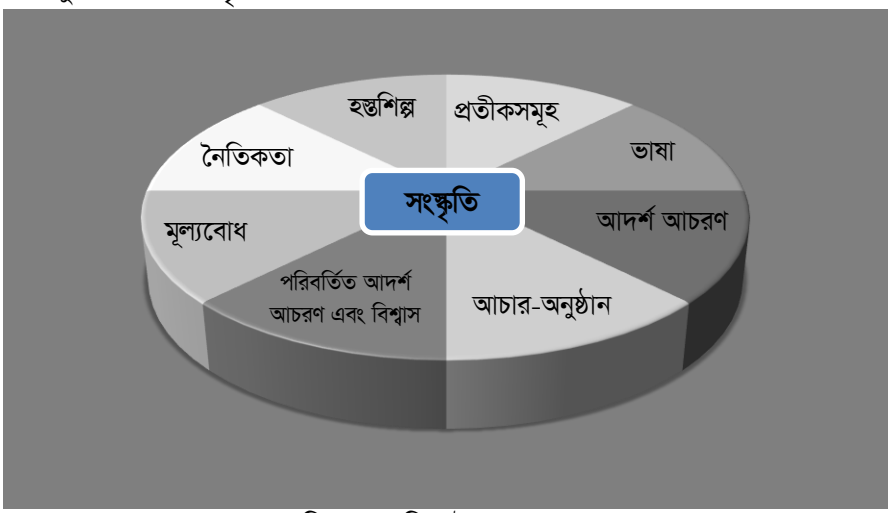

চিত্র: সংস্কৃতির উপাদানসমূহ

নৃবিজ্ঞানী ক্লার্ক উইজলার সংস্কৃতির কতকগুলো উপাদানের কথা বলেছেন। যথা:

(১) **ভাষা:** প্রত্যেক সমাজেই ভাবের আদান-প্রদান হয় ভাষার মাধ্যমে। ভাষা একটি সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধি দান করে। ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃতির অন্যান্য উপাদানসমূহের মধ্যেও যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

(২) **বস্তুগত বৈশিষ্ট্য:** মানুষের বাসস্থান, পোষাক পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র এবং দৈনন্দিন ব্যবহার্য অন্যান্য জিনিসপত্র সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

(৩) **শিল্পকলা:** শিল্পকলার মাধ্যমে একটি সমাজের হাজার বছরের ঐতিহ্য খুঁজে পাওয়া যায়। ঐহিত্যগত উপাদান, কারুকার্যমণ্ডিত জিনিসপত্র, লোকগান, নৃত্য ইত্যাদি যা শিল্পকলার অংশ তা সংস্কৃতির উপাদান।

(৪) **পৌরাণিক কাহিনী ও বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান:** কোনো জাতিগোষ্ঠীর পৌরাণিক কাহিনী, যুদ্ধের বিজয়গাথা, মহাপুরুষের আগমন, দার্শনিক সত্য, বিজ্ঞানের আবিষ্কার ইত্যাদি বিষয় সংস্কৃতির উপাদান।

(৫) **ধর্মীয় আচার-আচরণ:** ধর্মীয় আচার-আচরণ সামাজিক আচার-আচরণকে প্রভাবিত করে। তাই কোনো সংস্কৃতির অনেক উপাদানই সে সংস্কৃতির ধর্মীয় রীতিনীতির মাধ্যমে প্রবেশ করে থাকে। আমাদের দেশে অনেক ধর্মীয় আচার-আচরণ সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত।

(৬) **পরিবার এবং সামাজিক ব্যবস্থা:** সাধারণত পরিবার এবং সামাজিক অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আচার আচরণসমূহ পালন করা হয়ে থাকে। তাই বলা যায়, পরিবার এবং সামাজিক ব্যবস্থা সংস্কৃতির দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

(৭) **সম্পত্তি:** সম্পত্তিও সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে বিবেচিত হয়।

(৮) **সরকার:** সরকার ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সংস্কৃতির অপরিহার্য উপাদান।

(৯) **যুদ্ধ:** যুদ্ধবিগ্রহ, যুদ্ধের কলা-কৌশল, জয়-পরাজয় ইত্যাদি সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে স্বীকৃত।

	শিক্ষার্থীর কাজ	**সংস্কৃতির উপাদানসমূহের নাম লিখুন।**	**সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বহুবিধ উপাদান দ্বারা সংস্কৃতি গঠিত। যেমন- ভাষা, প্রতীক. আচার আচরণ, নৈতিকতা, শিল্পকলা, পৌরাণিক কাহিনী, মূল্যবোধ, পরিবর্তিত আচার ও বিশ্বাস ইত্যাদি। এসব উপাদান সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণতা দান করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। নিচের কোনটি সংস্কৃতির উপাদান-

(i) আকাশ (ii) আচার-অনুষ্ঠান

(iii) নৃত্য-কলা (iv) নৈতিকতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii ও iii

(গ) ii, iii ও iv (ঘ) কোনটিই নয়।

২। ক্লার্ক উইজলার একজন –

(ক) রাজনীতিবিদ (খ) অর্থনীতিবিদ

(গ) সমাজবিজ্ঞানী (ঘ) নৃবিজ্ঞানী

পাঠ-২.৩ বাংলাদেশের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

Characteristics of Culture of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	সংস্কৃতি, সংস্কৃতির ব্যবধান, পরিবর্তনশীলতা, সংকর সংস্কৃতি, আকাশ সংস্কৃতি, বিশ্বায়ন।

বাংলাদেশের মানুষের সংস্কৃতির যে বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তা এই সংস্কৃতিকে অন্য সংস্কৃতি থেকে আলাদা স্বকীয়তা দান করেছে। নিচে বাংলাদেশের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলো:

(১) **প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরিত:** বাংলাদেশের সংস্কৃতি মূলত এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে স্থানান্তর হয়। হঠাৎ কোনো দৈব ঘটনার মাধ্যমে এ সংস্কৃতি চালু হয়নি।

(২) **লালিত ঐতিহ্য:** বাংলাদেশের সংস্কৃতি মূলত হাজার বছরের লালিত ঐতিহ্যকে বুকে ধারণ করে টিকে আছে। আদিম মূল আকড়ে ধরে এ সংস্কৃতি পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

(৩) **পরিবর্তনশীলতা:** পরিবর্তনশীলতা যেকোনো সংস্কৃতিরই একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যে কোনো সংস্কৃতিই পরিবর্তনশীল। সময়ের ব্যবধান একং চাহিদার প্রেক্ষিতে সংস্কৃতির আচার-রেওয়াজ পরিবর্তন হয়। বাংলাদেশের সংস্কৃতিও পরিবর্তনশীল।

(৪) **মূল সংস্কৃতি এক ও অভিন্ন:** বাংলাদেশ যে মৌলিক সংস্কৃতির উপর দাঁড়িয়ে আছে তার পরিবর্তন নেই বললেই চলে। বাংলাদেশের সংস্কৃতির মূল বিষয় হলো বাঙালি সংস্কৃতি।

(৫) **সংকর সংস্কৃতি:** বাংলাদেশের সংস্কৃতির একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো এটি একটি সংকর সংস্কৃতি। প্রাচীন কাল থেকে এই ভূখন্ডে আর্য, দ্রাবিড়, পারসিক, মঙ্গল, আফগান, শিখ, পর্তুগীজ, ফরাসি ইংরেজসহ নানা জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষের আগমন ঘটেছে। এসব জাতির আগমনের ফলে এদের সংস্কৃতির অনেক কিছুই বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে প্রবেশ করেছে। তাই বাংলাদেশের সংস্কৃতি একটি সংকর সংস্কৃতি।

(৬) **সাংস্কৃতিক ঐহিত্য:** বাংলাদেশের সংস্কৃতির রয়েছে এক সাংস্কৃতিক ঐহিত্য যা একে অন্য সংস্কৃতি থেকে আলাদা করেছে। আমরা জানি ভাষা সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আর পৃথিবীতে একমাত্র বাঙালিরাই ভাষার জন্য লড়াই করেছে । আর এর ফলে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আরো সুদৃঢ় হয়েছে।

(৭) **সাংস্কৃতিক ব্যবধান:** বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে সাংস্কৃতিক ব্যবধান বিদ্যমান। শিক্ষার প্রসার, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিচরণ, মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা, সামাজিক গতিশীলতা ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে সাংস্কৃতিক ব্যবধান বিদ্যমান।

(৮) **আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব:** বাংলাদেশের সংস্কৃতি আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত।

(৯) **আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাব:** আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাব বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে দারুণভাবে প্রভাবিত করছে। নানা ধরনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, যেমন- ফেইসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো, ভাইবার, ম্যাসেঞ্জার ইত্যাদি প্রভাবে ঐতিহ্যবাহী সামাজিক সম্পর্কের ধরণ আগের তুলনায় পাল্টে গেছে।

(১০) বিশ্বায়নের প্রভাবঃ বিশ্বায়নের প্রভাবে অন্যান্য সংস্কৃতির অনেক কিছুই বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করছে। পৃথিবীর নানা অঞ্চলের মানুষের আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা, অনুষ্ঠান ইত্যাদি আমাদের সংস্কৃতির উপাদানে পরিণত হচ্ছে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	**বাংলাদেশের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করুন।**	**সময়ঃ ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের সংস্কৃতির অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন- প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তর, লালিত ঐতিহ্য, পরিবর্তনশীলতা,মূল সংস্কৃতি এক ও অভিন্ন, সংকর সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক ঐহিত্য, সাংস্কৃতিক ব্যবধান, আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব, আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাব, বিশ্বায়নের প্রভাব ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। নিচের কোনটি বাংলাদেশের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য-

(i) আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব

(ii) পরিবর্তনশীলতা

(iii) সাংস্কৃতিক ব্যবধান

iv) সবগুলো

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii ও iii

(গ) ii, iii ও iv (ঘ) iv

২। বাংলাদেশের সংস্কৃতি হচ্ছে–

(ক) নগর সংস্কৃতি (খ) সংকর সংস্কৃতি

(গ) আধুনিক সংস্কৃতি (ঘ) ভারতীয় সংস্কৃতি

পাঠ-২.৪ বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনধারা
Cultural Life of Bangladeshi People

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনধারা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	বাংলাদেশ, মানুষ, সংস্কৃতি, জীবনধারা।

বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারা যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। এদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনধারা জানার জন্য আমাদেরকে জীবনধারণ প্রণালী সম্পর্কে জানতে হবে। নিম্নে বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

(১) **ভাষা:** বাংলাদেশের মানুষের ভাষা বাংলা। তবে এই বাংলা ভাষায় অন্যান্য ভাষা থেকে শব্দ এসে এ ভাষার মৌলিকত্বকে নাড়া দিলেও ভাষাকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করেছে। তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব এবং বিভিন্ন বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দ (আরবি, ফার্সি, হিন্দি, উর্দু, তুর্কি, চাইনিজ, জাপানি, বার্মিজ, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, গুজরাটি, মারাঠি, ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ ইত্যাদি) বাংলা ভাষাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে এবং এদেশের মানুষ এই ভাষার মাধ্যমে তাদের ভাবের আদান প্রদান করে থাকে।

(২) **সংকেত বা প্রতীক:** সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সংকেত বা প্রতীক। বাংলা ভাষাই বাংলাদেশের মানুষের অতি গুরুত্বপূর্ণ সংকেত। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা বাংলাদেশের মানুষের জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে লাল-সবুজের এ পতাকা অর্জিত হয়।

(৩) **খাদ্যাভ্যাস:** আমাদের অতি পরিচিত একটি প্রবাদ মাছে ভাতে বাঙালি। মাছে ভাতে বাঙালি বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধারণ করে। বাংলাদেশেরর মানুষ প্রধানত ভাত, মাছ, ডাল, শাক সবজি, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি খেয়ে থাকে। বেশির ভাগ মানুষ তিন বেলাতেই ভাত খায়। তবে অনেকে ভাতের বদলে রুটিও খেয়ে থাকেন। শহর এলাকাতে মানুষ দিনের বিভিন্ন সময় নাস্তাও করে থাকেন। বর্তমানকালে শহর এলাকায় ফাস্টফুড জাতীয় নাস্তার ব্যাপক প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। কোনো উৎসব অনুষ্ঠানে মাংস, রোস্ট, পোলাও, বিরিয়ানি, জর্দা ইত্যাদির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

(৪) **পোষাক-পরিচ্ছদ:** বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ লুঙ্গি, গেঞ্জি, গামছা, পাজামা-পাঞ্জাবি, ফতুয়া পরিধান করে। শহর এলাকায় প্যান্ট, শার্ট, টি-শার্ট, ট্রাউজার, ক্যাপ, ব্লেজার পরিধান করে। মেয়েরা শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট, সালোয়ার কামিজ, বোরকা ইত্যাদি পরিধান করে। গ্রাম কিংবা শহর সবখানে গামছা ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। মেয়েরা পাউডার, নেলপালিশ, টিপ, লিপস্টিক, কাচের চুড়ি, গহনা, ঝুমকা, নাকফুল ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। সনাতন ধর্মের বিবাহিতা মেয়েরা সিঁথিতে সিঁদুর এবং হাতে শাঁখা পরে।

(৫) **বাড়িঘর:** মাটির দেয়ালের উপর শন বা খড়ের চালা বাংলাদেশের মানুষের সংস্কৃতির একটা অংশ। একসময় বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মানুষ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মাটির দেয়ালের উপর টিনের চালার ঘর ব্যবহার করতো। তবে ইদানীং টিনের বেড়া এবং টিনের চাল এবং আধা পাকা ঘরে টিনের চাল, পাকা ভবন দেখা যায়। তবে প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে অঞ্চলভেদে টিনের বেড়ার ঘর এবং মাটির দেয়ালের ঘর পরিলক্ষিত হয়। শহর অঞ্চলে মোটামুটি পাকা ঘরের আধিক্য বেশি এবং বাড়ির ভিতরে সোফাসেট, খাট-পালংক, ডাইনিং টেবিল ইত্যাদি দেখা যায়। গ্রামাঞ্চলে চৌকি, খাট ইত্যাদি বেশি লক্ষ্যণীয়।

(৬) **ধর্ম:** বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ ইসলাম ধর্মে অনুসারী। এছাড়াও এদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের মানুষ বসবাস করে। বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর জনসংখ্যা যেমন-চাকমা, মারমা, হাজং, মণিপুরি, গারো, রাখাইন ইত্যাদি এখানে বসবাস করে এবং তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ইসলাম ধর্মের অনুসারী বাংলাদেশিরা

মসজিদে, হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা মন্দিরে, বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা প্যাগোডায় এবং খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীরা চার্চে যায় তাদের উপাসনা করার জন্য। মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হচ্ছে দুই ঈদ, মিলাদ-উন-নবী ইত্যাদি। এছাড়া নামাজ, রোজা, যাকাত তাদের প্রধান ধর্মীয় রীতি। হিন্দুদের দুর্গাপূজা, কালিপূজা, লক্ষ্মীপূজা, মনসা পূজা, সরস্বতী পূজা এবং বৌদ্ধদের বৌদ্ধপূর্ণিমা ও খ্রিস্টানদের খ্রিস্টমাস, ইস্টার সানডে ইত্যাদি।

(৭) **মৌলিক অর্থনীতি:** বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক। গত কয়েক দশকে ডেইরি, পোল্ট্রি এবং মৎস্য চার গ্রামীণ অর্থনীতি নতুন গতি সঞ্চার করেছে। সাম্প্রতিককালে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রা (রেমিটেন্স) এবং তৈরি পোশাকসহ বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানি আয় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের মধ্যে গ্যাস সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুন্দরবনসহ বনাঞ্চল, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

(৮) **বিনোদন:** বাংলাদেশের মানুষ বিভিন্ন ধরনের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান পালন করে। যেমন- অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব, পৌষ-পার্বণ, পহেলা বৈশাখ, বৈশাখী মেলা ইত্যাদি। যাত্রা, জারিগান, লোকগান, লালনগীতি, মুর্শিদী, ভাটিয়ালি, নজরুলসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত ইত্যাদি এদেশের মানুষের সংস্কৃতিকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে। হাডুডু, দাঁড়িয়াবান্ধা, কানামাছি, গোল্লাছুট-এর পাশাপাশি ফুটবল ও ক্রিকেট জনপ্রিয় খেলা। গ্রামাঞ্চলের মেলাগুলোতে সার্কাস, পুতুলনাচ, নাগরদোলা প্রধান আকর্ষণ। বর্ষবরণ এবং বিজয় দিবস দেশের জাতীয় উৎসব হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

(৯) **শিক্ষা:** বাংলাদেশে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এছাড়াও ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তবে শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষার একটা প্রচলনও লক্ষ্য করা যায়।

(১০) **ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব:** জমিদারী প্রথা বিলোপের পর থেকে ভূমিভিত্তিক ক্ষমতা কাঠামোর কর্তৃত্ব আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে রাজনৈতিক প্রভাব, নগদ অর্থ, শিক্ষা, প্রশাসনের সাথে সম্পর্ক, প্রযুক্তির উপর মালিকানা প্রভৃতি উপাদানের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনধারা চিহ্নিত করুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মানুষের সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে ঘর-বাড়ির ধরন, পোশাক-পরিচ্ছদ, অর্থ-ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, খাদ্যাভাস, ধর্ম, সাহিত্য, শিক্ষাব্যবস্থা, খেলাধুলা ইত্যাদি। বাংলাদেশের মানুষের ভাষা বাংলা। তবে এই বাংলা ভাষায় অন্যান্য ভাষা থেকে শব্দ এসে এ ভাষাকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করেছে। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ ইসলাম ধর্মে অনুসারী। এছাড়াও এদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের মানুষ বসবাস করে। বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর জনসংখ্যা যেমন-চাকমা, মারমা, হাজং, মণিপুরী, গারো, রাখাইন ইত্যাদি এখানে বসবাস করে এবং তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। বাংলাদেশের মানুষের জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতীক কী?

(ক) নৌকা (খ) জাতীয় পতাকা

(গ) সংসদ ভবন (ঘ) শাপলা

২। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে বর্তমানে কোন উপাদান বেশি প্রভাব বিস্তার করছে?

(ক) নগদ অর্থ (খ) শিক্ষা

(গ) রাজনৈতিক কর্তৃত্ব (ঘ) সবগুলো

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১। অবস্তুগত সংস্কৃতির উদাহরণ হচ্ছে–
(ক) বিশ্বাস-মূল্যবোধ (খ) ধর্ম, আইন
(গ) কোনোটি নয় (ঘ) 'ক' ও 'খ' উভয়

২। বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক ব্যবধান কেন তৈরি হচ্ছে?
(ক) শিক্ষার প্রসারে (খ) জলবায়ুর পরিবর্তনে
(গ) প্রযুক্তি বিকাশে (ঘ) একক পরিবারের কারণে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

বাংলাদেশের সংস্কৃতির অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন- প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তর, লালিত ঐতিহ্য, পরিবর্তনশীলতা,মূল সংস্কৃতি এক ও অভিন্ন, সংকর সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক ঐহিত্য, সাংস্কৃতিক ব্যবধান, আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব, আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাব, বিশ্বায়নের প্রভাব ইত্যাদি।

৩। "সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের সমগ্র সৃষ্টি" কে বলেছেন?
(ক) ই.বি টেইলর (খ) জোনস
(গ) অগাস্ট কোঁৎ (ঘ) হার্বার্ট স্পেন্সার

৪। সংস্কৃতির মূল ধরন দু'টি কি কি?
(ক) আদিম-আধুনিক (খ) বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক
(গ) বস্তুগত-অবস্তুগত (ঘ) পাশ্চাত্য-এশীয়

খ) সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্নঃ

উদ্দীপকটি পড়ুন এব নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

রফিক উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শাখার ছাত্র। তার বন্ধু শাওন মানবিক শাখায় পড়ে। একদিন রফিক শাওনকে বললো, আজ সোনার বাংলা অডিটোরিয়ামে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা আছে। শাওন রফিককে প্রশ্ন করলো, 'বল তো সংস্কৃতি কী'? রফিক আত্মবিশ্বাসের সাথে বললো, 'গান, কবিতা, নাটক, নৃত্য, কৌতুক অর্থাৎ যাকিছু আমাদের বিনোদন দেয় তাই সংস্কৃতি'। এরপর শাওন সমাজবিজ্ঞানে সংস্কৃতি বলতে কী বুঝায়, এর উপাদান ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রফিকের সাথে আলোচনা করলো।

১) সংস্কৃতি কাকে বলে? ১
২) সংস্কৃতির ধরনগুলো কি কি, উদাহরণ দিন। ২
৩) 'রফিক যেগুলোকে সংস্কৃতি বলেছে তা মূলত সংস্কৃতির একটি অংশ বা উপাদান'– কীভাবে? ৩
৪) "সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদান অপেক্ষা অবস্তুগত উপাদানের পরিবর্তন হয় ধীরে"– ব্যাখ্যা করুন। ৪

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১ : ১। খ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২ : ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩ : ১। ঘ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪ : ১। খ ২। ঘ
চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ১। ঘ ২। ক ৩। খ ৪। গ

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ
Development of Society and Civilization Based on Archaeological Relics

ইউনিট ৩

প্রত্নতত্ত্ব মানুষের অতীত কর্মকাণ্ডের অধ্যয়ন। প্রাগৈতিহাসিক সময়ের বস্তুগত ও অবস্তুগত সহস্কৃতি সম্পর্কে প্রত্নতত্ত্ব আমাদেরকে সুনির্দিষ্ট ধারণা দেয়। প্রত্নতত্ত্ব প্রাচীনকালের মানুষের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি, স্থাপত্য, জীবন-যাপনের কৃৎকৌশল, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উপকরণ ও জৈবিক উপাদানসমূহ (ফসিল) অধ্যয়ন করে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির নানা দিক সম্পর্কে জানতে প্রত্নততত্ত্বের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মানুষের প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে জ্ঞানের যে শাখা সৃষ্টি হয়েছে তাকে প্রত্নতত্ত্ব বলে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে শত শত বা হাজার হাজার বছর আগের প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবাশ্ম ও মানুষের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য, যুদ্ধাস্ত্র, কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি মাটি খুঁড়ে বের করেন। প্রাচীন সভ্যতার সময় নির্ধারণ, সাংস্কৃতিক ও প্রতিবেশিক পরিস্থিতি যাচাইয়ে এসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের গুরুত্ব অনেক বেশি। প্রত্নতাত্ত্বিক সময় নির্ধারণের জন্য রেডিও কার্বন ডেটিং পদ্ধতি ও রেডিও একটিভ পটাশিয়াম পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এসব পদ্ধতির মাধ্যমে জীবাশ্ম বা প্রত্নসম্পদের বয়স বা প্রাচীনত্ব নির্ধারণ করা হয়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৭ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৩.১ : প্রত্নতত্ত্বের সংজ্ঞা এবং এর উৎসসমূহ
পাঠ- ৩.২ : প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে সমাজের শ্রেণি বিভাগ এবং প্রাচীন, মধ্য ও নব্যপ্রস্তর যুগের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য
পাঠ- ৩.৩ : তাম্র, ব্রোঞ্জ ও লৌহযুগের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য
পাঠ- ৩.৪ : বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ : ময়নামতি
পাঠ- ৩.৫ : পাহাড়পুর
পাঠ- ৩.৬ : মহাস্থানগড়
পাঠ- ৩.৭ : উয়ারি-বটেশ্বর

পাঠ-৩.১ প্রত্নতত্ত্বের সংজ্ঞা এবং এর উৎসসমূহ
Definition of Archaeology and Its Sources

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- প্রত্নতত্ত্বের উৎসসমূহ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	প্রত্নতত্ত্ব, খনন কাজ, এরিয়াল জরিপ, রিমোট সেন্সিং, জরিপ পদ্ধতি, প্রত্নতত্ত্বের উৎস।

খনন কাজের মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন সভ্যতার বিভিন্ন উপাদান উদ্ধার ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে প্রত্নতত্ত্ব (Archaeology)। Archaeology শব্দটি গ্রিক Archaeos এবং Logia শব্দ থেকে উদ্ভুত, যার অর্থ হচ্ছে প্রাচীন অধ্যয়ন। প্রাচীন সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎস অনুসন্ধানে প্রত্নতত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রত্নতত্ত্বের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে, লিখিত উপাদান ছাড়াও কেবল ব্যবহার্য সামগ্রী বা অলিখিত উপাদান থেকে ধ্বংস হয়ে যাওয়া সভ্যতার নানা বৈশিষ্ট্য উদঘাটন করা যায়। উইলিয়াম কার্নিংটনকে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজের মূল উদ্যোক্তা হিসেবে মনে করা হয়।

অক্সফোর্ড লিভিং ডিকশনারি অনুসারে, খনন কাজের মাধ্যমে ইতিহাস ও প্রাক-ইতিহাসকে অধ্যয়ন করা এবং সময়ের সাথে সাথে টিকে থাকা বিভিন্ন দ্রব্য ও অস্তিত্বশীল বস্তুর বিশ্লেষণকে প্রত্নতত্ত্ব বলা হয়। সোসাইটি ফর আমেরিকান আর্কিওলজির মতে, প্রত্নতত্ত্ব হচ্ছে প্রাচীন মানব ইতিহাসের টিকে থাকা উপাদানসমূহের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান। নৃবিজ্ঞানী হোবেল (Hoebel) তাঁর *Anthropology: The Study of Man* গ্রন্থে বলেছেন, প্রত্নতত্ত্ব আদিম মানুষের পরিত্যক্ত দ্রব্যসামগ্রী এবং তাদের ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদসহ বস্তুগত সংস্কৃতির যেসব দিক এখনো উদ্ধার হয়নি সেগুলো উদ্ধারে সচেষ্ট।

ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী ই.বি. টেইলর বলেন, প্রত্নতত্ত্ব অতীতের ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন (Archaeology is the study of remains of the past)। নৃবিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে প্রত্নতত্ত্বের অধ্যয়ন শুরু হলেও এটি এখন স্বতন্ত্র শাস্ত্র (Discipline) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বিকাশমান এ শাস্ত্রটির অনেকগুলো শাখা রয়েছে। যেমন, প্রাগৈতিকহাসিক প্রত্নতত্ত্ব, ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব, পরিবেশ প্রত্নতত্ত্ব, প্রত্ন-উদ্ভিদবিদ্যা, জলগর্ভস্থ প্রত্নতত্ত্ব, জাদুঘর অধ্যয়ন, ঐতিহ্য ব্যবস্থাপনা, নগর ব্যবস্থাপনা, লোকপ্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি।

প্রাচীন কোনো নির্দশন উদঘাটনের লক্ষ্যে খনন কাজ পরিচালনা করার আগে ভৌগোলিক এলাকা সনাক্তকরণের জন্য রিমোট সেন্সিং ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও মাঠ জরিপ পদ্ধতি, এরিয়াল জরিপ, ভৌগোলিক জরিপ পদ্ধতিও ব্যবহৃত হয়। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য খনন কাজকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয়। খননের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাদানের বয়স কার্বন ডেটিং পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা হয়।

প্রত্নতত্ত্বের উৎসসমূহ (Sources of Archaeology)

প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তি হচ্ছে নিয়মতান্ত্রিক খনন কার্যক্রম। খননকাজের মাধ্যমে অতীত-ইতিহাস উন্মোচিত হয়। খননের মাধ্যমে প্রাপ্ত হাড়, মাথার খুলি, ব্যবহার্য সামগ্রী, অস্ত্র, যন্ত্রপাতি, তৈজসপত্র, আসবাবপত্র ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রাচীন যুগের মানব সমাজ ও তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে কার্যকর ধারণা পাওয়া যায়। বহুবিধ উৎস থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন উদঘাটন করা যায়। যেমন:

১) লিখিত উৎস: খনন কাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত সাহিত্য, দলিল-দস্তাবেজ, লিপি প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত। এসব থেকে প্রাচীন সমাজ ও সভ্যতার সময়কাল, শাসকবর্গ, তাদের শাসনকার্য, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কার্যকর ধারণা লাভ করা যায়।

২) মৌখিক উৎস: প্রাচীন লোককথা, গল্প, কেচ্ছা-কাহিনী, রূপকথা ইত্যাদি প্রত্নতত্ত্বের মৌখিক উৎস হিসেবে স্বীকৃত। যুগ যুগ কিংবা বংশ পরম্পরায় এসব মৌখিক উৎস সমাজে চলমান থাকে। সাধারণত বয়োজ্যেষ্ঠদের নিকট থেকে এগুলো পরবর্তী প্রজন্মে হস্তান্তরিত হয়।

৩) রাজপ্রাসাদ ও মন্দির বা ধর্মশালা: খনন কাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত নগরীর রাজপ্রাসাদ, মন্দির বা ধর্মশালা প্রত্নতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এর মাধ্যমে প্রাচীন সমাজের নির্মাণ কৌশল, রুচিবোধ এবং ধর্মবোধের নিদর্শন স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়।

৪) শিলালিপি, চিত্রলিপি গুহাচিত্র: প্রাচীন যুগে কাগজ ছিলো না। মানুষ তার মনের কথা, প্রয়োজনীয় বার্তা, তথ্যাবলী, নির্দেশ, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি পাথর, পর্বতগাত্র, তামারপাত্র ইত্যাদিতে বিশেষ লিপির মাধ্যমে লিখে রাখত। বিশেষ করে রাজ্য শাসন প্রণালী সম্পর্কীয় বিষয়াবলি লিপির মাধ্যমে কঠিন পর্বতগাত্রে খোদাই করে রাখা হতো।এগুলো থেকে রাজ্য শাসনের কাল, রাজ্যের বিস্তৃতি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারেন।

৫) মুদ্রা, দেবদেবীর মূর্তি: মুদ্রার মাধ্যমে বিভিন্ন রাজার রাজত্বকাল, শাসকদের নাম ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়। দেবদেবীর মূর্তি থেকে মানুষের জীবনের ধর্মীয় চিন্তাধারায় এবং শিল্পে নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলো থেকে মানুষের ক্রমবিবর্তনের ধারা এবং সাধারণ মানুষের জীবন দর্শনও উপলব্ধি করা যায়।

৬) আসবাবপত্র ও হাতিয়ার: আসবাবপত্র ও হাতিয়ার দেখে যুগকে চিহ্নিত করা যায়। যেমন– প্রস্তর যুগ, লৌহ যুগ, তাম্র যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ ইত্যাদি। সে যুগের মানুষ যে অস্ত্র ব্যবহার করতো তা নির্মিত হতো এসব ধাতুর মাধ্যমে। বিভিন্ন সময়ের আসবাবপত্র ও হাতিয়ার দেখে মানব সমাজের পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

৭) স্মৃতিফলক: প্রত্নতত্ত্বের উৎস হিসেবে স্মৃতিফলকের গুরুত্ব আছে। স্মৃতিফলক দেখে অতীত জীবনধারা সম্পর্কে জানতে পারা যায়। আর.এল ব্রাইন স্মৃতিফলকের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। তার মতে, "স্মৃতিফলক জীবনধারার সাক্ষী, সমাজচিত্রের দর্পন এবং মানুষের পেশা ধারণার অবলম্বন।"

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রত্নতত্ত্বের উৎসসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

প্রাচীন বা প্রাগৈতিহাসিক কালের প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবাশ্ম ও মানুষের ব্যবহার্য সামগ্রী, যুদ্ধাস্ত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাটি খুঁড়ে বের করে সে সম্পর্কে অধ্যয়ন করা হচ্ছে প্রত্নতত্ত্ব। নৃবিজ্ঞান প্রত্নতত্ত্বকে এর অন্যতম শাখা হিসেবে অধ্যয়ন করে। তবে প্রত্নতত্ত্ব এখন স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত। খনন কাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত লিখিত, অলিখিত বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত উপাদান এ শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ ও বিকশিত করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রত্নতত্ত্বের শাব্দিক অর্থ কী?

ক) প্রাচীন অধ্যয়ন খ) মানুষের বিজ্ঞান

গ) সামাজিক গবেষণা ঘ) কোনটিই নয়।

২। কোন পদ্ধতিতে খননের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাদানের বয়স নির্ধারণ করা হয়?

ক) এরিয়াল জরিপ পদ্ধতিতে খ) মাঠ জরিপ পদ্ধতিতে

গ) ভৌগোলিক জরিপ পদ্ধতিতে ঘ) কার্বন ডেটিং পদ্ধতিতে

পাঠ-৩.২ প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে সমাজের শ্রেণি বিভাগ এবং প্রাচীন, মধ্য ও নব্যপ্রস্তর যুগের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য

Types of Society based on Archaeology and Socio-Economic Characteristics of Paleolithic, Mesolithic and Neolithic Age

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে সমাজের ধরন বলতে পারবেন;
- প্রাচীন প্রস্তর যুগের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মধ্য প্রস্তর যুগের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন;
- নব্য প্রস্তর যুগের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	প্রাচীন প্রস্তর যুগ, প্রস্তর যুগ মধ্য, নব্য প্রস্তর যুগ।

সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই আদিম সমাজ থেকে আধুনিক সমাজের উদ্ভব ও বিকাশ সাধিত হয়েছে। ধীরে ধীরে পরিবর্তনের মাধ্যমে উন্নত রূপ লাভ করাকে সমাজের বিবর্তন বলে অভিহিত করা হয়। বিবর্তনের মাধ্যমেই সমাজ প্রাগৈতিহাসিক বা প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক যুগে পদার্পন করেছে। নানা উপাদান ও দৃষ্টিকোণ থেকে মনীষীরা বিবর্তিত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি বিভাজন করেছেন। ফলে সমাজের বিভিন্ন ধরন পরিলক্ষিত হয়। খনন কাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাদানের ভিত্তিতে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সমাজের কতগুলো ধরন বা স্তর চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হচ্ছে:

ক) প্রস্তর যুগ (Lithic age)

এর আবার তিনটি উপ-বিভাগ রয়েছে। যথা:

i. প্রাচীন প্রস্তর যুগ (Paleolithic age)
ii. মধ্য প্রস্তর যুগ (Mesolithic age)
iii. নব্য প্রস্তর যুগ (Neolithic age)

খ) তাম্রযুগ (Copper age)

গ) ব্রোঞ্জ যুগ (Bronze age)

ঘ) লৌহ যুগ (Iron age)

উল্লিখিত প্রতিটি সমাজের স্বকীয় আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজেরও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ পরিবর্তন মূলত উন্নতি ও সমৃদ্ধির। অভিজ্ঞতা, প্রয়োজনীয়তা এবং প্রচেষ্টা মানুষকে নতুন জ্ঞান ও আবিষ্কারের সন্ধান দিয়েছে। মানুষের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় সমাজ হয়েছে আরো উন্নত। বিবর্তিত সমাজের শ্রেণি বিভাজনের মধ্য দিয়ে আমরা সে বার্তাই পাই।

প্রাচীন প্রস্তর যুগ

প্রাচীন প্রস্তরযুগ-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Paleolithic Age। গ্রিক শব্দ Palaeo (পুরো > পুরাতন) এবং Lithos (পাথর) শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে Paleolithic/Palaeolithic শব্দটি গঠিত। এ যুগটি ছিল প্রস্তরযুগের প্রথম পর্যায়। প্রাগৈতিহাসিক এ যুগকে সময়ের হিসেবে সবচেয়ে দীর্ঘতম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ১০ থেকে ১৫ লক্ষ খ্রিস্টপূর্ব অব্দ পর্যন্ত প্রাচীন প্রস্তরযুগের সময়কাল বিবেচনা করা হয়। তবে প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি না পাওয়ায় আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ইতিহাস গবেষকেরা এ যুগের সময়কাল সংক্ষিপ্ত করে ১ লক্ষ থেকে ১০ হাজার বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন। এ যুগে অবিকৃত, অমসৃণ ও স্থূল পাথরের অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে। যাবতীয় তথ্য-প্রমাণ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, মানবসভ্যতার প্রাথমিক বিকাশ প্রাচীন

প্রস্তরযুগ বা পুরোপলীয় যুগেই ঘটেছিলো। প্রাচীন প্রস্তরযুগটি ছিল প্রস্তরযুগের প্রথম পর্যায়। নিম্নে প্রাচীন প্রস্তরযুগের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

ক) খাদ্য: প্রাচীন প্রস্তরযুগের মানুষ ছিল খাদ্য-সংগ্রহকারী। শিকার ও খাদ্য আহরণের দ্বারা মানুষ ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করত। খাদ্যতালিকায় ছিল ফলমূল, লতাগুল্ম, শাক-সবজি, পাখির ডিম, কীট-পতঙ্গ, ছোট বড় জীবজন্তুর মাংস, শামুক, ঝিনুকসহ জলজ অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণী ইত্যাদি।

খ) বাসস্থান: পুরোপলীয় যুগে দীর্ঘদিন মানুষ গাছের ডালে, গাছের কোটরে, পাহাড়ের গুহায়, মাটির গর্ত প্রভৃতি স্থানে বসবাস করত। পরবর্তীতে তারা ঘরবাড়ি বানানোর কৌশল আয়ত্ত করে।

গ) বস্ত্র ও অলঙ্কার: পুরোপলীয় যুগের মানুষ প্রথমদিকে জীবজন্তুর মতো উলঙ্গ থাকত। পরবর্তীতে তারা গাছের পাতা, ছাল-বাকল ইত্যাদি লজ্জা-নিবারণে ব্যবহার করত। শেষ পর্যায়ে এসে পশুর চামড়া ও লোম দিয়ে পোশাক তৈরি করত। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গহনা ব্যবহারের প্রচলন ছিল।

ঘ) হাতিয়ার: প্রাচীন প্রস্তরযুগের মানুষ বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার তৈরি করত। পাথরের পাশপাশি বাঁশ, গাছের ডাল, পশুর হাড়, দাঁত, শিং ইত্যাদি দিয়েও হাতিয়ার তৈরি করা হত।

ঙ) সমাজ জীবন: প্রাকৃতিক বৈরিতা এবং শ্বাপদসংকুল পরিবেশে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মানুষ প্রাচীন প্রস্তর যুগেই যূথবদ্ধ জীবন-যাপন শুরু করে। পরিবার ও সমাজের নেতৃত্ব বিষয়ে বিতর্ক থাকলেও অনেকেই মনে করেন যে তখন পরিবার ও সমাজের নেতৃত্ব নারীদের ওপর ন্যস্ত ছিল।

চ) ধর্ম: প্রাকৃতিক বৈরিতা থেকে মুক্তি, শিকারি জীবনকে সফল করা, আত্মরক্ষা, পূর্বপুরুষের কৃপালাভ প্রভৃতি কারণে এ যুগের মানুষ অদৃশ্য শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করত। এভাবে তাদের মনে একটা ধর্মীয় অনুভূতির জন্ম হয়। সমাজবিজ্ঞানী ডুর্খেইম (Durkheim) আদিম ধর্মীয় বিশ্বাসকে টোটেম (Totem) বলে অভিহিত করেছেন।

ছ) চিত্র/শিল্পকলা: প্রাচীন প্রস্তযুগের মানুষ গুহার ভিতরে চিত্রকলার মাধ্যমে তাদের শিকারি জীবন, প্রাণি শিকারের দৃশ্য, ব্যবহৃত হাতিয়ারাদি, বসন-ভূষণ, জীবনযাপন পদ্ধতি, সংস্কৃতিবোধ, শিল্পবোধ, জাদুবিশ্বাস, ধর্মীয় চেতনা, দার্শনিক চিন্তা ইত্যাদি চিত্রকলা ফুটিয়ে তুলেছে।

জ) আবিষ্কার: প্রস্তরযুগেই মানুষ আগুন আবিষ্কার করেছিল। তারা আগুনের ব্যবহার জানত এবং তা সংরক্ষণ করতে পারতো।

ঝ) শ্রম বিভাজন: প্রাচীন প্রস্তরযুগে খাদ্য সংগ্রহ কর্মকান্ডে শ্রমবিভাগের সূত্রপাত হয় বলে অনেক পন্ডিত মনে করেন। এসময় মেয়েরা ফলমূল সংগ্রহ, পুরুষেরা শিকার করতো। অল্পবয়সীরা ছোটখাটো জীবজন্তু ও মাছ শিকার এবং বয়স্কদের কাজে যথাসম্ভব সহযোগিতা করত। বৃদ্ধরা অস্ত্র তৈরি ও বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে সহায়তা দিত। তৎকালীন সমাজে শ্রমভেদ থেকেই সামাজিক স্তরভেদের জন্ম হয়।

মধ্য প্রস্তর যুগ

মধ্য প্রস্তরযুগ হচ্ছে প্রাচীন প্রস্তরযুগের প্রান্তিক পর্যায় এবং নব্য প্রস্তরযুগের প্রারম্ভিক পর্যায়। ইউরোপে এ যুগ প্রায় ১১ হাজার থেকে ৫ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। আফ্রিকা, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এ যুগের অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। মধ্য প্রস্তরযুগে ইউরোপের তৃণভূমি বা তুন্দ্রা অঞ্চলে গভীর বন-বনানীর সৃষ্টি হয়। চতুর্থ বরফ যুগের পরবর্তী সময়ে বেঁচে যাওয়া মানুষেরা নতুনভাবে প্রকৃতির সাথে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হয় এবং এরা মধ্যপলীয় সংস্কৃতির জন্ম দেয়। এখানে মধ্য প্রস্তরযুগের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

ক) খাদ্য: মধ্য প্রস্তর যুগেও মানুষ ছিল খাদ্য-সংগ্রহকারী। তখনো তারা খাদ্য উৎপাদন করতে শেখেনি। তাদের প্রধান খাদ্য ছিল পশুপাখি ও মাছ। মাছকে শুঁটকি করে তারা সংরক্ষণ করতো। মাছ ছাড়াও তারা বিভিন্ন ধরনের জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীকে খাদ্য তালিকার অর্ন্তভূক্ত করেছিল।

খ) হাতিয়ার: মধ্য প্রস্তরযুগের মানুষ পূর্বের তুলনায় হাতিয়ারের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। এ সময়ের প্রধান অস্ত্র ছিল তীর-ধনুক। এ যুগে মৎস্য শিকারে বঁড়শি, হারপুন, নৌকা, জাল ব্যবহৃত হতো। হাত-কুঠার ছাড়াও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রে তারা কাঠের হাতল সংযুক্ত করেছিল। পশুর হাড়, শিং ইত্যাদি দিয়েও অস্ত্র তৈরি হতো।

গ) ধর্ম: মধ্যপ্রস্তরযুগের মানুষ ধর্ম ও জাদুবিদ্যায় বিশ্বাসী ছিল। সর্বপ্রাণবাদ, মহাপ্রাণবাদ, বস্তুভক্তি ও পূর্বপুরুষ পূজা ছিল তাদের ধর্ম সংক্রান্ত মূল মতবাদ।

ঘ) সমাজ জীবন: মধ্যপলীয় যুগের মানুষ ছিল আধা-যাযাবর, আধা-স্থায়ী। এ যুগের মানুষ মূলত দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি শাখা নদী ও সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল এবং অন্যটি মূল ভূমিতেই অবস্থান করে। মধ্যপলীয় যুগে মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে বসবাস করত। অন্তঃ ও আন্তঃদলীয় সম্পর্ক ভালো ছিল।

ঙ) চিত্র/শিল্পকলা: এ সময় চিত্রকলায় আগের তুলনায় বিষয়বস্তু এবং অঙ্কন রীতিতে পরিবর্তন আসে। জ্যামিতিক নকশার আনুকরণে মানুষ ও জীবজন্তুর মূর্ত ছবিও গুহার দেয়ালে অঙ্কন করা হত। জলাশয়ের তীরবর্তী বসবাসকারী মানুষের চিত্রকর্মে পানি ও পানিনির্ভর জীবনযাপন প্রণালী প্রতিফলিত হয়েছে।

চ) আবিষ্কার: মধ্য প্রস্তরযুগের মানুষেরা আগুনের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে এবং পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনার ব্যবহার বাড়ায়। ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তির ধারণার প্রাথমিক বিকাশও এ সময়ে ঘটেছে বলে মনে করা হয়।

নব্য প্রস্তর যুগ

'নব্যপ্রস্তর' শব্দটি এসেছে ইংরেজি Neolithic প্রতিশব্দ থেকে। গ্রিক শব্দ Neo (নব > নতুন) এবং Lithos (পাথর) এর সমন্বয়ে Neolithic শব্দটির উদ্ভব। বিখ্যাত ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ Sir John Lubbock ১৮৬৫ সালে প্রথম Neolithic শব্দটি ব্যবহার করেন। আনুমানিক ৮০০০-৩৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে নব্য প্রস্তরযুগের প্রথম বিকাশ ঘটে। অতঃপর ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল এবং অবশেষে খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে ইংল্যান্ডে এ যুগের সূচনা হয়। সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে নব্য প্রস্তরযুগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক গর্ডন চাইল্ড (Gordon Childe) খাদ্য আহরণ পর্যায় থেকে খাদ্য উৎপাদনের জন্য কৃষিকাজে উত্তরণকে নব্য প্রস্তরযুগের বিপ্লব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। নিম্নে নব্য প্রস্তরযুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

ক) খাদ্য উৎপাদনের সূচনা: কৃষিকাজের মাধ্যমে নব্য প্রস্তরযুগের মানুষেরা খাদ্য-উৎপাদনমুখী এক সৃজনশীল যুগের সূচনা করে। প্রকৃতপক্ষে কৃষিকাজের সূচনা করাই ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানব সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় উদ্ভাবন। এ সময়ের উৎপাদিত ফসল হল গম, যব, মটরশুঁটি, ডাল, কাউন, জোয়ার, মিষ্টি আলু, ভুট্টা, সীম, বরবটি, লাউ, নারকেল, খেজুর, জলপাই, ডুমুর, আঙ্গুর, এবং অসংখ্য লতা-পাতা, শাক-সবজি ইত্যাদি।

খ) পশু পালন: মানুষের শিকারের সঙ্গী হয়েছিল কুকুর। এক পর্যায়ে কুকুর গৃহপালিত পশুতে পরিণত হয়। পশুর দুধ, মাংস এবং পাখির ডিম তাদের খাদ্যের অনিশ্চয়তা দূর করে এবং চামড়া বস্ত্রের চাহিদা মেটায়। এছাড়াও পরিবহন, ভূমি কর্ষণ, পশু-সংগ্রহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পশুর ব্যবহার ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পশু-পাখির গৃহপালিতকরণ নবোপলীয় যুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য।

গ) গৃহ নির্মাণ: নব্য প্রস্তরযুগের শেষদিকে এসে গুহাবাসী মানুষ কৃত্রিম আবাসস্থল গড়ে তোলে। প্রথমে তারা বনের গাছপালা ও তৃণ দিয়ে কুড়েঘর নির্মাণ করতো। রোদ-বৃষ্টি, ঝড়সহ যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে আত্মরক্ষার জন্য গৃহ ছিল নিরাপদ আশ্রয়স্থল। কালক্রমে মানুষ গৃহের বহুবিধ উন্নতি সাধন করেছিল।

ঘ) হাতিয়ার: নব্য প্রস্তরযুগের হাতিয়ার অধিক মসৃণ, ধারালো, হালকা ও কার্যকরী করে তৈরি করা হত। হাতিয়ারের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্যই এ যুগকে নয়া পাথরের যুগ বলে অভিহিত করা হয়। এ যুগের শেষ দিকে কৃষিকাজে লাঙলের ব্যবহারও শুরু হয়।

ঙ) আবিষ্কার: নব্য প্রস্তরযুগের গুরুত্বপূর্ণ একটি কীর্তি হল চাকার আবিষ্কার। চাকার আবিষ্কার, মৃৎশিল্প, তাঁতশিল্প, পরিবহন এবং যুদ্ধকৌশলে (যুদ্ধে পাথর ব্যবহার) পরিবর্তন ঘটায়। কৃত্রিম পদ্ধতিতে আগুন জ্বালানোর কৌশল আয়ত্ত্ব এবং এর ব্যাপক ব্যবহার নব্য প্রস্তর যুগের অর্জন। মূলত চকমকি পাথর ছিল এ সময়ের মানুষের দিয়াশলাই। উদ্বৃত্ত ফসল সংরক্ষণ, রন্ধনকার্য, খাদ্য ও পানীয় সংরক্ষণ কাজে মৃৎপাত্র ব্যবহার করা শুরু হয়। নব্য প্রস্তরযুগের শেষ পর্যায়ে এসে সীমিত আকারে তামার ব্যবহার শুরু হয়।

চ) বস্ত্রশিল্প: এ যুগে তাঁত বা বয়ন শিল্পের বিকাশ ঘটে। বয়নশিল্পে প্রথম শণ, পরে ভেড়া ও ছাগলের লোম, তুলা এবং শেষে রেশমগুটি কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ যুগে এশিয়াতে তুলা উৎপাদন শুরু হলে তাঁতশিল্পের অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়।

ছ) শ্রম বিভাজন: নব্য প্রস্তরযুগে শ্রম বিভাজন সংহত রূপ লাভ করে। এ সময় পুরুষেরা হাতিয়ার তৈরি, পশুপালন, শিকার, ঘরবাড়ি তৈরি ও কৃষিকাজ করত। নারীরা ফসল সংরক্ষণ, বস্ত্রবয়ন, মৃৎপাত্র তৈরি, সন্তান প্রতিপালন ও ঘরকন্যার কাজে ব্যস্ত থাকত।

জ) সামাজিক অবস্থা: নব্য প্রস্তরযুগে বিবাহ ও পরিবার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এ সময়ে সংঘবদ্ধভাবে বসবাস অনিবার্য হওয়ায় মানুষ ক্ল্যান, পরিবার ও ট্রাইব গঠন করে। পরিবার নবোপলীয় যুগের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। নবোপলীয় যুগে মানুষের মধ্যে সত্যিকার অর্থে সামাজিক শ্রেণিভেদ বা স্তরভেদ দেখা দেয়। দলপতির আবির্ভাব, যুদ্ধে পরাজিতদের দাসে পরিণতকরণ, ধর্মগুরু ও অভিজাত শ্রেণি সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে সমাজে শোষক-শোষিত বা প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। ক্ষমতা, ধন-সম্পত্তি এবং মর্যাদাকে কেন্দ্র করেও সামাজিক স্তরভেদ প্রকট হয়ে ওঠে। নব্য প্রস্তরযুগে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। ।

ঝ) ভাষা ও শিল্পকলার বিকাশ: নব্য প্রস্তরযুগে কথ্যভাষার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। মনের ভাব প্রকাশের জন্য কথা বা ভাষার ব্যবহার শুরু হয়। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, অঙ্কন, প্রভৃতি শাখায়ও বিকাশ লাভ করে।

ঞ) ধর্ম ও যাদুবিদ্যা: নবোপলীয় যুগে রোগ-শোক, মৃত্যু, মৃত্যু-পরবর্তী জীবন, বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কীট-পতঙ্গ ও জীবজন্তুর হাত থেকে নিজেদের জীবন ও ফসল রক্ষা, শিকার, যুদ্ধজয়, শুভ-অশুভ ধারণা, আত্মা-প্রেতাত্মায় বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয় থেকে যাদুবিদ্যা ও ধর্মবিশ্বাস প্রবল হয়ে ওঠে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নব্য প্রস্তরযুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

মানব সভ্যতার সূচনা হয়েছিল প্রাচীন প্রস্তর বা পুরোপলীয় যুগে। মধ্য ও নব্য প্রস্তর যুগে সভ্যতার বিকাশ সাধিত হয়েছে। নব নব আবিষ্কার মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে নতুনত্ব এনেছে। গুহাবাসী মানুষ হয়েছে গৃহবাসী। শিকার ও সংগ্রহভিত্তিক অনিশ্চিত অর্থনীতি থেকে মানুষ খাদ্য উৎপাদনের নিরাপদ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেল খাদ্যের নিশ্চয়তা মানুষের সৃজনশীলতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সমাজে শ্রমবিভাজন, শ্রেণি বৈষম্য প্রভৃতি নতুন নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সমাজের কয়টি শ্রেণি বিভাজন (স্তর) করেছেন?
- ক) চারটি
- খ) পাঁচটি
- গ) ছয়টি
- ঘ) সাতটি

২। Neolithic শব্দটি
- ক) ফরাসি
- খ) জার্মান
- গ) ল্যাটিন
- ঘ) গ্রিক

৩। "নবপলীয় বিপ্লব" শব্দটি কে ব্যবহার করেন?
- ক) গর্ডন চাইল্ড
- খ) ই. বি. টেইলর
- গ) ডুর্খেইম
- ঘ) ম্যাক্স ওয়েবার

পাঠ-৩.৩ তাম্র, ব্রোঞ্জ ও লৌহযুগের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য

Socio-Economic Characteristics of Copper, Bronze and Iron Age

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- তাম্র যুগের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ব্রোঞ্জ যুগের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন;
- লৌহ যুগের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	তাম্র যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ, লৌহযুগ।

প্রত্নতাত্ত্বিক যুগের শেষ পর্যায়গুলো যথাক্রমে তাম্রযুগ, ব্রোঞ্জযুগ এবং লৌহযুগ। তাম্রযুগে হাতুড়ি ও অন্যান্য ধারালো অস্ত্র তৈরিতে তামার ব্যবহার শুরু হয়। তাছাড়া তামার মুদ্রা ও তামার তৈজসপত্রও ব্যবহৃত হতো। এরপর তামা ও টিনের সংমিশ্রণে ব্রোঞ্জ নামক ধাতব পদার্থটি তৈরি হয়। ব্রোঞ্জযুগের বড় সাফল্য হলো লেখার আবিষ্কার। লৌহযুগে বর্ণমালাভিত্তিক লিখন পদ্ধতি, কৃষি, শিল্প, যানবাহন, গৃহনির্মাণ, যন্ত্রপাতি তৈরি, যাতায়াত ব্যবস্থা তথা প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে লোহার ব্যাপক ব্যবহার আধুনিক সভ্যতার জন্ম দেয়।

তাম্রযুগ

খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দের শেষ দিকে ইউরোপে এবং নিকট প্রাচ্যে তাম্র যুগের সূচনা ঘটে। তাম্রযুগে প্রবেশের মধ্য দিয়ে নগর সভ্যতার সূচনা হয়। তবে তাম্রযুগে পাথরের ব্যবহারও চলমান ছিল। তামার ব্যবহার ছিল সভ্যতার নতুন সংযোজন। এ অবস্থাকে তাম্রপলীয় যুগ নামে আখ্যায়িত করা হয়। মানুষের প্রথম ব্যবহৃত ধাতু হলো তামা। ধারণা করা হয় যে, কৃষিযুগে মাটির হাঁড়ি-পাতিল পোড়াতে গিয়ে প্রথম তামা আবিষ্কৃত হয়। কারণ মালাকাইট (তামার আকর) পুড়লে তামা গলে আলাদা হয়ে বেরিয়ে আসে। প্রাচীন মিশর, সিরিয়া ও অ্যাসিরিয়ার অধিবাসীরা ব্যাপকভাবে তামার ব্যবহার জানত। বস্তুত সুমেরের নগরসভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল তামা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। তবে তামার দুষ্প্রাপ্যতা এবং এর কিছুকাল পর ব্রোঞ্জযুগের আগমনে তাম্রযুগ দীর্ঘায়িত হয়নি।

পাথরের স্থলে তামার হাতিয়ার ও তৈজসপত্রের ব্যবহারের কারণে শ্রমের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পায়। ফলে মানব সভ্যতায় প্রথম অর্থনৈতিক শ্রেণি বিভাগ সৃষ্টি হয়। তামা বিক্রি করে কিছু লোক প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শক্তিশালী রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের বিকাশ ঘটে। প্রাচীন মিশরের পিরামিড যুগের সভ্যতা ও সিন্ধু সভ্যতা তাম্র ও ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতা।

ব্রোঞ্জযুগ

মেসোপটেমিয়া, মিশর, ভারত এবং চৈনিক সভ্যতায় ব্রোঞ্জের আবিষ্কার হয়। ধীরে ধীরে ব্রিটেন, সুইডেন, ডেনমার্ক ও উত্তর জার্মানীতে এর বিস্তার ঘটে। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ পর্যন্ত ব্রোঞ্জযুগ স্থায়ী হয়। ব্রোঞ্জযুগে এসে নগরসভ্যতা আরো বিকশিত হয়। নগরায়নের ফলে শ্রম বিভাগের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে। শ্রম বিভাগকে কেন্দ্র করে সমাজে পৃথক শ্রেণি বিভাজন ও স্তরবিন্যাস গড়ে ওঠে। ব্রোঞ্জযুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। দ্রব্য বিনিময়ের পরিবর্তে ব্রোঞ্জের তৈরি মুদ্রা অর্থনীতির বিকাশ ঘটে। লেখার প্রাথমিক সূচনা হয়েছিল এই ব্রোঞ্জযুগে। ফলে শিক্ষা ও জ্ঞানরাজ্যে নতুন যুগের আগমন ঘটে। ব্রোঞ্জ-নির্মিত বর্ম, শিরোস্ত্রাণ, বর্শা, তলোয়ার ইত্যাদির ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়। সামন্ত রাজাগণ ব্রোঞ্জের অস্ত্রের সাহায্যে সজ্জিত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যগুলো আক্রমণ ও দখল করে নতুন নতুন উপনিবেশ স্থাপন করে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষি উৎপাদনও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। শ্রেণিবিন্যাস বিস্তৃত হওয়ায় সমাজ কাঠামোতে গুণগত পরিবর্তনের সূচনা হয়। বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশংকায় নগরের চারপাশ প্রাচীর স্থাপন করা হয়। জলসেচ ও বাঁধ নির্মাণের ওপর ভিত্তি করে মিশরে কেন্দ্রীয় সম্রাটের শাসন কার্যকর হয়। কার্ল উইটফোগাল (Karl Wittfogel) যাকে পানিভিত্তিক

সভ্যতার (Hydraulic civilization) উদ্ভব বলে অভিহিত করেছেন। আর যে সমস্ত অঞ্চলে জলসেচ ও বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজন ছিল না, সেখানে গড়ে ওঠে ছোট ছোট নগররাষ্ট্র। তীব্র শ্রেণিবিন্যাস, দাসভিত্তিক শ্রম ব্যবস্থা, অতিরিক্ত কর আদায়ের প্রয়োজনে কঠোর ও শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থার গোড়াপত্তন ঘটে। সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এ সময় আইনের উৎপত্তি হয়।

লৌহযুগ

লোহার আবিষ্কার ও ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রোঞ্জযুগের একচেটিয়া আধিপত্য ও কর্তৃত্ব হ্রাস পেয়েছিল। ব্রোঞ্জ ছিল দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান ধাতু। এর ব্যবহার মূলত অভিজাত শ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। সহজলভ্য ও দামে সস্তা হওয়ায় লোহার ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ মানুষও তাদের দৈনন্দিন নানা প্রয়োজনে লৌহ নির্মিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে শুরু করে। এভাবেই লৌহযুগ নামে নতুন এক সভ্যতার বিকাশ লাভ ঘটে। এশিয়া মাইনরে হিট্টাইটরা (Hittites) প্রথম লোহার আবিষ্কার ও এর ব্যবহার শুরু করে। খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে মধ্যপ্রাচ্যে লোহার ব্যবহার শুরু হয়।

লোহার আবিষ্কার ও ব্যবহার সভ্যতার সামাজিক ভিত্তিকে অনেক মজবুত এবং এর পরিধিকে আরও প্রসারিত করে। লৌহযুগে বর্ণমালাভিত্তিক লিখন পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য ও মুদ্রা-অর্থনীতি ব্যাপকতা লাভ করে। জাহাজ চলাচল ব্যাপকভাবে শুরু হওয়ার ফলে যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ হয়। এর ফলে বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের মানুষের মধ্যে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক লেনদেন ও ভাবের আদান-প্রদান বৃদ্ধি পায়। গৃহনির্মাণ, বিভিন্ন ধরনের গৃহসামগ্রী, আসবাবপত্র, রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কুঠার, লাঙলের ফলা, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে লোহার ব্যবহারের মাধ্যমে সভ্যতার দ্রুত উত্থান ঘটে। উৎপাদন ব্যবস্থায় যন্ত্রশক্তির ব্যবহার আরো সহজ এবং বিস্তৃত হয়। এ কারণে অনেকে লৌহযুগের এই পর্বকে শিল্প বিপ্লবের প্রাথমিক স্তর বলে অভিহিত করেন।

মানুষের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস, কাল্পনিক ও অযৌক্তিক ধ্যান-ধারণার পরিবর্তে যৌক্তিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটে। লৌহযুগে শিল্প, বাণিজ্য, নগরায়ণ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পেশাভিত্তিক সামাজিক শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এতে সামাজিক বৈষম্য ও শ্রেণিবিন্যাস আরও জটিল ও বিস্তৃত হয় এবং সমাজ কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন আসে। লৌহযুগে গ্রিসে এক উন্নত গণতান্ত্রিক নগরসভ্যতার বিকাশ ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	একটি ছকের মাধ্যমে তাম্রযুগ, ব্রোঞ্জ যুগ ও লৌহ যুগের তুলনা করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

মানব সভ্যতা বিকাশের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হচ্ছে তাম্রযুগ, ব্রোঞ্জ যুগ ও লৌহ যুগ। এর মাধ্যমে মানুষ পাথরের যুগ থেকে ধাতুর যুগে প্রবেশ করে। নগর সভ্যতার মাধ্যমে তারা আধুনিক সভ্যতার গোড়াপত্তন ঘটায়। বিনিময় ব্যবস্থার পরিবর্তে মুদ্রা অর্থনীতি চালু হয়। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা বিকশিত হওয়ার পাশাপাশি শিল্পভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সর্বপ্রথম কবে তামার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়?

ক) খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দের প্রথম দিকে
খ) খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দের শেষদিকে
গ) খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দের শেষদিকে
ঘ) খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের প্রথম দিকে

২। খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে কোন অঞ্চলে লোহার ব্যবহার শুরু হয়?

ক) ইউরোপে
খ) আফ্রিকায়
গ) মধ্যপ্রাচ্যে
ঘ) আমেরিকায়

পাঠ-৩.৪ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানসমূহ : ময়নামতি

Major Archaeological Sites of Bangladesh: Mainamati

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানসমূহের নাম বলতে পারবেন;
- ময়নামতির অবস্থান, উৎপত্তি ও গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, ময়নামতি, শালবন বিহার, কোটিলা মুড়া, প্রত্নসামগ্রী, আনন্দ বিহার।

সমাজ, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে বাংলাদেশ এক গৌরবময় জনপদ। প্রাচীনকালেই এখানে জনবসতি গড়ে উঠেছিল বলে ধারণা করা হয়। মধ্যযুগে এ জনপদে বিভিন্ন গৌরবময় সভ্যতার স্ফূরণ ঘটেছিল। প্রাচীন বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং বৈচিত্র্য যেমন হৃদয়গ্রাহী, তেমনি এর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনও ছিল সমৃদ্ধ, মনোমুগ্ধকর। বাংলার রূপ-রস, আলো-বাতাস, খাদ্য-পানি এবং মানুষের সান্নিধ্য সবাইকে কাছে টেনেছে, আপন করেছে। সুপ্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উর্বর ক্ষেত্র ছিল এই বঙ্গভূমি। আবার অসীম ঔদার্যে আর্যদেরকেও ঠাঁই দিয়েছিল এই বাংলা। বৌদ্ধ-জৈন, আর্য-অনার্য, কোল-ভীল-সাঁওতাল সবাই মিলে এক সমৃদ্ধ সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তুলেছিল 'বাঙাল মুলুকে'।

প্রাচীন বাংলার সভ্যতার এক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হচ্ছে চর্যাপদ। খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত চর্যাপদ বাংলার সমাজ, ধর্ম ও জীবনপ্রণালীর এক গুরুত্বপূর্ণ স্মারক। বাংলার অতীশ দীপঙ্কর প্রায় হাজার বছর আগে জ্ঞানের মশাল জ্বেলে গোটা তিব্বতকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন বাঙালি শীলভদ্র। সেসময়ে সমগ্র ভারতে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্ডিত বলে স্বীকৃত ছিলেন। এ ধারাবাহিকতায় বাংলার জনপদে গড়ে ওঠে সমৃদ্ধ সংস্কৃতি। বিকশিত হয় গৌরবময় সভ্যতা। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে আবিষ্কৃত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সভ্যতা হচ্ছে:

ক) ময়নামতি, কুমিল্লা;
খ) মহাস্থানগড়, বগুড়া;
গ) পাহাড়পুর, নওগাঁ এবং
ঘ) উয়ারি-বটেশ্বর, নরসিংদী।

ময়নামতি, কুমিল্লা

অবস্থান: কুমিল্লার ময়নামতি বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। কুমিল্লা জেলা শহরের সাত কিলোমিটার পশ্চিমে কোটবাড়ি এলাকায় বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন একাডেমি অবস্থিত। এখান থেকে দেড় কিলোমিটার দক্ষিণে ময়নামতির শালবন বিহার ধ্বংসাবশেষ। সমগ্র প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকাটি ময়নামতি-লালমাই পাহাড়ি অঞ্চলের প্রায় ১১ মাইল এলাকা জুড়ে অবস্থিত। শালবন বিহারের সন্নিকটে স্থাপিত যাদুঘরে ময়নামতিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্নসামগ্রী সংরক্ষণ করা হয়েছে।

উৎপত্তি ও নামকরণ: ১৮৭৫ সালে কোটবাড়ি এলাকায় একটি রাস্তা নির্মাণের সময় একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। ১৯১৭ সালে ঢাকা জাদুঘরের অধ্যক্ষ নলিনীকান্ত ভট্টশালী এ এলাকা পরিদর্শন করে এটিকে প্রাচীনকালের দুর্গ ও বিহার পরিবেষ্টিত নগর হিসেবে চিহ্নিত করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কুমিল্লা বিমানবন্দরসহ বিভিন্ন নির্মাণকাজের সময় ময়নামতিতে আরো বেশকিছু ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতি অনুসরণ না করে খনন ও নির্মাণ কাজের ফলে এখানকার নির্দশনগুলো ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এখানে জরিপ কাজের মাধ্যমে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে ৫৪টি স্থান সংরক্ষণ করার জন্য চিহ্নিত করে। চিহ্নিত স্থানগুলোর কয়েকটিতে খননকার্য চালিয়ে ময়নামতির সংস্কৃতি ও সভ্যতার অনেক নিদর্শন উদ্ধার করে।

গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ময়নামতিতে বৌদ্ধ ধর্মকে কেন্দ্র করে এক উন্নত সভ্যতার বিকাশ লাভ ঘটেছিল। সপ্তম শতাব্দীর শেষ থেকে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে দেববংশের চতুর্থ রাজা শ্রীভবদেব ময়নামতিতে প্রথম বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন বলে ধারণা করা হয়। অষ্টম শতাব্দীতে রাজা বুদ্ধদেব ময়নামতি বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। ৯ম ও ১০ম শতকে এ অঞ্চলে চন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধ রাজাদের আধিপত্য ছিল। চন্দ্রবংশীয় রাজাদের মধ্যে প্রখ্যাত ছিলেন রাজা মানিক চন্দ্র। মানিক চন্দ্রের মৃত্যুর পর রাণী ময়নামতি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে রাজকার্য পরিচালনা করেন। রাণী ময়নামতির নামানুসারে এ স্থানের নামকরণ হয় ময়নামতি। তবে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বিভিন্ন বৌদ্ধ রাজা এ বিহারের উন্নয়ন সাধন করেন বলে মনে করা হয়। বিশ্বখ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর এ বিহাওে জ্ঞানচর্চা করতেন।

ময়নামতির প্রধান প্রধান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন: ময়নামতিতে আবিস্কৃত প্রধান প্রধান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

ক. শালবন বিহার: অধিকসংখ্যক শালবৃক্ষের কারণে এই স্থাপনার নাম 'শালবন বিহার' বলে মনে করা হয়। এখানে চতুষ্কোণ আকৃতির একটি বিরাট বৌদ্ধবিহার পাওয়া গেছে। ইট-নির্মিত বিহারের প্রতিটি দেয়াল প্রায় ১৬৭.৭ মিটার লম্বা এবং প্রায় ৫ মিটার পুরু। মূল বিহারটি ১৬ ফুট প্রশস্ত ও ৪-৬ ফুট উঁচু দেওয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত। উত্তর দিকে ইট নির্মিত ৫৩ ফুট দীর্ঘ রাস্তা রয়েছে। এটিই একমাত্র প্রবেশপথ। সাড়ে বাইশ মিটার প্রশস্ত তোরণ দিয়ে ২০ বাই ১০ মিটার হলঘরে প্রবেশ করা যায়। বিহারের চতুর্দিকে ভিক্ষুদের বসবাসের জন্য ১২ বাই ১২ ফুট ১১৫ টি কক্ষ রয়েছে। প্রতিটি কক্ষের মাঝের দেয়ালগুলো ১.৫ মিটার চওড়া। কক্ষগুলোতে বুদ্ধমূর্তি নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী রাখার জন্য ০৩টি করে কুলুঙ্গি ছিল। কক্ষগুলোর সামনে ৮.৫ ফুট চওড়া টানা বারান্দা রয়েছে।

খ. কোটিলা মুড়া: শালবন বিহার হতে ৫ কিলোমিটার উত্তরে সেনানিবাস অঞ্চলে কোটিলা মুড়া অবস্থিত। একটি টিলার উপর তিনটি স্তূপের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এ তিনটি স্তূপকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান তিনটি প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এগুলো হচ্ছে ক) বুদ্ধ (জ্ঞান), খ) ধর্ম (ন্যায়) এবং গ) সংঘ (শৃঙ্খলা)।

গ. চারপত্র মুড়া: কোটিলা মুড়া থেকে প্রায় আড়াই কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে সেনানিবাসের মধ্যেই একটি ছোট পাহাড়ের উপরে চারপত্র মুড়ার অবস্থান। এটি মূলত একটি সমাধিক্ষেত্র। সমাধিস্থলের পূর্বদিকে একটি হলঘর আবিষ্কৃত হয়েছে। চারপত্র মুড়ার প্রায় দুই কিলোমিটার উত্তরে ১০৫ ফুট দীর্ঘ ও ৫৫ ফুট প্রস্থ একটি বৌদ্ধমন্দির পাওয়া গেছে।

ঘ. রাণি ময়নামতির প্রাসাদ: ময়নামতি-লালমাই পাহাড়শ্রেণির উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত এবং সংলগ্ন ভূমি থেকে কিছুটা উঁচু স্থানে রাণি ময়নামতির প্রাসদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। সম্প্রতি খননের ফলে বড় আকারের প্রাচীর আবিষ্কৃত হয়েছে।

ঙ. আনন্দ বিহার : এ অঞ্চলে প্রাপ্ত বৌদ্ধ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আনন্দ বিহার সবচেয়ে বড়। এই বিহারকে আনন্দ রাজার বাড়ি বলে মনে করা হয়। কোটিলা মুড়া থেকে এক কিলোমটার দক্ষিণে ময়নামতি-লালমাই পাহাড়ের উপত্যকায় সমতল ভূমিতে আনন্দ বিহার অবস্থিত। জানা যায়, অষ্টম শতকের দেববংশের রাজা আনন্দ দেব শালবন বিহারের অনুরূপ একটি বিশাল বৌদ্ধবিহার স্থাপন করে বৌদ্ধধর্মের প্রসারে অবদান রেখেছিলেন। আনন্দ বিহারের কয়েকটি দেওয়াল পোড়ামাটির ফলক-চিত্র রয়েছে। সাপ-নেউল, মাছ, শূকর, ময়ূর, রাজহাঁস, ঘোড়া, বানর, যোদ্ধা, সিংহ প্রভৃতির দৃষ্টিনন্দন চিত্র রয়েছে।

চ) ময়নামতিতে প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রী: ময়নামতিতে উদ্ধারকৃত প্রত্নসামগ্রীর মধ্যে ০৮টি তাম্র ফলক, ০৩টি স্বর্ণমুদ্রা, ২২৪টি রৌপ্যমুদ্রা, ০৬টি স্বর্ণালঙ্কার, ০২টি ব্রোঞ্জের স্মারকাধার, ব্রোঞ্জনির্মিত অসংখ্য বুদ্ধমূর্তি, বোধিসত্ত্ব ও অন্যান্য বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি; অসংখ্য পোড়ামাটির ফলকচিত্র, অলংকৃত ইট, প্রস্তর-ভাস্কর্য, তামারপাত্র, বিভিন্ন ধাতুনির্মিত আংটি, কানের দুল ও হাতের চুড়ি; রৌপ্যখন্ড, লোহার পেরেক, কড়া, বঁড়শি, নানা প্রকার খননযন্ত্র, দা, ছুরি, কাঁচি, শিলনোড়া, পোড়ামাটির অসংখ্য তৈজসপত্র, হাঁড়ি-পাতিল, ইত্যাদি।

ময়নামতির সভ্যতা ধ্বংসের প্রকৃত কারণ আজও জানা যায়নি। এখানে কোনরকম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হয়, ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনর্জাগরণের সময় এ বৌদ্ধ সভ্যতাটি গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে এবং কালক্রমে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

ময়নামতিতে প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রীর গুরুত্ব: ময়নামতির সমাজ-ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। ময়নামতির শালবন বিহারে খননের ফলে প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসন থেকে দেববংশ নামে এক নতুন বৌদ্ধ রাজবংশ ও তাঁদের বংশানুক্রম পাওয়া যায়। চারপত্র

মুড়ায় আবিষ্কৃত তাম্রশাসনগুলো চন্দ্র রাজাদের বংশানুক্রম, বিভিন্ন অভিযান ও তাঁদের সময়কার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিচয় তুলে ধরে। এছাড়া এই তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, শ্রীচন্দ্র থেকে গোবিন্দচন্দ্রের শাসনকাল পর্যন্ত ঢাকার বিক্রমপুরে চন্দ্র রাজাদের রাজধানী ছিল। লালমাই-ময়নামতিতে প্রাপ্ত ২২৭টি স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রমাণ করে যে, এখানে মুদ্রা অর্থনীতির প্রচলন ছিল। এখানে আবিষ্কৃত আব্বাসীয় খলিফাদের মুদ্রা মধ্যপ্রাচ্যের সাথে তৎকালীন বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের সাক্ষ্য দেয়। এখানে প্রাপ্ত বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তিসমূহ বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের সুবর্ণযুগের পরিচয় বহন করে। শালবন বিহারের ক্রুশাকার মন্দিরের ভিত্তিভূমি অলংকৃত পোড়ামাটির ফলকচিত্রগুলো তৎকালীন বাংলার লোকায়ত শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ময়নামতিতে প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রী তৎকালীন সমাজের গতিপ্রকৃতি বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে ময়নামতি দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শিল্প, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ঐতিহাসিক দলিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	ময়নামতিতে প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রীর একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বৃহত্তর বাংলা উপমহাদেশের এক প্রাচীন জনপদ। এ জনপদের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাচীন ও মধ্য যুগে সমৃদ্ধ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজের মাধ্যমে আবিষ্কৃত ময়নামতি, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর এবং উয়ারি বটেশ্বর বাংলার প্রাচীন সভ্যতার ঐতিহাসিক স্মারক। ময়নামতিতে অবস্থিত শালবন বিহার, আনন্দ বিহার, কোটিলা মুড়া, চারপত্র মুড়া, মন্দির প্রভৃতি তৎকালীন বৌদ্ধ সংস্কৃতির পরিচায়ক। এখানে প্রাপ্ত অন্যান প্রত্নসামগ্রী থেকে তৎকালীন সমাজ জীবন এবং অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কার নামানুসারে "ময়নামতি" নামকরণ হয়েছে?

ক) পাহাড়ের নামানুসারে
খ) রাজা মানিক চন্দ্রের নামানুসারে
গ) ধর্মীয় আদর্শ থেকে
ঘ) রাণি ময়নামতির নামানুসারে

২। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বসবাসের জন্য শালবন বিহারে কতটি কক্ষ আবিষ্কৃত হয়েছে?

ক) ১১০টি
খ) ১১৫টি
গ) ২১০টি
ঘ) ২১৫টি

৩। ময়নামতিতে বিকশিত বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিকাশের আনুমানিক সময়কাল কত?

ক) ৫ম থেকে ৮ম খ্রি. পূ.
খ) ৫ম থেকে ৮ম শতক
গ) ৭ম থেকে দ্বাদশ শতক
ঘ) ১০ম থেকে পঞ্চদশ শতক

পাঠ-৩.৫ পাহাড়পুর
Paharpur

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- পাহাড়পুরের অবস্থান ও উৎপত্তি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- পাহাড়পুরের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পাহাড়পুর, প্রত্নসামগ্রী, সোমপুর বিহার, স্নানঘাট, মন্দির, সত্যপিরের ভিটা।

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রত্নতাত্ত্বিক দর্শনীয় স্থানের নাম পাহাড়পুর। বৌদ্ধ এবং হিন্দু সংস্কৃতি উৎকর্ষের নিদর্শন হিসেবে পাহাড়পুরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। এটি জাতিসংঘের ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ। ভারতবর্ষে এতবড় বৌদ্ধ বিহার এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। উৎপত্তিগত দিক থেকে বরেন্দ্র অঞ্চলের এ সভ্যতা ময়নামতির সমসাময়িক। নিম্নে পাহাড়পুরের প্রত্নতাত্ত্বিক পরিচিতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

অবস্থান: বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমে অবিস্থত নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলায় পাহাড়পুরের অবস্থান। নওগাঁ জেলাসদর থেকে পাহাড়পুরের দূরত্ব ৩৪ কিলোমিটার। নওগাঁ এবং জয়পুরহাট থেকে পাকা সড়কে পাহাড়পুর যাতায়াত করা যায়। জয়পুরহাটের জামালগঞ্জ রেলস্টেশন থেকে পাহাড়পুরের দূরত্ব মাত্র ৫ কিলোমিটার।

উৎপত্তি ও নামকরণ: পাল রাজত্বের প্রথম ভাগে ৮ম শতকের শেষভাগে পাহাড়পুরের বিখ্যাত মন্দির ও বিহার নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে পালবংশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাজা ধর্মপাল ও তাঁর পুত্র দেবপালদের সময়ে বাংলাদেশে বহু বৌদ্ধবিহার ও মন্দির নির্মিত হয়। পাহাড়পুরের বৌদ্ধ ও হিন্দুসভ্যতা ৮ম থেকে ১৩শ শতক পর্যন্ত স্থায়ী ছিল বলে অনুমান করা হয়। পাহাড়পুরের প্রধান মন্দির ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরে সেই ইটের স্তূপের উপর ধূলাবালি ও মাটি ইত্যাদি জমে কালক্রমে এক উঁচু পাহাড়ের সৃষ্টি হয়। সমতল ভূমি থেকে পাহাড়ের মত উঁচু হওয়ার কারণেই এ এলাকার নামকরণ হয়েছে পাহাড়পুর।

ব্রিটিশ নাগরিক বুকানন হ্যামিল্টন ১৮০৭ এবং ১৮১২ সালে পূর্ব ভারতে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তিনিই প্রথম পাহাড়পুরের প্রত্ননিদর্শনের তথ্য প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে ওয়েস্টম্যাকট পাহাড়পুর পরিদর্শন করেন। ১৮৭৯ সালে স্যার আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম পাহাড়পুরে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য পরিচালনা করেন। ১৯২৩ সালে রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শরৎ কুমার রায়ের অর্থ সাহায্যে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহযোগিতায় পাহাড়পুরের মূল খননকাজ শুরু হয়। ভান্ডারকরের নেতৃত্বে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির কিছু গবেষক, প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২৫-২৬ সালে খননকার্য পরিচালনা করেন। এই ধারাবাহিকতায় ১৯৩৩-৩৪ সাল পর্যন্ত কে. এন. দীক্ষিত পাহাড়পুরে খননকাজ চালান।

পাহাড়পুরের প্রধান প্রধান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন: পাহাড়পুর মহাবিহারের আয়তন প্রায় ২৭ একর। বর্গাকৃতির আঙ্গিনার প্রতিটি দিকের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় তিনশ গজ। মূল বিহারটি চারদিক থেকেই উঁচু প্রাচীরে ঘেরা। পাহাড়পুরে প্রধান যেসব স্থাপনা আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে:

ক. সোমপুর বিহার: উপমহাদেশে আবিস্কৃত বিহারগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ হচ্ছে সোমপুর বিহার। বিহারের প্রাচীর উত্তর-দক্ষিণে ২৮১ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ২৮০ মিটার দৈর্ঘ্য। প্রতিটি প্রাচীরের গায়ে ভিক্ষুগণের বসবাসের জন্য ছোট ছোট ১৭৭ টি কক্ষ নির্মিত হয়েছিল। কক্ষগুলোর সাথে ছিল চওড়া বারান্দা, বিস্তৃত প্রবেশপথ এবং অসংখ্য নিবেদন-স্তূপ। উঁচু ঢিবিতে অবস্থিত মন্দিরের আয়তন ১০৯ মিটার বাই ৯৬ মিটার।

খ) *ক. স্নানঘাট:* সোমপুর বিহারের বাইরের দেওয়াল থেকে ৪৯ মিটার দিক্ষণ-পূর্ব দিকে স্নানঘাট অবস্থিত। ৪ মিটার প্রশস্ত ঘাটটি ১২.৫ মিটার ঢালু। স্নানঘাটের সিঁড়ি চুনাপাথরে বাঁধানো। রাজা মহীদলের কন্য সন্ধ্যাবতী এ ঘাটে স্নান করতেন বলে লোককথা প্রচলিত আছে।

গ. গন্ধেশ্বরী মন্দির: স্নানঘাট থেকে প্রায় ১২ মিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত মন্দিরটি গন্ধেশ্বরী মন্দির নামে পরিচিত। এ মন্দিরের ভিতরে একটি ছোট হলঘর এবং একটি ছোট কক্ষে পূজার স্থান নির্ধারিত ছিল।

ঘ. সত্যপির ভিটা: পাহাড়পুর বিহারের সীমানা প্রাচীরের ১২২ মিটার পূর্বে এ ভিটার অবস্থান। সন্ধ্যাবতীর গর্ভে ঐশ্বরিক উপায়ে সত্যপিরের জন্ম বিষয়ে লোককাহিনী প্রচলিত আছে। সত্যপিরের নামানুসারে এ ভিটার নামকরণ হয়েছে। এর আগে এটি তারামন্দির নামে প্রসিদ্ধ ছিল বলে জানা যায়।

পাহাড়পুরে প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রী: প্রধান মন্দিরের চতুর্দিকে বেষ্টন করে হিন্দু দেবদেবীর ৬৩টি প্রস্তরমূর্তি রয়েছে। ধারণা করা হয়, কোনো প্রাচীন মন্দির থেকে মূর্তিগুলো সংগ্রহ করে প্রধান মন্দিরের শোভা বর্ধন করা হয়েছে। পাহাড়পুরে ২৮০০টি পোড়ামাটির ফলকচিত্র (টেরাকোটা) পাওয়া গেছে। এসব টেরাকোটায় শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গণেশ, সূর্য, বোধিসত্ত্বা, পদ্মপাণি, মঞ্জশ্রী, তারা প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি স্থান পেয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জীবজন্তু, ফুল-ফল, গাছপালা, সন্তানসহ জননী, স্ত্রী-পুরুষ যোদ্ধা, রথারোহী তীরন্দাজ, পূজারত ব্রাহ্মণ, লাঙল-কাঁধে কৃষক ও বাদ্যযন্ত্র এসব ফলকের মূল উপজীব্য। খননের ফলে মুসলমান যুগের অসংখ্য মুদ্রা পাওয়া গেছে। এর মধ্যে পাল সম্রাট এবং বাগদাদের খলিফা হারুন-অর-রশিদের সময়ের রৌপ্যমুদ্রাও রয়েছে। এছাড়া এখানে মাটির পাত্র, তৈজসপত্র, গেরস্থালি সামগ্রী, হাতিয়ার, গহনা, সিলমোহর, তাম্রলিপি ও শিলালিপি ইত্যাদি পাওয়া গেছে।

পাহাড়পুরের প্রত্নসম্পদের মধ্যে তাম্রশাসন ও শিলালিপি উল্লেখযোগ্য। বিহারের বারান্দার উত্তর-পূর্ব কোণে প্রাপ্ত ১৫৯ গুপ্তাব্দের (৪৭৯ খ্রি.) তাম্রশাসনটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মূর্তির মধ্যে দন্ডায়মান বুদ্ধ, দন্ডায়মান উলঙ্গ জৈনমূর্তি, রাজাসনে উপবিষ্ট ব্রোঞ্জের কুবের ও গণেশমূর্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৩শ শতাব্দের শুরুতে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির উত্তরবঙ্গ দখলের সময়ে পাহাড়পুর বিহার ধ্বংস হয় বলে মনে করা হয়। এর সাথে পৃষ্ঠপোষকতা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবও দায়ী। এ সমৃদ্ধ সভ্যতাটির আবিষ্কার এতদঞ্চলের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। সবশেষে বলা যায় যে, পাহাড়পুরের সভ্যতাটি একাধারে বৌদ্ধ ও হিন্দু সভ্যতার নিদর্শন বহন করছে, যা বাংলার সমাজ-ইতিহাসের তাৎপর্যময় নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়।

পাহাড়পুরে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহের গুরুত্ব: বাংলাদেশের প্রধান চারটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে পাহাড়পুর অন্যতম। পাহাড়পুরে বৌদ্ধ ও হিন্দু সভ্যতার নিদর্শনসমূহের সমাজ-ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। পোড়ামাটির ফলক-চিত্রের রাজকীয় শিল্পবোধের বদলে লোকমানসের চরিত্র অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। বাগদাদের খলিফা হারুন-অর-রশিদের একটি রৌপ্যমুদ্রা এ অঞ্চলের সাথে আরবের বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রমাণ দেয়। পাহাড়পুরের ছোট ছোট কুঠুরিসমূহ বৌদ্ধভিক্ষুদের বসবাসের দৃষ্টান্ত হাজির করে। পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত প্রত্নসম্পদগুলো সেসময়ের মানুষের শিল্পবোধ সম্পর্কে ধারণা দেয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	পাহাড়পুরে প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রীর একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বৃহত্তর বাংলা জনপদের আলোচিত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের নাম পাহাড়পুর। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজের মাধ্যমে আবিষ্কৃত সোমপুর বিহার, সত্যপিরের ভিটা, স্নানঘাট, মন্দির প্রভৃতি তৎকালীন বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির পরিচায়ক। এখানে প্রাপ্ত অন্যান প্রত্নসামগ্রী থেকে তৎকালীন সমাজ জীবন এবং অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ১৮০৭ এবং ১৮১২ সালে পূর্ব ভারতে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করেন কে?

ক) স্যার আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম
খ) ব্রিটিশ নাগরিক বুকানন হ্যামিল্টন
গ) শরৎ কুমার রায়
ঘ) রাখাল দাস

২। পাহাড়পুরের বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির বিকাশের আনুমানিক সময়কাল কত?

ক) পঞ্চম থেকে অষ্টম খ্রি. পূ.
খ) অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক
গ) নবম থেকে একাদশ শতক
ঘ) দশম থেকে পঞ্চদশ শতক

পাঠ-৩.৬ মহাস্থানগড়
Mahasthangarh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- মহাস্থানগড়ের অবস্থান ও উৎপত্তি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- মহাস্থানগড়ের প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মহাস্থানগড়, প্রত্নসামগ্রী, গোবিন্দ ভিটা, বৈরাগীর ভিটা, খোদাইপাথর ভিটা, পরশুরামের প্রাসাদ, শীলাদেবীর ঘাট, লক্ষীন্দর মেধ।

বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হচ্ছে মহাস্থানগড়। পাহাড়পুরের মত এখানেও বৌদ্ধ এবং হিন্দু সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। ধারণা করা হয়, বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে মহাস্থানগড়ই সর্বাধিক প্রাচীন।

অবস্থান: বগুড়া শহর থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার উত্তরে বাংলাদেশের প্রাচীনতম ও সর্ববৃহৎ নগরী পুন্ড্রনগরের অবস্থান। ঢাকা-দিনাজপুর মহাসড়কের পাশে অবস্থিত এই প্রাচীন পুন্ড্রনগরই হচ্ছে আজকের মহাস্থানগড়। এর পূর্বদিকে করতোয়া নদী প্রবাহিত। প্রাচীন এ সভ্যতাটি উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১৫২৫ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১৩৭০ মিটার (প্রায় দেড় বর্গ কি.মি.) বিস্তৃত। মহাস্থানগড় সমতল ভূমি থেকে প্রায় ৫ মিটার উঁচুতে অবস্থিত। পূর্বদিকে করতোয়া নদী এবং বাকি তিনদিকে গভীর পরিখা এ নগরীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতো। মূল নগরীর বাইরে প্রায় ৫ মাইল পর্যন্ত শহরতলী ছিল।

উৎপত্তি: খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক দ্বিতীয় শতকে মহাস্থান ব্রাহ্মলিপিতে 'পুন্দনগল' এর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃবিজ্ঞানীদের ধারণা, এ পুন্দনগলই হচ্ছে প্রাচীন পুণ্ড্রের রাজধানী পুন্ড্রনগর বা মহাস্থানগড়। মৌর্য সম্রাট অশোকের (২৭৩-২৩২ খ্রি.পূ.) একটি শিলালিপি ও চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং (Xuanzang)- এর বর্ণনায় পুণ্ড্রনগরের উল্লেখ আছে। হিউয়েন সাং (৬৩০-৬৪৫ খ্রি.)- এর বর্ণনা থেকেই আলেকজান্ডার কানিংহাম ১৮৭৯ সালে মহাস্থানকে প্রাচীন পুণ্ড্রনগরের ধ্বংসাবশেষ বলে চিহ্নিত করেন। ১৯২৮-২৯ সালে কে. এন. দীক্ষিতের তত্ত্বাবধানে তৎকালীন ব্রিটিশ-ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এখানে প্রথম খননকার্য পরিচালনা করে। এরপরেও বিভিন্ন সময় এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। ১৯৩০ সালে ব্রাহ্মী অক্ষরে বাংলার প্রাচীনতম শিলালিপি থেকেও প্রমাণিত হয় যে, আজকের মহাস্থানগড়ই বাংলার খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ থেকে তৃতীয় শতাব্দীতে পুণ্ড্রনগরে জৈনধর্ম প্রভাব ছিল বলে ধারণা করা হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে 'পুণ্ড্র' হয়ে ওঠে 'পুণ্ড্রবর্ধন'। পুণ্ড্রবর্ধনের বিস্তৃতি ছিল বৃহত্তর বগুড়া, রাজশাহী ও দিনাজপুর জুড়ে। দশম শতকে এ অঞ্চল 'বরেন্দ্র' 'বরেন্দ্রী' নামে আত্মপ্রকাশ করে। ১৫ শতাব্দী পর্যন্ত এখানে বিভিন্ন শাসকবর্গ আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছিল। সামগ্রিকভাবে এখানে গড়ে ওঠে এক সমৃদ্ধ জনপদ। আর্যদের আগমনের আগে পুণ্ড্রনগরে 'পুণ্ড্র' নামের আদিবাসীরা বাস করত। বৌদ্ধসভ্যতার প্রাচীনতম ধ্বংসাবশেষ এই পুণ্ড্রনগর বা মহাস্থানগড় মৌর্য, গুপ্ত, পাল ও বিভিন্ন হিন্দু সামন্তরাজাদের প্রাদেশিক রাজধানী ছিল। প্রসিদ্ধতম মত হচ্ছে, পাল রাজাদের রাজত্বকালেই (৭৫০ খ্রি. থেকে দ্বাদশ শতাব্দী) মহাস্থানগড় বা বরেন্দ্র সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল।

মহাস্থানগড়ের প্রধান প্রধান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন: কে.এন. দীক্ষিতের তত্ত্বাবধানে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এখানকার তিনটি ঢিবিতে খননকার্য পরিচালনা করে। এগুলো হচ্ছে বৈরাগীর ভিটা, গোবিন্দ ভিটা এবং মুনির ঘুন। ষাটের দশকের প্রথম দিকে এখানে আবার খননকার্য পরিচালনা করা হয়। তখন আবিষ্কৃত হয় পরশুরামের প্রাসদ, খোদাই পাথর ভিটা এবং মানকালীর কুণ্ড। নিম্নে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ক. বৈরাগীর ভিটা: বৈরাগীর ভিটা মূলত পাল আমলের দু'টি মন্দির। পালযুগের প্রথম দিকে নির্মিত মন্দিরটি প্রায় ৩০ বাই ১৩ মিটার এবং ১১ শতকে নির্মিত মন্দিরটির আয়তন প্রায় ৩৪ বাই ১৩.৩৭ মিটার। মন্দির দু'টি নকশদার ইট দ্বারা নির্মিত।

খ. *গোবিন্দ ভিটা:* মহাস্থানগড়ের দুর্গ প্রাচীরের বাইরে জাহাজঘাট থেকে ১৮৫ মিটার উত্তরে গোবিন্দ ভিটার অবস্থান। বস্তুত মহাস্থানগড়ের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে এই গোবিন্দ ভিটা। এর বিরাট আকৃতি দেখে অনেকে ধারণা করেন, এখানে বৃহৎ আকারের প্রাচীন অট্টালিকা ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থাকতে পারে। গোবিন্দ ভিটা বিষ্ণু মন্দির নামেও পরিচিত। সনাতন ধর্মের দেবতা বিষ্ণু গোবিন্দ'র আবাস হিসেবে এর নামকরণ হয়েছে। তবে প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে এখানে বৈষ্ণব ধর্মের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম শতকে এটি গড়ে তোলা হয়।

গ. *মুনির ঘুন:* দুর্গ প্রাচীরের বাইরে পূর্ব-দক্ষিণ দিকের ধ্বংসস্তূপকে মুনির ঘুন নামে অভিহিত করা হয়। মুনির ঘুন শব্দের অর্থ ঋষি বা সন্ন্যাসীর বাঁক। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এই দুর্গ প্রাচীরটি ৩০ মিটার ভিতরের দিকে বেঁকে পুনরায় উত্তর-দক্ষিণ বরাবর চলমান ছিল। এই বেঁকে যাওয়া স্থানটিই স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী মুনির ঘুন নামে পরিচিত। এর উচ্চতা তিন মিটার, চওড়া ৩৩ মিটার এবং উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ৩০ মিটার। নদীপথের উপর নজর রাখার জন্য পাল আমলে পর্যবেক্ষণ মঞ্চ হিসেবে এটি নির্মাণ করা হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।

ঘ. *শীলাদেবীর ঘাট:* মুনির ঘুনের খুব কাছেই শিলাদেবীর ঘাট নামক স্থানটি অবস্থিত। শীলাদেবী রাজা পরশুরামের পরমা সুন্দরী কন্যা মতান্তরে বোন ছিলেন। সুলতান মাহীসওয়ার বলখী রাজা পরশুরামকে পরাজিত করেন। নিজ সম্মান রক্ষায় শীলাদেবী করতোয়া নদীতে যে স্থানে ঝাঁপ দিয়ে আত্মবিসর্জন দেন, তা শীলাদেবীর ঘাট নামে পরিচিত।

ঙ. *জিয়ৎকুণ্ড:* জিয়ৎকুণ্ড অর্থ হচ্ছে জীবনদানকারী কূপ বা কুণ্ড। শিলাদেবীর ঘাটের পশ্চিম দিকে অবস্থিত একটি প্রাচীন পুকুর বা বড় কূপ জিয়ৎকুণ্ড নামে পরিচিত। কথিত আছে, এই পুকুর/কূপের পানি পান করে রাজা পরশুরামের অসুস্থ/আহত সৈন্যরা সুস্থ হয়ে যেত। এখানে মহাকালীকুণ্ড নামে আরো একটি কূপ বা পুকুর আছে।

চ. *পরশুরামের প্রাসাদ:* মহাস্থানগড়ের সর্বশেষ হিন্দু রাজা পরশুরামের প্রাসাদের আয়তন ছিল ৬১ মিটার বাই ৩০ মিটার। এখানে প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রী থেকে ধারণা করা হয়, এটি ৮ম শতক বা তার পূর্বে নির্মাণ করা হয়েছিল। জিয়ৎকুণ্ড বা মহাকালীর কুন্ড থেকে আনুমানিক ২০০ মিটার উত্তরে এই প্রাসাদের অবস্থান।

ছ. *খোদার পাথর ভিটা:* মহাস্থানগড়ের অন্যতম প্রত্ননিদর্শন হচ্ছে খোদার পাথর ভিটা নামক বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। কালক্রমে এটি এখন একটি টিলা বা ঢিবি হিসেবে পরিগণিত। এখানে ২.৮৪ মি বাই ০.৭১ মি বাই ০.৭৪ মি আকারের গ্রানাইট পাথরের একটি চৌকাঠ পাওয়া গেছে। পাথরটি বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত বরেন্দ্র যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। 'অলৌকিক' এই পাথরের নামানুসারে ঢিবিটির এরূপ নামকরণ হয়েছে।

জ. *লক্ষ্মীন্দর/গোকুল মেধ:* বগুড়া থেকে মহাস্থান যাওয়ার পথে গোকুল গ্রামে প্রায় ৪৩ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটি ঢিবির উপর অবস্থিত মন্দিরটি লক্ষীন্দর মেধ (মন্দির) নামে পরিচিত। লোককাহিনীর চরত্রি বেহুলা-লক্ষীন্দরের নামানুসারে এ নামকরণ করা হয়েছে। গ্রামের নামানুসারে এটিকে গোকুল মেধ বলেও অভিহিত করা হয়।

ঝ. *মাজার ও মসজিদ এলাকা:* দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ১৭১৯ সালে নির্মিত এক-গম্বুজ-বিশিষ্ট একটি মসজিদ, সুলতান মাহীসওয়ার বলখীর মাজার ও বেশ কয়েকটি কবর অবস্থিত।

মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রী: মহাস্থানগড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের মাধ্যমে বহু প্রাচীন নিদর্শন বা প্রত্নসম্পদ পাওয়া গেছে। যার মধ্যে মধ্যে পাথরের বিষ্ণুমূর্তি, বিভিন্ন আকারের বোতাম ও গুটিকা, নানা রঙের মাটির পাত্র, থালা-বাসন, জলপাত্র, রান্নার হাড়ি-পাতিল, তামা ও ব্রোঞ্জের গহনা, সোনার অলংকার, আংটি ও বালা, পোড়ামাটির মূর্তি ও খেলনা, গোলাকার পোড়ামাাটির সিল, মুদ্রা ও কড়ি, দোয়াত, প্রদ্বীপ, সিরামিক্স উল্লেখযোগ্য। এখানকার স্থাপত্য শিল্প, প্রাচীরের গায়ের জ্যামিতিক নকশা, সিঁড়ি প্রভৃতি প্রাক-মোগল আমলের মুসলিম ঐতিহ্যের ইঙ্গিতবাহী। এখানে প্রাক-মোগল আমলের একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ, আরবীয় সুফি-সাধক সুলতান মাহীসওয়ার বলখীর মাজার এবং মসজিদ রয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় মহাস্থানগড় জৈন, বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সংমিশ্রন।

মহাস্থানগড়ের প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহের গুরুত্ব: প্রাচীন বাংলার তথ্য উদ্‌ঘাটনে মহাস্থানগড়ের প্রত্নসম্পদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় ১৫ শতাব্দী পর্যন্ত এখানে একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। এই সভ্যতায় বৌদ্ধ এবং হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব ছিল। খ্রিস্টীয় ৪র্থ শতকের পরে ক্ষুদ্র কক্ষবিশিষ্ট আবাসন নির্মাণ পদ্ধতি

প্রাচীন বাঙলার নিজস্ব স্থাপত্য কৌশলের প্রমাণ হাজির করে। বৌদ্ধধর্মের ওপর ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিজয়-বার্তাকে ধারণ করে মহাস্থানগড়ের একটি মূর্তি নির্মিত হয়েছে। আবিষ্কৃত প্রস্তরমূর্তিগুলোতে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের প্রভাব প্রকট। আবার সুলতান মাহীসওয়ার বলখীর মাজার মুসলিম আমলের নিদর্শন বহন করে। সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশের সমাজ ইতিহাস অধ্যয়নের মহাস্থানগড়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

শিক্ষার্থীর কাজ	মহাস্থানগড়ের প্রধান স্থাপথ্যগুলোর বৈশিষ্ট্যসহ একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতার নাম পুণ্ড্রনগর বা মহাস্থানগড়। এখানে জৈন, বৌদ্ধ, হিন্দু এবং সবশেষ মুসলিম সংস্কৃতি উৎকর্ষ লাভ করেছিল। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে ১৫ শতক পর্যন্ত এখান সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশ অব্যাহত ছিল বলে ধারণা করা হয়। বৈরাগীর ভিটা, গোবিন্দ ভিটা, পরশুরামের প্রসাদ, খোদাই পাথর ভিটা, শিলাদেবীর ঘাট, লক্ষীন্দর মেধ মোনির ঘোন প্রভৃতি এখানকার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নিদর্শন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মহাস্থানগড় কোথায় অবস্থিত?
ক) কুমল্লিায় খ) ঢাকায়
গ) বগুড়ায় ঘ) ঢাকায়

২। মহাস্থানগড় থেকে ১৮২ মিটার পূর্বে বৈরাগী ভিটার বিপরীতে অবস্থিত–
ক) গোবিন্দ ভিটা খ) পরশুরাম প্রাসাদ
গ) লক্ষীন্দর মেধ ঘ) শীলাদেবীর ঘাট

৩। মহাস্থানগড়ের পূর্ব নাম কী?
ক) পুণ্ড্রনগর খ) সমতট
গ) হরিকেল ঘ) কোনোটি নয়

৪। মহাস্থানগড়ের প্রধান স্থাপনা হচ্ছে–
i. গোবিন্দ ভিটা
ii. শালবন বিহার
iii. শীলদেবীর ঘাট

সঠিক উত্তর কোনটি?
ক) i. ও ii. খ) i. ও iii.
গ) i , ii.ও iii. ঘ) ii.ও iii.

পাঠ-৩.৭ উয়ারি-বটেশ্বর
Wari-Bateshwar

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- উয়ারি-বটেশ্বরের অবস্থান ও উৎপত্তি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- উয়ারি-বটেশ্বরে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	উয়ারি-বটেশ্বর, প্রত্নসামগ্রী, প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন, টেরাকোটা, দুর্গনগর, বাণিজ্য নগর, গর্ত বসতি, অর্থনীতি, ধর্ম ইত্যাদি।

বাংলাদেশে সম্প্রতি আবিষ্কৃত এবং বহুলআলোচিত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হচ্ছে উয়ারি-বটেশ্বর। প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বের এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতি দীর্ঘকাল মাটিচাপা পড়েছিল। উয়ারি-বটেশ্বর আবিষ্কারের পূর্বে বগুড়ার মহাস্থানগড়কে (পুণ্ড্রনগর) বাংলার সর্বাধিক প্রাচীন সভ্যতা বলে অভিহিত করা হতো। কিন্তু উয়ারি-বটেশ্বর সে ধারণায় চিড় ধরিয়েছে। নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, সমগ্র খনন কাজ শেষে গবেষণায় এটি প্রমাণিত হতে পারে যে, উয়ারি-বটেশ্বরই বাংলাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতা।

অবস্থান: বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অদূরে নরসিংদী জেলার বেলাব ও শিবচর উপজেলার ৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে উয়ারি এবং বটেশ্বর গ্রামের অবস্থান। উয়ারি ও বটেশ্বর পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ভিন্ন গ্রাম হলেও প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দেশন হিসেবে একসাথে উচ্চারণ করা হয়। গ্রাম দু'টি আশে-পশের সমতল ভূমি থেকে একটু উঁচু। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র এবং আড়িয়াল খাঁ নদীর সঙ্গমস্থলের কাছে কয়রা নদীর দক্ষিণ তীরে উয়ারি এবং বটেশ্বর গ্রামের অবস্থান। সম্প্রতি আবিষ্কৃত হলেও এটি ইতোমধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থান হিসেবে আলোচিত হচ্ছে।

উৎপত্তি: নব্যপ্রস্তর যুগের পর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে নগর সভ্যতার গোড়াপত্তন হতে থাকে। মিশর, মেসোপটেমিয়া, সিন্ধু সভ্যতার পরবর্তী প্রজন্মের নগর সভ্যতা হচ্ছে মহাস্থানগড় এবং উয়ারি-বটেশ্বর। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দে একটি বন্দর ও দুর্গ নগর হিসেবে উয়ারি-বটেশ্বরের আত্মপ্রকাশ ঘটে বলে ধারণা করা হয়। গ্রিকো-রোমান গণিতবিদ টলেমি (Claudius Ptolemy, ১০০-১৭০খ্রি.) তাঁর *Geographia* গ্রন্থে উয়ারি-বটেশ্বরকে 'সোনাগড়া' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ভারত, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ডেও অনুরূপ কিছু প্রাচীন বাণিজ্যিক নগরীর উল্লেখ করেছেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এই জনপদে ২৫০০ বছর পূর্বে সমৃদ্ধ সংস্কৃতির স্ফূরণ ঘটেছিল। কিন্তু এ সভ্যতা আধুনিক গ্রামীণ সভ্যতার নিচে চাপা পড়েছিল দীর্ঘকাল।

স্থানীয় স্কুল শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ হানিফ পাঠান ১৯৩৩ সালে এখানে প্রাচীনকালের কিছু মুদ্রা খুঁজে পান। হানিফ পাঠান এবং তার ছেলে হাবিবুল্লাহ পাঠান উয়ারি-বটেশ্বর এলাকার গঠন, স্থাপনা এবং বিভিন্ন প্রাচীন সামগ্রী অনুসন্ধান ও সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন। পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে তারা বিষয়টি অনেকের নজরে আনেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে ২০০০ সাল থেকে এখানে খনন কাজ পরিচালিত হয়। আবিষ্কৃত হয় বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন নগর সভ্যতার।

উয়ারি-বটেশ্বরের প্রধান প্রধান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন: খনন কাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহের মধ্যে প্রাচীন দুর্গনগরী, বন্দর, রাস্তা, ঘরবাড়ি, টেরাকোটা, রৌপ্যমুদ্রা, হাতের কাজ করা ধাতব সামগ্রী, অস্ত্রশস্ত্র ও গৃহকাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্য উল্লেখযোগ্য। উয়ারি-বটেশ্বর থেকে চার কিলোমিটার দূরে মন্দিরভিটা নামক একটি বৌদ্ধ মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে। অন্য আরেকটি গ্রামেও এরূপ আরেকটি বৌদ্ধ মন্দির পাওয়া গেছে। এ থেকে ধারণা করা যায়, এই জনপদে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য ছিলো। পুরো জনপদে এখনো পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশটি প্রত্নতাত্ত্বিক ক্ষেত্র পাওয়া গেছে, যার মধ্যে রঙেরটেক, সোনারুটলা, কেন্দুয়া, মরজাল, টঙ্গী রাজার বাড়ি, মন্দিরভিটা, চণ্ডীপাড়া, জয়মঙ্গল, কুণ্ডাপাড়া ও গোদাশিয়া উল্লেখযোগ্য।

খননকার্য পরিচালনাকারী অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের মতে, উয়ারি-বটেশ্বর একটি পরিকল্পিত, সমৃদ্ধ এবং প্রাচীন বাণিজ্যনগরী। আন্তর্জাতিক মানের ল্যাবরেটরি পরীক্ষার মাধ্যমে উয়ারি-বটেশ্বরের দুর্গনগরী ও প্রত্নসামগ্রী খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ অব্দের বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে উয়ারি-বটেশ্বরে ৬০০ মিটার করে দীর্ঘ চারটি মাটির দুর্গ-প্রাচীর আবিষ্কৃত হয়েছে। নিরাপত্তার জন্য দুর্গের চারদিকে পরিখার চিহ্ন বিদ্যমান। দুর্গের কাছাকাছি অসম রাজার গড় নামে ৫.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ আরেকটি মাটির বাঁধ রয়েছে। এসব প্রত্নতাত্ত্বিক ক্ষেত্রের অবস্থান থেকে ধারণা করা যায়, উয়ারি-বটেশ্বর ছিলো এক দূর্গনগর। আবার ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকেও উয়ারি-বটেশ্বর সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিলো। উয়ারি গ্রামে ১৬০ মিটার দীর্ঘ এবং ২৬ মিটার প্রশস্ত প্রাচীন পাকা রাস্তা বন্দর ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমের নিদর্শন বলে মনে করা হয়। এখানে উচ্চতাপমাত্রায় লোহা গলিয়ে কুঠারসহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরি করা হতো। এখানে কয়েক হাজার কুঠার পাওয়া গেছে। বন্দর ও বাণিজ্য নগরী হিসেবে এখানে বিভিন্ন কারখানা স্থাপিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। তামা, রূপা ও ব্রোঞ্জ গলিয়ে মুদ্রা প্রস্তুত করা হতো। পাথর কেটে তারা মনোরম ও সুদৃশ্য পুঁতি তৈরি করতো। তারা বিভিন্ন রাসয়নিকের ব্যবহার জানতো।

বাংলাদেশে একমাত্র উয়ারি-বটেশ্বরেই 'গর্ত-বসতি'র সন্ধান পাওয়া গেছে। মাটিতে গর্ত করে বসবাসের উপযোগী 'ঘর' নির্মাণ করা হতো। মানব সভ্যতার 'তাম্রযুগে' এরূপ 'ঘর' নির্মাণ করা হতো। ভারত এবং পাকিস্তানেও এরূপ 'গর্ত-বসতি'র সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা, প্রায় ৪০০০ বছর আগে ব্রোঞ্জযুগের মানুষ এ ধরনের ঘরে বসবাস করতো। উয়ারি-বটেশ্বরের নিকটবর্তী গ্রামগুলোতে কৃষিকাজ বিস্তার লাভ করেছিল। এর পাশাপাশি ধনিক, বণিক, পুরোহিত, কারিগর, রাজকর্মচারী ও যোদ্ধারা নগরে বসবাস করতো। ধাতব সামগ্রী তৈরি করার মতো দক্ষ কারিগর সেখানে ছিলো। কৃষিজীবীরা অ-কৃষিজীবী পেশাজীবীদের জন্য খাদ্য-শস্যের যোগান দিত।

ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী হওয়ার কারণে উয়ারি-বটেশ্বরের সাথে তৎকালীন অন্যান্য জনপদের নৌপথে যোগাযোগ গড়ে ওঠা সহজ ছিল। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক দিলীপ কুমার চক্রবর্তীর মতে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও রোমান সাম্রাজ্যের সাথে উয়ারি-বটেশ্বরের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। নগরতত্ত্ববিদ গর্ডন চাইল্ডের মতে, ইটের ব্যবহার নগরায়নের প্রাথমিক শর্ত পূরণ করে। একইসাথে নদীর উপস্থিতি হেনরি পিরানির নগরসৃষ্টি তত্ত্ব সমর্থন করে। সার্বিক বিচারে উয়ারি-বটেশ্বরকে প্রাচীন বাণিজ্য-নগরী বলেই অভিহিত করা যায়। ল্যাবরেটরি পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, এখানে প্রাপ্ত কোনো কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ সময়ের।

উয়ারি-বটেশ্বরের গুরুত্বঃ বাংলাদেশের প্রাচীনতম নগর সভ্যতার নিদর্শন হচ্ছে উয়ারি-বটেশ্বর। এটি একাধারে প্রাচীন দুর্গনগরী এবং বাণিজ্য-নগরী হিসেবে স্বীকৃত। কৃষির পাশাপাশি এখানে নদীকেন্দ্রিক যোগাযোগ, জীবিকা নির্বাহ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বন্দরভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালিত হতো। মুদ্রা অর্থনীতি ও কৃষি বহির্ভুত পেশার চর্চা উয়ারি-বটেশ্বরের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ইটের ব্যবহার, পাকা রাস্তা, প্রাচীর ও পরিখা উন্নত নগর সভ্যতার পরিচায়ক।

বুড়িগঙ্গার তীরে ঢাকার বিকাশ হয়েছে পনের শতকের পর। কিন্তু আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে ঢাকার অদূরে ব্রহ্মপুত্রের তীরে গড়ে উঠেছিল এক বিশাল বন্দর ও বাণিজ্য নগরী। দুর্গ ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত নিরাপত্ত ব্যবস্থা থেকেই এ নগরীর সমৃদ্ধি ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

বাংলার ইতিহাস চর্চা হতো আর্যদের আগমন এবং মৌর্য, পাল ও সেন সেনযুগ থেকে। আদিবাসী বলতে অনগ্রসর কোল-ভিল-সাঁওতাল জনগোষ্ঠীকে বুঝানো হতো। কিন্তু উয়ারি-বটেশ্বর বাংলার সমাজ-ইতিহাসকে নতুন করে লিখতে বাধ্য করছে। এ জনপদে প্রাচীন সভ্যতার স্ফূরণ ঘটেছিল উয়ারি-বটেশ্বর থেকে আমরা সে প্রমাণই পাই।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাণিজ্যিক নগরী হিসেবে উয়ারি-বটেশ্বরের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সম্প্রতি আবিষ্কৃত বাংলাদেশের এক প্রাচীন নগর সভ্যতা হচ্ছে উয়ারি-বটেশ্বর। প্রাচীন এ দুর্গনগরী বাণিজ্যিকভাবে অনেক সমৃদ্ধ ছিল। বাণিজ্যের পাশাপাশি এখানে কৃষি কাজেরও বিস্তার ঘটেছিল। এখানে বৌদ্ধ সংস্কৃতি উৎকর্ষ লাভ করেছিল বলে ধারণা করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। টলেমির *Geographia* গ্রন্থে 'সোনাগড়া' বলে যে স্থানের উল্লেখ করেছেন তা মূলত–

ক) ময়নামতি খ) পাহাড়পুর
গ) মহাস্থানগড় ঘ) উয়ারি-বটেশ্বর

২। উয়ারি-বটেশ্বর কোন সাম্রাজ্যের আমলে বিকশিত হয়?

ক) মৌর্যযুগে খ) পাল আমলে
গ) সেন আমলে ঘ) মোগল আমলে

৩। উয়ারি-বটেশ্বরে ৬০০ × ৬০০ মিটার আয়তনের কয়টি মাটির দুর্গ-প্রাচীর আবিষ্কৃত হয়েছে।?

ক) চারটি খ) পাঁচটি
গ) ছয়টি ঘ) সাতটি

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১	:	১। ক	২। ঘ			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২	:	১। গ	২। ঘ	৩। ক		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩	:	১। খ	২। গ			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪	:	১। ঘ	২। খ	৩। গ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫	:	১। খ	২। খ			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৬	:	১। গ	২। ঘ	৩। ক	৪। খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৭	:	১। ঘ	২। ক	৩। ক		
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	:	১। গ	২। ক	৩। খ	৪। ঘ	৫। গ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১। ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার কোনটি?
(ক) শালবন বিহার (খ) আনন্দ বিহার
(গ) সোমপুর বিহার (ঘ) কোনোটিই নয়

২। প্রস্তরযুগের প্রধানত কয়টি স্তর (ধরন) রয়েছে?
(ক) তিনটি (খ) চারটি
(গ) পাঁচটি (ঘ) ছয়টি

৩। বাংলার প্রাচীনতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হচ্ছে–
(i) ময়নামতি-পাহাড়পুর
(ii) মহাস্থানগড়-উয়ারি-বটেশ্বর
(iii) উয়ারি-বটেশ্বর- পাহাড়পুর
সঠিক উত্তর কোনটি?
(ক) i (খ) ii
(গ) i ও ii (ঘ) ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

স্থানীয় স্কুল শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ হানিফ পাঠান ১৯৩৩ সালে এখানে প্রাচীনকালের কিছু মুদ্রা খুঁজে পান। হানিফ পাঠান এবং তার ছেলে হাবিবুল্লাহ পাঠান তাদের এলাকার গঠন, স্থাপনা এবং বিভিন্ন প্রাচীন সামগ্রী অনুসন্ধান ও সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন। পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে তারা বিষয়টি অনেকের নজরে আনেন।

৪। উদ্দীপকে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে?
(ক) ময়নামতি (খ) পাহাড়পুর
(গ) মহাস্থানগড় (ঘ) উয়ারি-বটেশ্বর

৫। উয়ারি-বটেশ্বর আনুমানিক কত বছর পূর্বের প্রাচীন নিদর্শন?
(ক) ১৫০০ বছর (খ) ২০০০ বছর
(গ) ২৫০০ বছর (ঘ) ৩০০০ বছর

খ) সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্নঃ

উদ্দীপকটি পড়ুন এব নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

এসএসসি পরীক্ষা শেষে উজ্জ্বল ও তার বন্ধুরা একদিন বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করলো। উজ্জ্বলের বড় বোন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী জ্যোতির পরামর্শে তারা ময়নামতি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সেখানে সারাদিন ঘুরে তারা শালবন বিহার, আনন্দ বিহার, কোটিলামুড়া, চারপত্র মুড়া, রূপবান মুড়া সবকিছু ভালোভাবে দেখল। প্রাচীন বিভিন্ন স্থাপত্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখে উজ্জ্বল ও তার বন্ধুরা হতবাক। ইতিহাসের ছাত্রী জ্যোতি যখন তাদেরকে এগুলো সম্পর্কে বর্ণনা দিচ্ছিল তখন তারা আরো অভিভূত হয়েছিল।

১) ময়নামতি কোথায় অবস্থিত? ১
২) মহস্থানগড়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো কি কি? ২
৩) উদ্দীপকে বর্ণিত প্রত্নস্থানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। ৩
৪) "আধুনিক সমাজ ও সংস্কৃতির দর্পন হচ্ছে প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন"– কীভাবে? ব্যাখ্যা করুন। ৪

মানুষের নৃগোষ্ঠীগত পরিচয়
Ethnic Identity of Human Being

ইউনিট ৪

নরগোষ্ঠী বলতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কতকগুলো সাধারণ দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সৃষ্ট মানবপ্রজাতির উপবিভাগকে বুঝায়। এক্ষেত্রে বিবেচ্য দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলো হলো মাথার চুল, মাথার আকৃতি, নাকের ধরন, চোখের গঠন ও চোখের মণির রঙ, মুখমন্ডলের গঠন, ঠোঁটের প্রকৃতি, গায়ের রঙ, দৈহিক উচ্চতা ইত্যাদি। এছাড়া কখনও কখনও চোখের ভ্রু, কানের প্রকৃতি, কপালের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়গুলোও বিবেচিত হয়ে থাকে।

বাঙালি জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় নির্ণয় করা সহজ নয়। বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য পর্যালোচনার মাধ্যমে মনীষীরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বাঙালি জাতি মূলত একটি মিশ্র বা সংকর নৃগোষ্ঠী। মিশ্রতা সত্ত্বেও বাঙালি জাতিকে অনেকে 'অস্ট্রো-এশিয়াটিক বা অস্ট্রিক' বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলেও অভিহিত করেছেন। কেবল দৈহিক বৈশিষ্ট্যেই নয়, বাঙালি সংস্কৃতি বিনির্মাণেও অস্ট্রিক তথা আদি-অস্ট্রেলীয়দের প্রভাব সর্বাধিক। সম্প্রতি ভেলাম ভ্যান সেন্ডেল (Willem Van Schendel) তাঁর A History of Bangladesh গ্রন্থে উল্লেখ করেন, বাংলা ভাষায় টিবেটো-বার্মা, অস্ট্রো-এশিয়াটিক এবং দ্রাবিড়ীয় ভাষার প্রভাব আছে। যার অর্থ হচ্ছে বাঙালি নৃগোষ্ঠীর মধ্যেও এদের প্রভাব সুস্পষ্ট।

নরগোষ্ঠী (Race) এবং নৃগোষ্ঠীকে (Ethnic group/ethnic community) অনেকে সমার্থক অর্থে ব্যবহার করেন। তবে প্রত্যয় দু'টির ব্যবহার এবং ধারণার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। নরগোষ্ঠী হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট বংশধারা থেকে উত্তরাধীকারসূত্রে প্রাপ্ত অভিন্ন শারীরিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী জনগোষ্ঠী। আর নৃগোষ্ঠী হচ্ছে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় অভিন্ন সংস্কৃতির উত্তরাধীকারী জনগোষ্ঠী। নরগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে অভিন্ন দৈহিক বৈশিষ্ট্য এবং নৃগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে অভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য পায়। তবে একই নরগোষ্ঠীর সদস্যরা প্রায়ই অভিন্ন সংস্কৃতির চর্চা করেন। আবার অভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে একই নরগোষ্ঠীর দৈহিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৯ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৪.১ : নরগোষ্ঠীর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
পাঠ- ৪.২ : পৃথিবীর প্রধান নরগোষ্ঠীসমূহ
পাঠ- ৪.৩ : বাঙালি জাতির নৃগোষ্ঠীগত পরিচয়
পাঠ- ৪.৪ : বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহ
পাঠ- ৪.৫ : চাকমা
পাঠ- ৪.৬ : মারমা
পাঠ- ৪.৭ : ত্রিপুরা ও গারো
পাঠ- ৪.৮ : সাঁওতাল
পাঠ- ৪.৯ : মণিপুরি ও রাখাইন

পাঠ-৪.১ নরগোষ্ঠীর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
Definition and Characteristics of Race

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- নরগোষ্ঠীর সংজ্ঞা বলতে;
- নরগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	নরগোষ্ঠী, দৈহিক বৈশিষ্ট্য, ভৌগোলিক এলাকা।

মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম হল- 'হোমো-সেপিয়েন্স' (Homo-Sapiens)। মানুষের মধ্যে শরীরগত নানা পার্থক্য রয়েছে। শরীরগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানবপ্রজাতির এক একটি উপবিভাগকে বোঝাতে নরগোষ্ঠী বা নৃগোষ্ঠী (Race) প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। Race এর সমার্থক শব্দ হিসেবে Ethnic Group বা Ethnic Community প্রত্যয়টিও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষ মানবগোষ্ঠীকে বোঝাতে Race শব্দটি ব্যবহাহৃত হলেও সমাজবিজ্ঞানে প্রত্যয়টির বহুবিধ ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ইংরেজ লেখকরা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী বোঝাতে এ পদটি ব্যবহার করেন; যেমন- আইরিস রেস, স্কটিস রেস। কখনো কখনো ধর্মীয় দল-উপদলকে বোঝাতেও প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়, যেমন- Jewish Race।

নরগোষ্ঠীর সংজ্ঞা

নরগোষ্ঠীকে এমন একটি মানবসমষ্টি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, যার সদস্যদের জন্মগতভাবে প্রাপ্ত অভিন্ন কিছু দৈহিক বৈশিষ্ট থাকে যা তাদেরকে অন্যান্য মানবগোষ্ঠী থেকে পৃথক করে।

সামাজিক নৃবিজ্ঞানী E. B. Tylor-এর মতে, নরগোষ্ঠী হল স্বাতন্ত্র্যসূচক এবং জন্মসূত্রে বর্তায় এমন দৈহিক বৈশিষ্ট্যসমূহের সমন্বয়ে গঠিত মানবজাতির একটি প্রধান বিভাগ। সাধারণ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে এমন জনগোষ্ঠীকেও তিনি নৃগোষ্ঠী বলে অভিহিত করেছেন (Ethnic community is a group distinguished by common cultural characteristics)।

সমাজবিজ্ঞানী John M. Shepard তাঁর Sociology গ্রন্থে বলেন, নৃগোষ্ঠী হচ্ছে জনসংখ্যার সেই এক বিশেষ অংশ যারা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কতগুলো দৃষ্টিগোচর দৈহিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

নৃবিজ্ঞানী মেয়ার (Mayer)-এর মতে, নরগোষ্ঠী হল একটি সুনির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী এমন একদল মানুষ যাদের মধ্যে সাধারণ দৈহিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এবং যারা অন্যদের থেকে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ভিন্ন।

সুতরাং নরগোষ্ঠী হচ্ছে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অভিন্ন দৈহিক বৈশিষ্ট্যে অধিকারী মানগোষ্ঠী, যারা বিশ্বের নির্দিষ্ট একটি ভৌগোলিক অঞ্চলে অভিন্ন সংস্কৃতির অনুসারী হয়ে বসবাস করে। একটি নরগোষ্ঠীর সদস্যগণ সাধারণত অন্য নরগোষ্ঠীর সদস্যদের থেকে সাংস্কৃতিক ও দৈহিক বৈশিষ্ট্যে ভিন্নতর হয়ে থাকে।

নরগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে নরগোষ্ঠীর কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন:

(ক) নরগোষ্ঠী হচ্ছে মানবজাতির অন্যতম প্রধান উপবিভাগ;
(খ) নরগোষ্ঠীর মূলে রয়েছে স্বতন্ত্র ও সাধারণ কিছু দৈহিক বৈশিষ্ট্য, যা সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়;
(গ) সাধারণত মাথার গড়ন, মুখের চোয়াল, চুলের রং ও ধরন, গায়ের রং, নাক, চোখ, শারীরিক গঠন ও উচ্চতার মাধ্যমে নরগোষ্ঠী নির্ধারিত হয়;
(ঘ) বংশগতভাবে প্রাপ্ত শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই নরগোষ্ঠীকে পৃথক করা হয়;
(ঙ) নরগোষ্ঠী মানুষের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য যা বংশ পরম্পরায় অব্যাহত থাকে;
(চ) নির্দিষ্ট নরগোষ্ঠী প্রায়শ একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে বসবাস করে;
(ছ) প্রত্যেক নরগোষ্ঠীর নিজস্ব স্বতন্ত্র সংস্কৃতি রয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নরগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানবগোষ্ঠীকে বিভিন্ন উপবিভাগে বিভক্ত করে নরগোষ্ঠী। বিশ্বে প্রধানত শ্বেতকায়, কৃষ্ণকায়, মঙ্গোলীয় এবং অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এছাড়া আছে সংকর নরগোষ্ঠী। বাঙালি মানবগোষ্ঠী সংকর নরগোষ্ঠীর অন্তর্গত বলে মনে করা হয়। মানবগোষ্ঠীর পরিচয় জানতে হলে তার নরগোষ্ঠীগত পরিচয় জানা জরুরি। নরগোষ্ঠীগত পরিচয়ের সাথে মানুষের ভাষা এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পৃক্ত। এটি অনেকটা জন্মপরিচয়ের মত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। Race শব্দটি কি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়?

ক) নরগোষ্ঠী
খ) সাংস্কৃতিক মানবগোষ্ঠী
গ) ধর্মীয় গোষ্ঠী
ঘ) সবগুলো

২। নরগোষ্ঠীর মূল অর্থ হচ্ছে–

ক) দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানবগোষ্ঠীর বিভাজন
খ) আর্থিক সক্ষমতার ভিত্তিতে মানবগোষ্ঠীর বিভাজন
গ) ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানবগোষ্ঠীর বিভাজন
ঘ) ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানবগোষ্ঠীর বিভাজন

পাঠ-৪.২ পৃথিবীর প্রধান নরগোষ্ঠীসমূহ
Major Races of the World

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- মানবজাতির প্রধান প্রধান নরগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করতে পারবেন;
- নরগোষ্ঠীগুলোর দৈহিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	নরগোষ্ঠী, ককেশীয়, মঙ্গোলীয়, নিগ্রীয়, অস্ট্রালয়েড।

পৃথিবীর সব মানুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্য অভিন্ন নয়। কতকগুলো দৃষ্টিগোচর দৈহিক বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে মানবজাতিকে কয়েকটি বৃহত্তর উপবিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এ সকল উপবিভাগের মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কতকগুলো সাধারণ দৈহিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নানা ভিন্নতা বিদ্যমান। বিভিন্ন জীববিজ্ঞানী এবং নৃবিজ্ঞানীগণ নানা দৃষ্টিকোণ থেকে নরগোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণিকরণ করেছেন। যেমন:

ক্যারোলাস লিনিয়াস (Carolus Linnaeus, 1707-1778) মানবগোষ্ঠীর চারটি শ্রেণির কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হচ্ছে: ১. আমেরিকান (রেড ইন্ডিয়ান), ২. ইউরোপীয়, ৩. এশীয় এবং ৪. আফ্রিকান।

বিখ্যাত জার্মান নৃবিজ্ঞানী জোহান ফ্রেডারিক ব্লুমেনবাখ (Johan Frederich Blumenbuch, 1716- 1799) মানুষেকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা: ১. ককেশীয় বা সাদা, ২. মঙ্গোলীয় বা হলুদ, ৩. মালয়ী বা বাদামি, ৪. আমেরিকান বা লাল, এবং ৫. আফ্রিকান বা কালো।

১৯০৪ সালে সি.এইচ. স্ট্রাটজ সমগ্র মানবজাতিকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন। যথা: ১. আদিম (Primitive) এবং ২. সংকর (Metamorphic hybrid)। একই সালে ডাকওয়ার্থ (Duckworth) মাথা ও চোয়ালের বৈশিষ্ট্য এবং করোটিতত্ত্বভিত্তিক বিশ্লেষণে মানবজাতিকে সাতটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যথা: ১. অস্ট্রেলীয়; ২. আফ্রিকান; ৩. আন্দামান; ৪. ইউরোপীয়; ৫. পলিনেশীয়; ৬. গ্রীনল্যান্ডীয়; এবং ৭. দক্ষিণ আফ্রিকীয়।

১৯২৯ সালে এ. সি. হ্যাডন (A.C. Haddon) চুলের বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে নরগোষ্ঠীর যে শ্রেণিকরণ করেন তা হচ্ছে: ১. উলোট্রিচি (Ulotrichi)– কুঞ্চিতকেশ, ২. সিমোট্রিচি (Cymotrichi)– তরঙ্গায়িত কেশ এবং ৩. লিওট্রিচি (Leotrichi)– মসৃণ কেশ।

১৯৬০ সালে মুখাবয়বের আকৃতি ও অভিক্ষেপের ভিত্তিতে Isidore Geoffroy Saint Hilaire মানব শাখার চারটি প্রধান শ্রেণীরূপ করেন। যথা: ১. ককেশীয়, ২. মঙ্গোলীয়, ৩. ইথিওপীয় এবং ৪. হটেনটট।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে টি. এইচ. হাক্সলি মানবজাতিকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেন। বিভাগগুলো হল: ১. নিগ্রো জাতি, ২. অস্ট্রেলীয় জাতি, ৩. মঙ্গোলীয় জাতি, ৪. সানথোক্রয়েড (Xanthochroid) জাতি এবং ৫. মেলনোক্রয়েড (Malnochroid) জাতি।

ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে নরগোষ্ঠীর কয়েকটি ধরন পরিলক্ষিত হয়। এগুলো হচ্ছে: ক) ইউরোপীয়, খ) আমেরিকান, গ) আফ্রিকান, ঘ) অস্ট্রেলীয় ঙ) এশীয়, চ) ইন্ডিয়ান, ঘ) মাইক্রোনেশীয়, ঙ) মেলানেশীয় এবং চ) পলিনেশীয়।

প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন কারণে রেসমিশ্রণ ঘটার কারণে নরগোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ মানদন্ড খুঁজে পাওয়া কঠিন। বস্তুত নরগোষ্ঠীর সর্বসম্মত বা সর্বজনীন কোনো শ্রেণিবিভাগ নেই। উপর্যুক্ত বিভিন্ন ধরন বিশ্লেষণ করে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য যে শ্রেণিকরণটি করা হয় তা হলো:

১. ককেশীয় (Caucasoid);
২. মঙ্গোলীয় (Mongoloid) এবং
৩. নিগ্রীয়(Negroid)।

পরবর্তীতে চতুর্থ আরেকটি উপবিভাগ যুক্ত করা হয়। সেটি হলো অস্ট্রালয়েড (Australoid)। এখানে উল্লেখিত প্রধান তিনটি নরগোষ্ঠীর দৈহিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো:

১. **ককেশীয় বা শ্বেতকায় :** ককেশীয়দের মাথা প্রধানত লম্বাকৃতির হয়। এদের মুখ সরু বা লম্বাকৃতির, নাক প্রধানত খাড়া, চিকন, লম্বা ও সরু, চোখের রং হালকা থেকে কালো বাদামি, ঠোঁট পাতলা ধরনের এবং কান মাঝারি গোছের। এদের গায়ের রং প্রধানত সাদা বা লালচে সাদা। ককেশীয়দের চুলের রং বাদামি বা সোনালি এবং এরা দীর্ঘ দেহের অধিকারী।

২. **মঙ্গোলীয় বা বাদামি :** মঙ্গোলীয়দের মাথার আকৃতি প্রধানত চওড়া এবং গোল। এদের মুখাকৃতি চওড়া ও খর্বাকৃতির, নাক মোটা এবং চ্যাপটা। এদের গায়ের রং বাদামি বা হলুদ ধরনের, ঠোঁট মাঝারি ধরনের, চোখ কালো বাদামি। একমাত্র মঙ্গোলীয়দের চোখের পাতায় একটি ভাঁজ থাকে যাকে এপিক্যানথিক ফোল্ড বা নৃতাত্ত্বিক ভাঁজ বলে। মঙ্গোলীয়রা উচ্চতায় মাঝারি এবং তাদের শারীরিক গঠন খুব সুঠাম ও শক্তিশালী।

৩. **নিগ্রীয় বা কৃষ্ণকায় :** নিগ্রোদের মাথা সাধারণত লম্বাকৃতির, তবে কারো কারো মাথা চওড়া। এদের মুখাকৃতি ককেশীয়দের মতো অতটা লম্বা বা সরু নয়। এদের নাক মোটা ও মাংসল। এদের গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণের হয়ে থাকে। নিগ্রোদের ঠোঁট মোটা ও পুরু, চোখের রং কালো, কান ছোট ও প্রশস্ত। এদের চুলের রং কালো ও চুল কোঁকড়ানো হয়ে থাকে। নিগ্রো জনগোষ্ঠীর লোকেরা লম্বাকৃতি, মাঝারি এবং খর্বাকৃতি ধরনের হয়ে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর সব মানুষ এক ও অভিন্ন নয়। দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানবগোষ্ঠীকে বিভিন্ন উপবিভাগে বিভক্ত করা যায়। এটিই নরগোষ্ঠী। বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণিকরণ করেছেন। ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতেও মানবগোষ্ঠীর শ্রেণিকরণ পরিলক্ষিত হয়। সর্বসম্মত বা সর্বজনীন কোনো শ্রেণিকরণ না থাকলেও নরগোষ্ঠীর মোটামুটি গ্রহণযোগ্য চারটি ধরন হচ্ছে: শ্বেতকায়, কৃষ্ণকায়, মঙ্গোলীয় এবং অস্ট্রেলীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ক্যারোলাস লিনিয়াস নরগোষ্ঠীর কয়টি শ্রেণির উল্লেখ করেছেন?
ক) তিনটি খ) চারটি
গ) পাঁচটি ঘ) সাতটি

২। কোন নরগোষ্ঠীর গায়ের রং বাদামি বা হলুদ ধরনের?
ক) মঙ্গোলীয় খ) ককেশীয়
গ) নিগ্রীয় ঘ) অস্ট্রেলীয়

৩। চুলের বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে নরগোষ্ঠীর শ্রেণিকরণ করেছেন কে?
ক) জোহান ফ্রেডারিক ব্লুমেনবাখ খ) সি.এইচ. স্ট্রাটজ
গ) টি. এইচ. হাক্সলি ঘ) এ. সি. হ্যাডন

পাঠ-৪.৩ বাঙালি জাতির নরগোষ্ঠীগত পরিচয়
Racial Identity of Bengali Nation

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাঙালি জাতির নরগোষ্ঠীগত পরিচয় বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশের মানুষের নরগোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বাঙালি জাতি, নরগোষ্ঠীগত পরিচয়, সংকর নৃগোষ্ঠী।

বাংলাদেশে বসবাসকারী মানুষের প্রাক-ইতিহাস যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ সমর্থিত নয়। আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার অভাবে জীবাশ্মবিজ্ঞানের গবেষণা এখানে তেমন হয়নি। আর সেকারণেই বাংলাদেশের মানুষের আদি পরিচয় ও জন্ম-উৎস এখনো অনেকটা অমীমাংসিত।

এ অঞ্চলে প্রথম অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর লোকরা আসে এবং সেটি সম্ভবত পাঁচ-ছয় হাজার বছর পূর্বে ইন্দোচীন থেকে। এরপর একে একে দ্রাবিড়, আর্য, মঙ্গোল, শক, সেন, বর্মণ, তুর্কি, পাঠান, ইরানি, আরবীয়, আবিসিনীয়, ইংরেজ, পর্তুগিজ, মগ, ওলন্দাজ, আলপাইন প্রভৃতি ধারার মানুষদের আগমন ঘটে। এসব নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মিলন-মিশ্রণে বাঙ্গালীরা একটি সংকর জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। অনেকের মতে সংকর জনগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও বাঙ্গালীদের দেহবৈশিষ্ট্যে আদি অস্ট্রেলীয় বা অস্ট্রিক তথা ভেডিডড জনগোষ্ঠীর দৈহিক বৈশিষ্ট্য বেশি প্রকট।

মানবজীবাশ্ম সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের ঘাটতি থাকার কারণে বাংলাদেশের মানুষের নৃগোষ্ঠীগত পরিচয় নির্ণয় করা সহজ নয়। সাধারণভাবে স্বীকৃত মতামত হলো, এ অঞ্চলে আদি মানুষের বসবাস ছিল না। ফলে এখানে একসময় যারা বসতি স্থাপন করেছে তারা সবাই বহিরাগত। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষের মিলন-বিরোধের ফলে বাংলাদেশে একটা সংকর জনগোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে। স্যার হার্বার্ট রিজলে (Sir Herbert Risley) ভারতীয় উপমহাদেশের জনসমষ্টিকে সাতটি উপবিভাগে বিভক্ত করেন। এগুলো হচ্ছে:

১. তুর্কীয়-ইরানীয় (Turko-Iranian); ২. ভারতীয় আর্য (Indo-Aryan);
৩. শক-দ্রাবিড় (Scytho-Dravidian); ৪. আর্য-দ্রাবিড় (Aryo-Dravidian);
৫. মঙ্গোল-দ্রাবিড় (Mongolo-Dravidian); ৬. মঙ্গোলীয় (Mongoloid) এবং
৭. দ্রাবিড়ীয় (Dravidian)।

রিজলের মতে বাঙালিরা হল মঙ্গোল-দ্রাবিড়-প্রভাবিত একটা সংকর জনগোষ্ঠী। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন যে, বাঙালির শ্যামলা ও পীত গায়ের রং, চওড়া (গোল) মাথা, মধ্যমাকৃতি থেকে চওড়া নাক এবং মাঝারি উচ্চতা মঙ্গোলীয় প্রভাবের সাক্ষ্য দেয়। আবার বাদামি-কালো গায়ের রং, লম্বা মাথা, চওড়া নাক, চোখের রং ও গঠন, মুখে দাড়ি-গোঁফের আধিক্য দ্রাবিড়-প্রভাবেরই ফল।

জে. হুটন (J. Hutton) ভারতীয় উপমহাদেশের জনসমষ্টিকে মোট আটটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এগুলো হলো:

১. নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু (Negrito); ২. আদি-অস্ট্রেলীয় (Proto-Australoid);
৩. আদি-মেডিটেরিয়ান (Early Meditarrinian); ৪. সভ্য-মেডিটেরিয়ান (Civilized Meditarrinian);
৫. আর্মানীয় (Armanoid); ৬. আলপাইন (Alpine);
৭. বৈদিক-আর্য (Vedic-Aryan) এবং ৮. মঙ্গোলীয় (Mongoloid)।

পন্ডিত বিরজাসংকর গুহ ভারত উপমহাদেশের জনসমষ্টিকে ছয়টি নৃতাত্ত্বিক ধারায় ভাগ করেছেন। এগুলো হল:

১. নিগ্রোবটু (Negrito); ২. আদি অস্ট্রেলীয় (Proto-Australoid);
৩. মঙ্গোলীয় (Mongoloid); ৪. মেডিটেরিয়ান (Mediterrinian);
৫. আলপো-দিনারীয় (Alpo- Dinarik) এবং ৬. নর্ডিক (Nordic)।

নৃতত্ত্ববিদ ভন আইকস্টেড্ট (Von Eickstedt) ভারতীয় উপমহাদেশের মানবগোষ্ঠীকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন। এগুলো হল:
১. ভেড্ডিড-প্রাচিন অধিবাসী; ২. মেলানীড-কৃষ্ণকায় অধিবাসী এবং
৩. ইন্ডিড-আধুনিক অধিবাসী।

ভারতীয় পন্ডিত রমাপ্রসাদ চন্দ মনে করেন যে, বাঙালিরা বৈদিক-আর্যভাষি জাতিসমূহ দ্বারা প্রভাবিত। *বাঙালির ইতিহাস* গ্রন্থে (আদিপর্ব) নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেছেন, বাঙালির নৃগোষ্ঠী গঠনে আদি অস্ট্রেলীয় ও দ্রাবিড় প্রভাবের পাশাপাশি আর্যপ্রভাবও রয়েছে। নৃতাত্ত্বিকরা বাংলাদেশী মানুষের দেহে নিগ্রোবটুদের প্রভাবও লক্ষ্য করেছেন। এই প্রভাবের ফলে বাংলাদেশীদের মধ্যে খর্বাকৃতি দেহ, গায়ের রং কৃষ্ণাভ, পুরু ঠোঁট, চ্যাপ্টা নাক দৃষ্টিগোচর হয়।

বাংলাদেশের প্রাচীন মানুষের বিভিন্ন পর্যায়ে ভেড্ডিড রক্তের ছাপ পরিলক্ষিত হয়। সাঁওতাল, মুন্ডা, পোদ, শূদ্র, বাগদী, চন্ডাল, এমনকি ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের মধ্যেও এ ভেড্ডিড জাতির রক্তপ্রবাহ বহমান। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর আগমন ঘটে যারা রংপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করেছিল। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় অনেক বহিরাগত রাজবংশ যেমন- সেন, বর্মণ, খড়্গ ও চন্দ্র বাঙালির দৈহিক কাঠামোতে প্রভাব ফেলেছে। এছাড়া তুর্কি, পাঠান, মোঘল, ইরানি, আবিসিনীয় ও আরবীয় রক্তের ধারাও বাঙালির ধমনিতে প্রবহমান। ষোড়শ শতাব্দীতে বহিরাগত ইংরেজ, পর্তুগীজ, ডাচ, ফরাসি, দিনেমার এবং আরাকানের মগ জলদস্যুদের প্রভাবও বাঙালির রক্তে বিদ্যমান। এসবের দীর্ঘ ও পর্যায়ক্রমিক সংমিশ্রনে বাংলাদেশে সংকর বা মিশ্র জনগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে।

সংকর জাতি হওয়া সত্ত্বেও বাঙালির স্বকীয় দৈহিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। বাঙালির লম্বা প্রকৃতির মাথা, কালো চুল, চোখের মণি বাদামি বা কালো, গায়ের রং কালো-বাদামি, মাঝারি দৈহিক উচ্চতা, মুখাকৃতি লম্বা, মধ্যমাকৃতির নাসিকা এবং মুখে দাড়ি-গোঁফের প্রাচুর্য স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে। নৃতাত্ত্বিকদের মতে, এ বৈশিষ্ট্য অনেকটাই অস্ট্রিক প্রভাবিত। বাঙালির সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও অস্ট্রিক ভাষার প্রকট প্রভাব রয়েছে। তবে বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতিতে টিবেটো-বার্মা, অস্ট্রো-এশিয়াটিক এবং দ্রাবিড়ীয় ভাষার প্রভাবও অনস্বীকার্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	ভারতীয় জনগোষ্ঠীর উপর কোন কোন নরগোষ্ঠীর প্রভাব রয়েছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

কেবল ভৌগোলিক বা নৃতাত্ত্বিক কারণে নয়, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কারণে বাঙালি জনগোষ্ঠীকে ভারতীয় উপমাহাদেশের জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক করার সুযোগ নেই। বাঙালির নরগোষ্ঠীগত পরিচয়েও তাই ভারতীয় উপমাহাদেশের বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করতে হয়। তবে সার্বিক বিচারে এ মতই প্রসিদ্ধ যে, বাঙালি সংকর জাতি। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর আগমনে এরূপ জাতিগত সংমিশ্রন ঘটেছে। এ সংমিশ্রন কেবল নরগোষ্ঠীগত নয়, ভাষা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ঘটেছে। তবে নৃতাত্ত্বিকদের মতে, সংকর এ জাতিগোষ্ঠীর উপর অস্ট্রিক প্রভাব দৃশ্যমান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। জে. হুটন (J. Hutton) ভারত উপমহাদেশের জনসমষ্টিকে কয়টি ভাগে ভাগ করেন?
ক) ৬ টি খ) ৭ টি
গ) ৮ টি ঘ) ৯ টি

২। স্যার হার্বার্ট রিজলে ভারত উপমহাদেশের জনসমষ্টিকে কয়টি ভাগে ভাগ করেন?
ক) ৬ টি খ) ৭ টি
গ) ৮ টি ঘ) ৯ টি

পাঠ-৪.৪ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহ
Ethnic Groups in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংজ্ঞা লিখতে পারবেন;
- বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নাম বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বাংলাদেশ, নৃগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, চাকমা, মারমা, সাঁওতাল।

প্রাচীন কাল থেকেই বাংলাদেশে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর বাস। এখানে প্রধান নৃগোষ্ঠী হচ্ছে বাঙালি- যাদের ভাষা বাংলা এবং অধিকাংশই সমতল ভূমিতে বসবাস করে। এছাড়া বাংলাদেশে প্রায় ৫০টির মতো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী (Ethnic Grpoup) রয়েছে যাদের ভাষা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান বাঙালি নৃগোষ্ঠী থেকে পৃথক। কেবল বাঙালি নৃগোষ্ঠী নয়, প্রতিটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অন্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী থেকেও আলাদা। এ অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মধ্যে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, রাখাইন, সাঁওতাল, কুকি, তঞ্চঙ্গ্যা, কুমি, লুসাই, পাংখো, খুমি, খিয়াং, বনযোগী, মণিপুরী, খাসিয়া, গারো, হাজং, কোচ, ডালুই, রাজবংশী, মুন্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংজ্ঞা

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী একটি স্বতন্ত্র নরবংশ বা নরগোষ্ঠী। এরা সংখ্যায় এরা ক্ষুদ্রও হতে পরে আবার বড়ও হতে পারে। নৃগোষ্ঠী বলতে এমন একটি জনসমষ্টিকে বুঝায় যারা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সংগঠিতভাবে বসবাস করে, যাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে যা অন্য জাতিগোষ্ঠী থেকে পৃথক।

বৃটিশ নৃবিজ্ঞানী E.B.Tylor তাঁর *Dictionary of Anthropology* গ্রন্থে বলেন, নৃগোষ্ঠী স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। সাংস্কৃতিক ঐক্যই এদেরকে সংগঠিত করে রাখে (Ethnic community is a group distinguished by common cultural characteristics)।

Oxford Advanced Learner's Dictionary তে বলা হয়েছে, নৃগোষ্ঠী হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসরত জনসমষ্টি যারা নিজস্ব প্রথা, ভাষা, ধর্ম ইত্যাদির অনুসারী।

David Jary and Julia Jary তাঁদের *Collins Dictionary* তে বলেছেন, Ethnic group is a group of people sharing an identity which arises from a collective sense of a distinctive history. অর্থাৎ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হচ্ছে মানুষের এমন একটি গোষ্ঠী যারা স্বতন্ত্র ইতিহাসের সম্মিলিত অনুভূতি থেকে উদ্ভুত পরিচয় বহন করে।

William P. Scott এর মতে, Ethnic group is a group with a common cultural tradition and sense of identity which exists as a sub group of a larger society. অর্থাৎ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বলতে এমন এক মানবগোষ্ঠীকে বুঝায় যাদের একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা নিজস্ব পরিচিতিসহ বৃহৎ কোনো সমাজের উপ-গোষ্ঠী হিসেবে বসবাস করে।

সমাজবিজ্ঞানী Robertson তাঁর *Sociology* গ্রন্থে বলেন, Those who share similar cultural traits are socially defined as ethnic group. অর্থাৎ যারা অভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে তাদেরকে সামাজিকভাবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়।

সুতরাং নৃগোষ্ঠী বলতে এমন একটি সম্প্রদায়কে বোঝায় যারা কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করে, যাদের স্বকীয় ভাষা, জীবনধারা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। একটি নৃগোষ্ঠী অন্য নৃগোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র এবং তারা তাদের স্বতন্ত্র পরিচয় সম্পর্কে সচেতন।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

বাংলাদেশের প্রধান নরগোষ্ঠী বাঙালি। তবে শত শত বছর যাবৎ এখানে অনেকগুলো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বসবাস করছে। বাংলাদেশে প্রায় ৫০টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রয়েছে। ২০২২ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী দেশে মোট ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনসংখ্যা ১৬,৫০,১৫৯ জন, যা দেশের মোট জনসংখ্যার ০.৯৯ শতাংশ। দেশের সর্ববৃহৎ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হচ্ছে চাকমা সম্প্রদায়। তাদের সংখ্যা ৪৮৩,৩৬৫ জন। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে মারমা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী। এদের সংখ্যা ২২৪,২৬২ জন।

বাংলাদেশের প্রধান চারটি অঞ্চলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। এগুলো হচ্ছে: ক) দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল (চট্টগ্রাম ও পার্বত্য এলাকা), খ) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল গ) মধ্য-উত্তরাঞ্চল এবং ঘ) বৃহত্তর উত্তরবঙ্গ। এসব অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে চাকমা, মারমা (মগ), মুরং (ম্রো), ত্রিপুরা, সাঁওতাল, গারো, মণিপুরি, রাখাইন, হাজং, ভূঁইয়া, ভূমাজি, রাজবংশী, হোদি, পালোয়া, পাংখো, পাঙন, ডালুই, খরিয়া, সেন্ধুজ, কোটস, মাহাতো, খ্যাং, ওঁরাও, সাক, মুণ্ডা, খাসিয়া, তোড়ি, খারওয়ার, বর্মণ, মালো, ব্যোম, খোড়া, কুকি, তঞ্চঙ্গ্যা, লুসাই, কুকি, খুমি, বনযোগী,কাছাড়ি, পাহাড়িয়া ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের প্রতিটি নৃগোষ্ঠী স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এদের প্রত্যেকের ভাষা, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, ঐতিহ্য এককথায় সামগ্রিক জীবনধারা অপরাপর জনগোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র। এরা সাধারণত কৃষি, পশুপালন এবং কুটির শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করে জীবিকা নির্বাহ করে। কিছু নৃগোষ্ঠীর মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক ও পিতৃসূত্রীয়, আবার কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক ও মাতৃসূত্রীয় পরিবার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। প্রত্যেক নৃগোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অনুশাসন মেনে চলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ এক জাতিগত বৈচিত্র্যের দেশ। এখানে বাঙালি জনগোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্য থাকলেও প্রায় ৫৭টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এ ভূখন্ডকে বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলাদেশের প্রধান চারটি অঞ্চলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। এগুলো হচ্ছে: ক) দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল (চট্টগ্রাম ও পার্বত্য এলাকা), খ) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল গ) মধ্য-উত্তরাঞ্চল এবং ঘ) বৃহত্তর উত্তরবঙ্গ। পার্বত্য অঞ্চলে চাকমা, মারমা, মুরং, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, কুকি প্রভৃতি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাসবাস। পটুয়াখালীতে রাখাইন, ময়মনসিংহে গারো, হাজং এবং রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুরে সাঁওতাল, রাজবংশী নৃগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হচ্ছে "স্বতন্ত্র ইতিহাসের সম্মিলিত অনুভূতি থেকে উদ্ভুত" কে বলেছেন?

ক) জে. হুটন খ) জেরি এন্ড জেরি
গ) রবার্টসন ঘ) ই.বি টেইলর

২। ২০১১ সালের আদমশুমারিতে বাংলাদেশে মোট কয়টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে?

ক) ১১ টি খ) ১৭ টি
গ) ২৭ টি ঘ) ৩৯ টি

৩। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত?

ক) ০.১ শতাংশ খ) ১.১ শতাংশ
গ) ১.১৩ শতাংশ ঘ) ১১ শতাংশ

পাঠ-৪.৫ চাকমা
Chakma

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- চাকমা সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন।
- চাকমা সমাজের পরিবর্তন বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	চাকমা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, পাহাড়ি, পার্বত্য চট্টগ্রাম।

বাংলাদেশের অন্যতম ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী চাকমা। চাকমা জনগোষ্ঠী নিজেদের 'চাঙমা'-নামে পরিচয় দিতে পছন্দ করে। চাকমাদের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মতামত প্রচলিত আছে। একটি মতামত অনুযায়ী, চাকমারা চম্পক নগরের অধিবাসী ছিলো। চাকমা লোককাহিনীতে বলা হয়, এক চাকমা রাজপুত দেশজয়ের উদ্দেশ্যে চম্পকনগর থেকে মায়ানমারের আরাকানে গমন করেন এবং নবম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত আরাকানের বেশকিছু অঞ্চল চাকমারা শাসন করেন। পরে স্থানীয় আরাকানীদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে প্রথমে চট্টগ্রাম জেলায় এবং পরে আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে তারা বসতি স্থাপন করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে আগমনের পর চাকমারা তুলা চাষের মাধ্যমে প্রথমে মুঘল-সরকার ও পরে বৃটিশ-সরকারের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। বৃটিশ আমলেই চাকমাসহ পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত নৃগোষ্ঠীসমূহ পুরোপুরি কেন্দ্রীয় বৃটিশ সরকারের শাসনাধীনে আসে এবং বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার তাদের জন্য ১৯০০ সালে হিল্ট্রাকট্স ম্যানুয়েল প্রণয়ন করে। এই ম্যানুয়েল অনুসারে পার্বত্য অঞ্চলের নৃগোষ্ঠীসমূহের জন্য প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ম্যানুয়াল পরবর্তীতে সংশোধিত হয়।

আবাস ও ভাষা: চাকমারা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় বসবাস করে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক চাকমা বসবাস করে রাঙামাটি জেলায়। এরপর খাগড়াছড়ির স্থান। বান্দরবান ছাড়াও চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলাও অল্পসংখ্যক চাকমা বসবাস করে। বাংলাদেশের বাইরে ভারতের পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যে বেশকিছু চাকমা বাস করে। বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে চাকমা সর্ববৃহৎ। চাকমাদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ (২০২২ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী ৪,৮৩,২৯৯ জন)। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, চাকমারা পূর্বে টিবেটো বার্মা ভাষা পরিবারভুক্ত আরাকানি ভাষায় কথা বলত। চাকমাদের লিপিতে আরাকানি অক্ষরের প্রাধান্যই বেশি পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে তারা ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষায় কথা বলে। চাকমা ভাষার নিজস্ব লিখিত লিপি রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে চাকমা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়েছে। এছাড়াও সংগীত ও চলচিত্রেও চাকমা ভাষার ব্যবহার হচ্ছে।

নরগোষ্ঠীগত প্রভাব: চাকমাদের মধ্যে মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। তারা উচ্চতায় মাঝারি থেকে বেঁটে। তবে কারো কারো উচ্চতা লম্বাকৃতির। দৈহিক গড়নে বেশ শক্তিশালী। সুঠামদেহের অধিকারী চাকমা নৃগোষ্ঠীর মানুষ পার্বত্য অঞ্চলে চলাচলে অভিজ্ঞ।

বিবাহ ও পরিবার: চাকমা পরিবার পিতৃতান্ত্রিক ও পিতৃসূত্রীয়। ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব পিতা, স্বামী বা অন্য কোনো বয়স্ক পুরুষের হাতে ন্যস্ত থাকে। সম্পত্তি ও বংশমর্যাদার উত্তরাধিকার পিতা থেকে পুত্রের ওপর বর্তায়। যৌথ পরিবার এবং বিস্তৃত পরিবার ব্যবস্থা তেমন পরিলক্ষিত হয় না। পুত্রসন্তানেরা আত্মনির্ভরশীল হলেই তাদের বিয়ে দিয়ে আলাদা বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হয়। সাধারণত চাকমাদের মধ্যে নিজ বংশে সাত পুরুষের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ। চাকমা সমাজে অন্তর্বিবাহ ও বহির্বিবাহের প্রচলন রয়েছে। চাকমা যুবকরা সাধারণত নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ে করে থাকে। তবে অন্য সম্প্রদায়ের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তেমন কোনো নিষেধ নেই। এ সমাজে বর কনের বাড়িতে যায় না। বর পক্ষের লোকজন গিয়ে কনেকে তুলে নিয়ে এসে বরের বাড়িতে বিবাহ অনুষ্ঠান করে। বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা চাকমা সমাজে বিরল।

রাজনৈতিক সংগঠন: পরিবার চাকমা সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্রতম সামাজিক সংগঠন। এর পরের স্তরগুলি হচ্ছে পর্যায়ক্রমে গোত্তি বা গোজা, আদাম বা পাড়া, গ্রাম বা মৌজা এবং চাকমা সার্কেল। কতগুলো চাকমা পরিবার নিয়ে গঠিত হয় আদাম বা পাড়া। আদামের প্রধানকে বলা হয় কারবারী। চাকমা রাজা গ্রাম বা মৌজা প্রধানের সাথে আলাপ করে কারবারীকে নিয়োগ করেন। কারবারীদের কাজ হল গ্রামের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সালিশ বিচারকাজে মৌজাপ্রধানকে সহায়তা করা। কারবারীকে কোনো বেতন-ভাতা প্রদান করা হয় না। কতগুলো আদাম মিলে গঠিত হয় চাকমা গ্রাম বা মৌজা। মৌজার প্রধান হেডম্যান। চাকমা রাজার সুপারিশক্রমে স্থানীয় জেলা প্রশাসক হেডম্যান নিয়োগ করেন। হেডম্যানদের প্রধান কাজ সংশ্লিষ্ট মৌজার খাজনা আদায় করা, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং সালিশের মাধ্যমে গোলোযোগ নিস্পত্তি করা। চাকমা সমাজের কয়েকশত মৌজা বা গ্রাম নিয়ে চাকমা-সার্কেল গঠিত হয়। চাকমা রাজা চাকমা-সার্কেলের প্রধান। চাকমা রাজা বংশপরম্পরায় নিযুক্ত হন। চাকমা সমাজের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তিনি জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করেন। চাকমা রাজা চাকমা সমাজের সংহতির প্রতীক।

চাকমা অর্থনীতি: জীবিকা নির্বাহের জন্য চাকমারা পাহাড়ের ঢালে জুমচাষ করে। এ পদ্ধতিতে পাহাড়ের জঙ্গল, গাছপালা কেটে শুকানোর জন্য একমাসের মতো রেখে দেয়। এপ্রিল মাসের প্রথম তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। জুম পরিষ্কার করে বৃষ্টি হওয়ার পর ধান, তুলা, শসা, তিল, ভূট্টা ইত্যাদি বীজ একটা বাড়িতে নিয়ে একত্রিত করে দা/কাস্তে/নিড়ানির সাহায্যে ছোট ছোট গর্ত করে তাতে বপন করা হয়। পরবর্তীতে যে ফসল যখন পাকে তখন তা ঘরে তোলা হয়। এই চাষপদ্ধতিতে চাষাবাদই হচ্ছে জুমচাষ। চাকমা সমাজে সমাজে উদ্যানকৃষির প্রসার ঘটেছে এবং উদ্যানকৃষির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ফল উৎপাদন করা হচ্ছে। চাকমারা বাঙালিদের কাছ থেকে হালচাষ পদ্ধতি শিখছে। দুই পাহাড়ের মাঝখানে চাকমারা ধান চাষ করে। কৃষি ছাড়াও তারা হাঁস-মুরগি ও শূকর পালন করে থাকে।

চাকমাদের খাদ্য, পোশাক: চাকমাদের প্রধান খাদ্য ভাত। তা ছাড়া মাছ, মাংস, ফলমুল, ডাল ইত্যাদি তারা খেয়ে থাকে। স্থানীয়ভাবে তৈরিকৃত মদ চাকমাদের অন্যতম সামাজিক পানীয়। চাকমা পুরুষেরা ধুতি ও ঘরে-বোনা কোট পরিধান করে। মাঝে মাঝে পাগড়া (খাবাং) পরে। মেয়েরা 'পিনধান', 'খাদি' ও কখনও কখনও খাবাং এবং শাড়ি-ব্লাউজও পরে থাকে। 'পিনধান' হল ঘরে বোনা কালো রঙের স্কার্ট বা ঘাগরা যার উপরে ও নিচে লাল ডোরাকাটা এবং পাশে সূচিকর্মের নানা নকশা করা থাকে। মাথায় স্কার্ফের মতো কাপড় দেয়।

ধর্ম: চাকমারা প্রধানত বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। তাদের বৌদ্ধমন্দির বা বৌদ্ধবিহারের নাম ক্যাং। চাকমা অধ্যুষিত বিভিন্ন গ্রামে ক্যাং প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। প্রতিটি ক্যাং-এ একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু থাকেন যিনি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করে থাকেন। প্রদীপ জ্বেলে ফুল, ফল, মিষ্টি ও অন্যান্য উপাচার সহযোগে তারা বুদ্ধের উপাসনা করে। চাকমাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে হিন্দুধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ঘরে ঘরে চাকমাদের মধ্যে গঙ্গাপূজা এবং লক্ষ্মীপূজার প্রচলন রয়েছে। গোজেন নামের ঈশ্বরকে তারা খুব ভক্তি করে। তারা রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি ও ফসল রক্ষার জন্য মোরগ ও শূকর বলিদান করে পূজা-অর্চনা করে। তারা মাঝে মাঝে ধর্মীয় সম্মেলনের আয়োজন করে। চাকমাদের কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানে পার্বত্য অঞ্চলের অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর মানুষ অংশগ্রহণ করে। এছাড়া তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব মাঘীপূর্ণিমা আড়ম্বরের সাথে পালন করা হয়।

চাকমা সম্প্রদায়ের পরিবর্তন: ভারত বিভক্তির পর চাকমা সম্প্রদায়ে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। এ পরিবর্তনের জন্য কয়েকটি উপাদান ভূমিকা রেখেছে। এগুলো হচ্ছে:

(ক) কেন্দ্রীয় প্রশাসন: বৃটিশ আমলে চাকমাসমাজ কেন্দ্রীয় প্রশাসনের আওতাভুক্ত হয়। পাকিস্তান সরকার ১৯৬০ সালে চাকমা অধ্যুষিত এলাকায় স্থানীয় সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এই পরিবর্তনের ফলে চাকমারা তাদের ঐতিহ্যগত নেতৃত্বের স্থলে কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তিত স্থানীয় সরকারের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করতে থাকে। আগে কোনো সরকারি উন্নয়নমূলক কাজ ঐতিহ্যগত চাকমা-নেতৃত্বের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হত কিন্তু স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পর এর মাধ্যমেই সম্পাদন করা হয়।

(খ) শিক্ষা: চাকমা অধ্যুষিত গ্রাম ও শহর এলাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীসংখ্যা উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। আজকাল আধুনিক ও বৈচিত্র্যময় পেশা, যেমন: ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, অধ্যাপক, ঠিকাদার, সরকারি ও বেসরকারি চাকুরিতে চাকমারা ক্রমবর্ধমান হারে সম্পৃক্ত হচ্ছে। শিক্ষার সম্প্রসারণের ফলে সামাজিক সচলতার হার অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(গ) ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন: চাকমাসমাজে ভূমিতে ব্যক্তিমালিকানা না থাকার কারণে প্রাকৃতিক ভূমি যার যত খুশি অধিকার করে চাষ করতে পারত। কিন্তু পাকিস্তান সরকার সর্বপ্রথম সমতলভূমি, জুম ও উদ্যান চাষের জন্য জমি বন্দোবস্ত দেয়া শুরু করে। কাপ্তাই বাঁধের প্রভাবে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হওয়ায়, সমতল ভূমির মানুষ পার্বত্য এলাকায় বসতি স্থাপন করায়, পর্যটন সম্প্রসারণের কারনে এবং চাকমা জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পার্বত্য ভূমির উপর চাপ বাড়ছে।

(ঘ) উৎপাদনকৌশল পরিবর্তন: চাকমাসমাজে উৎপাদনকৌশলে ব্যপক পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে জুমচাষ পদ্ধতির পরিবর্তে জুমচাষের পাশাপাশি সমতলভূমিতে হালচাষ এবং সরকারি উদ্যোগের ফলে উদ্যানচাষ বাড়ছে। পতিত জমির ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

(ঙ) মুদ্রা অর্থনীতির প্রভাব: মুঘলযুগে এমনকি বৃটিশ আমলের শুরুর দিকে চাকমা সমাজে মুদ্রা-অর্থনীতির প্রচলন ছিল না। পরবর্তীতে মুদ্রা অর্থনীতি প্রসার লাভ করে এবং পুজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাহচর্য পেয়ে সমাজ আরও গতিশীল হয়।

(চ) স্থানীয় বাঙালি সমাজের প্রভাব: বাঙালিদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া বাড়ার ফলে চাকমা-বাঙালি সম্পর্ক সুদৃঢ় হয় যা চাকমাসমাজে পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। বাঙালি সমাজের প্রভাবে চাকমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ির ধরন, আসবাবপত্র, সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে।

(ছ) বৌদ্ধধর্মের প্রভাব: বিশ্ববৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাথে চাকমারা সম্পৃক্ত হচ্ছে এবং বিশ্ববৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। একটা সময়ে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ি গোষ্ঠীর অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তারা শান্তিবাহিনী গঠন করে। পাহাড়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রায় দুই দশকের সশস্ত্র সংগ্রামের পর পাহাড়ে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং তাদেরকে উন্নয়নের মূল স্রোতোধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার ও শান্তিবাহিনীর মধ্যে ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	চাকমা সম্প্রদায়ের পরিবর্তনের কারণগুলো চিহ্নিত করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

পরিসংখ্যান, পরিচিতি ও প্রভাবের দিক থেকে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হচ্ছে চাকমা। নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকারী এ জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলায় বসাবাস করে। পিতৃসূত্রীয় পরিবারে চাকমারা প্রধানত জুমচাষে অভ্যস্ত। গ্রামের হেডম্যান এবং সার্কেলের রাজা (চাকমা রাজা) তাদের রাজনৈতিক সংগঠনে নেতৃত্ব প্রদান করেন। বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী চাকমা সম্প্রদায়ে সাম্প্রতিককালে দৃশ্যমান সামাজিক পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "ক্যাং" হচ্ছে চাকমাদের–

ক) বৌদ্ধমন্দির খ) পাড়ার নাম
গ) উৎসবের নাম ঘ) কোনোটি নয়

২। কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক চাকমা বসবাস করে?

ক) খাগড়াছড়ি খ) বান্দরবান
গ) রাঙামাটি ঘ) কক্সবাজার

৩। কয়েকটি চাকমা পরিবার মিলে গঠিত হয়–

ক) সার্কেল খ) মৌজা
গ) গোত্র ঘ) আদাম বা পাড়া

পাঠ-৪.৬ মারমা
Marma

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- মারমা সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন।
- মারমা সম্প্রদায়ের পরিবর্তন বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মারমা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, পাহাড়ি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান।

'ম্রাইমা' শব্দ থেকে মারমা শব্দটির উৎপত্তি। মারমারা 'মগ' নামেও পরিচিত। মারমা নৃগোষ্ঠী বাংলাদেশের একটি অন্যতম ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, যাদের অধিকাংশই পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাস করে। সংখ্যার দিক থেকে মারমারা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী। ২০২২ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে মারমা নৃগোষ্ঠীর ২,২৪,২৬১ জন মানুষ বসবাস করেন।

আবাস ও ভাষা: মারমারা মূলত রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় বসবাস করে। তিন পার্বত্য জেলায় তাদের বসবাস পরিলক্ষিত হলেও মূল জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ বান্দরবান জেলায় বসবাস করে। এর বাইরে পটুয়াখালি ও কক্সবাজার জেলাও তারা বসবাস করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ মারমারাই মায়ানমার থেকে আগত। বাংলাদেশ ছাড়াও এ জনগোষ্ঠী ভারত ও মায়ানমারেও বসবাস করে। মারমাদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে বার্মিজ সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে। মারমারা লেখালেখির ক্ষেত্রে তারা বার্মিজ বর্ণমালা ব্যবহার করে। মারমাদের ভাষা তিব্বত-বার্মা ভাষাসমূহের অধীনে বার্মা-আরাকান শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। তবে সাম্প্রতিককালে মারমারা বাংলা ও চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষাও ব্যবহার করে থাকে। মারমারা বার্মিজ ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে থাকে। তাদের নববর্ষ উদযাপনের অনুষ্ঠানকে সাংগ্রাই বলা হয়।

জাতিগত উৎপত্তি: মারমারা মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত। তারা মূলত মায়ানমারের আরাকানিদের বংশধর। মারমা সম্প্রদায়ের গয়ের রঙ হলদে ফর্সা, উচ্চতা তুলনামূলকভাবে খাটো, নাক বোঁচা, কালো চুল ও ছোট চোখ। ১৪ থেকে ১৭ শতকে বার্মিজরা আরাকান জয় করলে মারমারা আরাকান থেকে বিতাড়িত হয়। তখন তারা থেকে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে। মায়ানমারের প্রাচীন পেগুসিটি হল মারমা সম্প্রদায়ের আদি বাসস্থান।

বিবাহ ও পরিবার ব্যবস্থা: মারমাদের পরিবার ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। মারমা পরিবারের প্রধান পিতা হলেও পারিবারিক কাজকর্মে মাতার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। পরিবারের সবচেয়ে বয়স্ক পুরুষটি মারমা পরিবারের প্রধান হিসেবে ভূমিকা পালন করে। মারমা পরিবার সাধারণত একক পরিবার। পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারে ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই সমান অধিকার রয়েছে। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে তারা প্রাচীন বার্মিজ প্রথা অনুসরণ করে যাকে 'থামোতাদা' (Thamohada) বলা হয়। পুত্র এবং কন্যা যে কেউই পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সাধারণত সবচেয়ে প্রিয় সন্তানটিই গৃহের মালিকানা লাভ করে এবং পিতামাতাকে দেখাশোনা করে। মারমা সম্প্রদায়ে সাধারণত একবিবাহ ব্যবস্থাই প্রচলিত। তবে বহুবিবাহ প্রথা ও দেখা যায়। নারী এবং পুরুষ উভয়েরই বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে হেডম্যান বা কারবারির বিচারই চূড়ান্ত। মারমা সমাজে অন্তর্বিবাহ ও বহির্বিবাহ দুই ধরনের বিবাহ প্রথাই প্রচলিত। বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও সম্পত্তির মালিকানা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মারমরা নারীদেরকে স্বাধীনতা দেয়।

ধর্ম: মারমারা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। প্রায় প্রত্যেকটি মারমা গ্রামে বৌদ্ধ বিহার 'কিয়াং' এবং বৌদ্ধভিক্ষু "ভান্তে'দের অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। মারমারা বৈশাখী পূর্ণিমা, আশ্বিনী পূর্ণিমা, কার্তিকী পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা প্রভৃতি বিশেষ দিনগুলোতে বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে ফুল দিয়ে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে বুদ্ধের বন্দনা করে থাকে। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধদের মত মারমারাও Theravada Buddhism-এ বিশ্বাসী। তারা বিভিন্ন দেবতার অর্চনা করে থাকে। মারমা নৃগোষ্ঠীর একটি অংশ সর্বপ্রাণবাদ

(Animism) চর্চা করে, যাদের ধর্মীয় গ্রন্থের নাম "খাদুত্যিয়াং" (Khaduttiang)। মারমারা অতিপ্রাকৃতিক শক্তিতে বিশ্বাস করে। এজন্য তারা বিভিন্ন রীতি ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ শক্তিকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে।

অর্থনীতি: কৃষি নির্ভর মারমা সম্প্রদায়ের প্রধান পেশা কৃষি। সাধারণত তারা জুমচাষ করে। মারমা নৃগোষ্ঠীর মধ্যে বসতবাড়িভিত্তিক ছোট আকারের বাগানকৃষি দেখা যায়। এছাড়াও তারা ঝুড়ি এবং চোলাই মদ তৈরি করে। মারমা নারীরা বস্ত্র তৈরিতে পারদর্শী।

রাজনৈতিক সংগঠন: মারমা সমাজ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বোমাং সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত। মারমা সমাজের প্রধান হলেন বোমাং চিফ বা বোমাং রাজা। মারমা সমাজ কতগুলো মৌজায় বিভক্ত। প্রত্যেক মৌজায় কতগুলো গ্রাম রয়েছে। মারমা ভাষায় এ গ্রামকে বলা হয় 'রোয়া'। গ্রামবাসী দ্বারা গ্রামের প্রধান মনোনীত হয়, যাকে 'রোয়াজা' বলা হয়। মারমাদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঐতিহ্যগতভাবে ত্রিমাত্রিক। তাদের গ্রাম/পাড়া, মৌজা এবং সার্কেলের প্রধানকে যথাক্রমে কারবারি, হেডম্যান এবং রাজা বা সার্কেল চিফ বলা হয়। এই প্রশাসনিক প্রধানগণ আইন প্রয়োগ, ঝগড়া-বিবাদ মিমাংসা এবং সামাজিক শৃংখলা বজায় রাখতে ভূমিকা পালন করেন।

খাদ্যাভ্যাস, স্থাপত্যরীতি ও পোশাক: মারমারা ভাত, মাছ, মাংস এবং নানা ধরনের শাক-সবজি খেয়ে থাকে। সিদ্ধ শাক-সবজির সাথে মরিচ মিশিয়ে প্রস্তুত করা 'তোহজা' তাদের একটি প্রিয় খাবার। শুটকি মাছ থেকে প্রস্তুতকৃত 'নাপ্পি' বা 'আওয়াংপি' তাদের আরেকটি পছন্দের খাবার। মারমারা বাঁশ, কাঠ ও ছন দিয়ে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে। কয়েকটি বাঁশের খুঁটির উপর মাটি থেকে ৬-৭ ফুট উপরে তাদের ঘরবাড়ি নির্মিত হয়। বাঁশ বা কাঠের উঁচু ভিতের উপর নির্মিত ঘরবাড়িকে 'মাচাং' বলা হয়। গৃহপালিত পশু রাখা, জ্বালানি কাঠ সংরক্ষণ, জুমের ফসল রাখা ইত্যাদি কাজে তারা মাচাং ব্যবহার করে থাকে।

মারমা নারী পুরুষেরা পোশাক পরিচ্ছদে পরিপাটি। মারমা পুরুষেরা গায়ে জামা ও লুঙ্গি পরে। পুরুষেরা মাথায় 'গবং' নামক পাগড়ি পরে। মারমা নারীরা 'আনিঞ্জ' নামক এক ধরনের ব্লাউজ পরে। এছাড়াও মারমা নারীরা 'রাংকাই' ও 'থামি' নামের দুটি বিশেষ ধরনের পোশাক পরে থাকে। বর্তমানে মারমা নারীও পুরুষ উভয়েই লুঙ্গি পরে থাকে। মারমারা ঐতিহ্যবাহী বুনন প্রযুক্তির সাহায্যে নিজেদের পোশাক নিজেরাই তৈরি করে থাকে।

মারমা সম্প্রদায়ের পরিবর্তন: গত কয়েক দশকে মারমা সম্প্রদায়ে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। যেসব কারণে চাকমাসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে সেসব কারণে মারমা সম্প্রদায়েও পরিবর্তন ত্বরান্বিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে, শিক্ষা, নগরায়ন, মুদ্রা ও বাজার অর্থনীতি, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি ব্যবস্থার উন্নতি, শান্তি চুক্তিসহ সরকারি নানা উদ্যোগ মারমা সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন করছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	মারমা সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো লিপিবদ্ধ করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

মারমারা মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত। তারা মূলত মায়ানমারের আরাকানিদের বংশধর। তিন পার্বত্য জেলা রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে তাদের বসবাস। তবে মূল জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ বসবাস করে বান্দরবান জেলায়। এর বাইরে পটুয়াখালি ও কক্সবাজার জেলাও তারা বসবাস করে। বাংলাদেশ ছাড়াও এ জনগোষ্ঠী ভারত ও মায়ানমারেও বসবাস করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ মারমারাই মায়ানমার থেকে আগত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মারমাদের আদি নিবাস কোথায়?

ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম খ) আরাকান গ) ত্রিপুরা ঘ) মালদহ

২। মারমাদের নববর্ষ উৎসবের নাম কী?

ক) বৈসাবী খ) রাংকাই গ) রোয়া ঘ) সাংগ্রাই

পাঠ-৪.৭ ত্রিপুরা ও গারো
Tripura and Garo

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- গারো সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ত্রিপুরা, গারো, পাহাড়ি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান।

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান দু'টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হচ্ছে ত্রিপুরা এবং গারো। লোক সংখ্যার দিক থেকে ত্রিপুরারা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের তৃতীয় বৃহত্তম ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী। ত্রিপুরারা বাংলাদেশের পাহাড়ি ও সমতল উভয় অঞ্চলেই বসবাস করে। তবে চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলে তাদের বসতি বেশি। ভাষা-সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতি এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যের দিক থেকে ত্রিপুরারা সমৃদ্ধ। ভারতীয় উপমহাদেশের ত্রিপুরা জাতি একটি আদি ও ঐতিহ্যবাহী জনগোষ্ঠী। এদের একটি অংশ বাংলাদেশে বসবাস করে। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে এরা বাংলাদেশে আগত বলে জানা যায়।

ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের নৃতাত্ত্বিক ও জাতিগত পরিচয়: ত্রিপুরা জাতি ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি শক্তিশালী নৃগোষ্ঠীরূপে পরিচিত ছিল। ত্রিপুরারা মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত। 'টিপরা' নামেও এদের পরিচিতি রয়েছে। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর পূর্বসুরীগণ মঙ্গোলিয়া থেকে মধ্য এশিয়ার তিব্বত ও সাইবেরিয়ার পথ পরিক্রমণ করে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে আগমন করে। বাংলাদেশে বসবাসরত ত্রিপুরাদের আদি বাসস্থান ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য। সেখান থেকে তারা এদেশে আগমন করেছে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় ত্রিপুরা বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতের সাথে যুক্ত হয়। ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠী অনার্য। এরা মাঝারি গড়নের অধিকারী। এদের গায়ের রং উজ্জ্বল, নাক বোঁচা, চোখ ছোট এবং চুল খাড়া হয়ে থাকে।

বাসস্থান, ভাষা: বাংলাদেশের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, ফরিদপুর, শ্রীমঙ্গল, মৌলভিবাজার, কুমিল্লা, কক্সবাজার প্রভৃতি জেলাসমূহে ত্রিপুরারা বসবাস করে। তবে ত্রিপুরাদের প্রায় ৮০ শতাংশের বসবাস পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিশেষ করে রামগড় এবং খাগড়াছড়িতে। ত্রিপুরাদের ভাষার নাম ককবরক `kok-borok'। এ ভাষাটি 'বোডো' দলের (`bodo group') অন্তর্ভূক্ত। সিনো-টিবেটান (Sino-Tibetan) পরিবার ভুক্ত টিবেটো-বার্মা (Tibeto-Burma) ভাষার আসাম শাখা থেকে ককবরক ভাষাটির উৎপত্তি। ককবরক ভাষার নিজস্ব অক্ষর-লিপি রয়েছে।

পরিবার, বিবাহ ও ধর্ম: ত্রিপুরাদের পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থায় পিতাই পরিবারের প্রধান। পিতার অবর্তমানে পরিবারের সবচেয়ে বয়স্ক পুত্র পরিবারের প্রধান হয়। সন্তান পৈতৃক সূত্রে বংশ পরিচয় লাভ করে থাকে। তবে তাদের কিছু গোত্রে মেয়েরা মাতৃবংশ পরিচয় লাভ করে থাকে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র অগ্রাধিকার পায়। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীদের মধ্যে পিতা-মাতা বা অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথাগতভাবে ত্রিপুরাদের নিজ গোত্রের মধ্যে বিবাহ অনুমোদিত নয়। যৌতুক প্রথা এ সমাজে নিষিদ্ধ। বরের পিতাকে কনের পোষাক-পরিচ্ছদ, অলংকারের খরচ বহন করতে হয়। ত্রিপুরাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত। বহুবিবাহ এ সমাজে দেখা যায়। তবে তা প্রথাগতভাবে নিন্দনীয়। ত্রিপুরারা সনাতন হিন্দু ধর্মের অনুসারী। সনাতন ধর্মালম্বী হলেও বেদে বর্ণিত সকল দেব-দেবীর পূজা এ সমাজে হয় না। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী শিব এবং কালীসহ ১৪ জন দেব-দেবীর পূজা অর্চনা করে থাকে।

সমাজ ব্যবস্থা, পোশাক, অর্থনীতি: ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর 'সমাজ'কে দফা (দল) বলা হয়। ত্রিপুরারা মোট ৩৬টি দফায় বিভক্ত। এর মধ্যে ১৬টি দফা বাংলাদেশে বসবাস করে। প্রত্যেকটি দফার নিজস্ব পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-প্রথা ও অলংকার রয়েছে। ত্রিপুরা পুরুষেরা ধূতি পরে থাকে। তারা মাথায় পাগড়ি/টুপি পরিধান করে। ত্রিপুরা নারীরা শীরের উর্ধ্বাংশে ব্লাউজ এবং নিম্নাংশে সায়া পরিধান করে। ত্রিপুরা নারী-পুরুষ উভয়েই রূপা নির্মিত বক্র চন্দ্রাকৃতির কানের

দুল পরে থাকে। ত্রিপুরা সমাজের অবিবাহিত মেয়েরা রঙিন জামা-কাপড় পরে থাকে। ত্রিপুরা নারীরা বেংকি, বালা, কুনচি, আঁচলী, রাংবাতার, সুরমা, ওয়াকুম ইত্যাদি অলংকার পরিধান করে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ত্রিপুরাদের অর্থনীতি জুমচাষ, পশু পালন ও হালচাষের উপর নির্ভরশীল। খুব অল্পসংখ্যক শিক্ষিত ত্রিপুরা চাকুরি ও অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত। ত্রিপুরাদের মধ্যে বাগান চাষও প্রচলিত। এদের মধ্যে ব্যবসায়ীর সংখ্যা খুবই কম। জুমের উপর ভিত্তি করেই ত্রিপুরা সমাজের অর্থনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। তাদের মূল্যবোধ, বাদ্য-গীত, পোষাক-পরিচ্ছদ, গান, ছড়া, গল্প ইত্যাদির উপর জুম চাষের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা, জুম ও কৃষি কাজের জন্য পর্যাপ্ত জমির অভাব ইত্যাদি কারণে ত্রিপুরাদের মধ্যে দারিদ্র্যের হার বেশি।

সংস্কৃতি: ত্রিপুরা লোকসাহিত্য বেশ সমৃদ্ধ। ত্রিপুরাদের জীবন-জীবিকা এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণে, বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে নৃত্য, গীত এবং বাদ্যযন্ত্র অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। তাদের ঐতিহ্যবাহী কতিপয় নৃত্য হচ্ছে, গড়িয়া নৃত্য এবং বোরপূজা নৃত্য। ত্রিপুরাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠান হল বৈসুকি বা বৈস, যা মূলত বর্ষবরণের অনুষ্ঠান। এই উৎসব তিন দিন ধরে উদযাপন করা হয়। এ দিনে বাড়ি ঘর ফুল দিয়ে সাজানো হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো লিপিবদ্ধ করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

গারো (মান্দি)

নৃগোষ্ঠী হিসাবে 'গারো'দের নামকরণ নিয়ে মতভিন্নতা রয়েছে। একটি মত অনুসারে, গারো পাহাড়ের নামানুসারে 'গারো' নামকরণ করা হয়। অন্য মতে বলা হয়েছে, গারো নৃগোষ্ঠীর নামানুসারে 'গারো পাহাড়' নামকরণ হয়েছে। গারোরা নিজেদেরকে মান্দাই/মান্দি নামে পরিচয় দিয়ে থাকে। গারো ভাষায় মান্দি অর্থ মানুষ। গারো এথনিক সম্প্রদায় দুই শ্রেণিভূক্ত; যথা- ক) অচ্ছিক গারো ও খ) লামদানি গারো। বাংলাদেশে প্রধানত লামদানি গারোরা বাস করে।

পরিচয়, ভাষা ও অবস্থান: গারোরা ভারতের আসাম প্রদেশের আদি বাসিন্দা। চেহারার দিক থেকে তারা আসামের খাসিয়া, নাগা ও মণিপুরীদের উত্তরাধিকারী। গারোদের মধ্যে মঙ্গোলয়েড নৃগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এদের শরীর লোমহীন, মুখমন্ডল গোলাকার, নাক প্রশস্ত ও চ্যাপ্টা, প্রায় দাড়িবিহীন; ঠোঁট মোটা, ভারী ও ভুরু; কপাল ক্ষুদ্রাকৃতির, চুল কালো, সোজা ও ঢেউ খেলানো; গায়ের রং ফর্সা।

গারোদের ভাষার নামও মান্দি বা গারো ভাষা। এ ভাষার মধ্যে বাংলা ও আসামি ভাষার মিশ্রণ রয়েছে। এদের ভাষা মূলত সিনো-টিবেটান ভাষার অন্তর্গত, যা বোডো বা বরা ভাষা উপগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এ ভাষার নিজস্ব কেনো লিপি বা অক্ষর নেই। ফলে এ ভাষার লিখিত কোনো রূপ নেই। বাংলাদেশের গারোরা বাংলা হরফে লিখছে।

গারোদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভারতের আসাম ও মেঘালয়ে বসবাস করে। বাংলাদেশের গারো পাহাড়ের পাদদেশে ময়মনসিংহ জেলার নালিতাবাড়ি, হালুয়াঘাট, কলমাকান্দা, দুর্গাপুর, শ্রীবর্দী এলাকায় লামদানি শ্রেণির গারো বাস করে। এছাড়া টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর পাহাড়ি অঞ্চলেও অনেক গারোর বসবাস রয়েছে।

পরিবার, বিবাহ ও ধর্ম: গারো পরিবার মাতৃতান্ত্রিক। পরিবারের সকল কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা মাতা বা স্ত্রীর হাতে ন্যস্ত থাকে। সে কারণে গারো পরিবারে ও সম্প্রদায়ে পুরুষের প্রাধাণ্য কম। এ সমাজে উত্তরাধিকার মাতৃধারায় মা থেকে মেয়েতে বর্তায়। এখানে মাতৃবাস রীতি অনুসরণ করা হয়। বিয়ের পর গারো দম্পতি স্ত্রীর মায়ের বাড়িতে বসবাস করে। ইদানীং শিক্ষিত গারো-দম্পতিদের মধ্যে এর বিপরীত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। গারো সম্প্রদায়ে একক বিবাহভিত্তিক পরিবার বিদ্যামান। খ্রিষ্ঠান গারোদের বিয়ে চার্চে অনুষ্ঠিত হয়। আর অন্য গারোদের বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহ্যবাহী নিয়মে। বাংলাদেশে বসবাসরত গারো সম্প্রদায়ের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান। এদের ঐতিহ্যগত ধর্মের নাম সাংসারেক। বর্তশানে শতকরা প্রায় ৮ ভাগ সাংসারেক ধর্মের অনুসারী এবং বাকি ২ ভাগ ইসলাম ও হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী। গারোসমাজে ব্যবহৃত 'সাংসারেক' শব্দটি সম্ভবত এসেছে বাংলা সংসার থেকে। জগৎ সংসার বোঝাতেই সাংসারেক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সংসার, পরিবার, খানা অর্থাৎ জাগতিক বিষয়কে কেন্দ্র করেই গারোদের ধর্ম। গারোরা ঐতিহ্যগতভাবে সর্বপ্রাণবাদে

বিশ্বাসী। তারা অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস করে, যাকে মাইতে বলে উল্লেখ করা হয়। এই মাইতে বলতে দেবদেবী এবং প্রেতাত্মা উভয়কে বুঝায়। গারোদের প্রধান পূজার নাম 'ওয়ানগালা'।

সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, ক্ষমতাকাঠামো ও সমাজ পরিবর্তন: আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি, গারো সম্প্রদায় মাতৃসূত্রীয় ব্যবস্থা অনুসরণ করে। তাদের সর্ববৃহৎ পরিসরের মাতৃসূত্রীয় গোত্রের নাম চাটচি, যার অর্থ জ্ঞতি বা আত্মীয়স্বজন। যারা এই গোত্রভুক্ত তারা সবাই একে অন্যের সাথে মাতৃসূত্রীয় রীতিতে সম্পর্কযুক্ত। বাংলাদেশের গারোরা একসময় জুমপদ্ধতিতে চাষ করত। কিন্তু ১৯৫০ সালে তৎকালীন সরকার জুমচাষের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরপ করে। এতে তারা জুমচাষের পরিবর্তে হালকৃষিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের মধ্যে ধান, নানাপ্রকার সবজি ও আনারস অন্যতম। তাছাড়া, জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করেও তারা অর্থ উপার্জন করে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই হাটবাজারে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করে। গারো নারীদের একটি অংশ শহরে বিউটি পার্লারে রূপসজ্জা কর্মী হিসেবে কাজ করে।

গারো সমাজের ক্ষমতাকাঠামোয় গ্রামপর্যায়ের নেতৃত্বে রয়েছেন গ্রামপ্রধান। এ সমাজে গ্রামপ্রধান ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সালিশ ও বিচারকার্য পরিচালনা করেন। গারো সম্প্রদায়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের আওতায় স্থানীয় সরকারব্যবস্থা, যেমন– ইউনিয়ন পরিষাদ, উপজেলা পরিষদইত্যাদি গড়ে উঠেছে। ঐতিহ্যবাহী গারো নেতৃত্বের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার নেতৃত্ব জনপ্রিয়তা লাভ করছে।

গারোদের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে খ্রিস্টান মিশনারিদের আগমনের ফলে গারোরা ব্যপকভাবে খ্রিস্টানধর্মে দীক্ষিত হয়। গারো অঞ্চলে মিশনারিদের ব্যবস্থাপনায় অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। শিক্ষিত গারোরা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হওয়ায় তাদের মধ্যে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের আওতাভুক্ত হওয়ার ফলে গারোসমাজে গ্রাম প্রধানের ঐতিহ্যবাহী কর্তৃত্ব হ্রাস পেয়েছ।

শিক্ষার্থীর কাজ	গারো সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো লিপিবদ্ধ করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের মানুষ একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তারা পাহাড় এবং সমতলে উভয় স্থানে বসবাস করে। গারোরা মূলত সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী। উভয় নৃগোষ্ঠী মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভুত। ভারতের ত্রিপুরা এবং আসাম থেকে তারা এ ভূখন্ডে এসেছে। ত্রিপুরারা পিতৃসূত্রীয় হলেও গারোরা মাতৃসূত্রীয় পরিবার ব্যবস্থার অনুসারী। উভয় সম্প্রদায়ের অর্থনীতির মূল ভিত্তি হচ্ছে কৃষি। ত্রিপুরারা হিন্দু ধর্মের অনুসারী হলেও গারোদের বেশির ভাগ ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশে বসবাসরত ত্রিপুরাদের আদি বাসস্থান কোথায়?

ক) ভারতের ত্রিপুরা খ) আসাম
গ) নেপাল ঘ) রাঙামাটি

২। ত্রিপুরারা মূলত কোন ধর্মের অনুসারী?

ক) ইসলাম ধর্ম খ) বৌদ্ধ ধর্ম
গ) হিন্দু ধর্ম ঘ) খ্রিস্টান ধর্ম

৩। 'ওয়ানগালা' কী?

ক) ত্রিপুরাদের প্রধান উৎসব খ) মন্দিরের নাম
গ) বর্ষবরণ উৎসব ঘ) গারোদের প্রধান পূজা

পাঠ-৪.৮ সাঁওতাল
Santal

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন;
- সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জীবনযাপন পদ্ধতি আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সাঁওতাল, সমতল, বরেন্দ্র অঞ্চল, কৃষিজীবী, পিতৃতান্ত্রিক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী।

বাংলাদেশের অন্যতম ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নাম সাঁওতাল। সাঁওতাল নামকরণের বিষয়ে সর্বসম্মত কোনো তথ্য নেই। প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, "সাঁওতাল" নামটি মূলত "সাড়/সাঁতাল/সান্তাল" শব্দ থেকে এসেছে। সময়ের সাথে ধ্বনিগত পরিবর্তনে "সাঁওতাল" রূপটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সাঁওতালরা বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করতো। উনিশ শতকের ত্রিশের দশকে তারা ভারতের ভাগলপুর ও রাজমহলের মধ্যবর্তী এলাকা "দামিন-ই-কো" নামক বনভূমিতে বসতি স্থাপন করে। সাঁওতাল ভাষায় Damin-i-koh অর্থ হচ্ছে পাহাড়ের পাদদেশের ভূমি। ১৮৫৫-৫৬ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার ভারতের বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যে তাদের জন্য স্থায়ী পরগণার বন্দোবস্ত করে দেয় (Santhal Parganas Act or Act XXVII 1855)। সাঁওতালরা ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম অধিবাসী।

নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ও আবাস: নৃতাত্ত্বিকদের ধারণা, সাঁওতালরা আদি অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীভুক্ত। এদের চেহারা কালো, নাক চ্যাপ্টা, ঠোঁট মোটা, চুল কোঁকড়ানো এবং দেহের উচ্চতা মাঝারি ধরনের। এজন্য এদেরকে প্রাক-দ্রাবিড়ীয় বলেও মনে করা হয়। সাঁওতালরা ১২টি গোত্রে বিভক্ত। তার প্রথম সাতটি পিলচু হড়ম ও পিলচু বুড়ির সাত জোড়া সন্তান থেকে উৎপন্ন এবং অবশিষ্ট পাচটি গোত্র পরবর্তীকালে উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়। উইলিয়াম হান্টারের মতে, অবশিষ্ট ৫টি গোত্র সংকর বর্ণের। অর্থাৎ আর্য পিতা ও সাঁওতাল মাতা থেকে এদের উৎপত্তি হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় দুই লক্ষের বেশি সাঁওতাল বসবাস করেন। এদের মূল আবাসস্থল রাজশাহীর বরেন্দ্র অঞ্চল। অর্থাৎ রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জে অধিকাংশ সাঁওতাল নৃগোষ্ঠীর বসবাস। বগুড়া, রংপুর, পাবনা, ময়মনসিংহ এবং বৃহত্তর সিলেট জেলায়ও সাঁওতালদের বসবাস রয়েছে। সিলেট অঞ্চলের চা-বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের একটি অংশ সাঁওতাল নৃগোষ্ঠীর অন্তর্গত বলে মনে করা হয়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চল থেকে বাংলাদেশে বনজঙ্গলের পতিত জমিতে সাঁওতালরা বসবাস শুরু করে। পরে পতিত জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষাবাদ আরম্ভ করে।

ভাষা, ধর্ম, পরিবার ও বিবাহ: সাঁওতালদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। এ ভাষা দুটি উপভাষায় বিভক্ত, ক) কারমেলি ও খ) মাহলেস। ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে, সাঁওতাল ভাষা মুন্ডারী ভাষার উপভাষা। আবার নৃবিজ্ঞানী হডসন মনে করেন, কোল ভাষার উপভাষা হচ্ছে সাঁওতাল ভাষা। বাঙালিদের প্রভাবে তারা মাতৃভাষার সাথে বাংলাভাষাও গ্রহণ করেছে। সময়ের পরম্পরায় সাঁওতাল ভাষার সাথে হিন্দি, মারাঠী, তেলুগু তামিল ইত্যাদি ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে।

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ প্রধানত হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী। সনাতন ধর্মে বিশ্বাসীরা হিন্দুধর্মের রীতিনীতি ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। অন্যরা খ্রিস্টান ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। সাঁওতালদের প্রধান গ্রামদেবতার নাম 'মারাংবুরো'। এই দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য তাঁর উদ্দেশ্যে সাদা মোরগ ও সাদা ছাগল উৎসর্গ করা হয়।

সাঁওতালদের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত। পিতাই পরিবারের প্রধান। সাঁওতালদের মধ্যে বর্তমানে একক বা অনুপরিবার লক্ষ করা যায়। সাঁওতালদের মধ্যে পিতার সম্পত্তিতে পুত্রের সমান অধিকার থাকে। কিন্তু পিতার সম্পত্তিতে কন্যাসন্তানের কোনো অধিকার নেই। সাঁওতালদের মধ্যে একক বিবাহ প্রচলিত। তবে স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। সাধারণত ছেলেরা ১৯/২০ এবং মেয়েরা ১৫/১৬ বছর বয়সে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ (তালাক) এবং একাধিক বিবাহ প্রচলিত আছে।

খাদ্য, অর্থনীতি, পোশাক ও সমাজ পরিবর্তন: ভাত সাঁওতালদের প্রধান খাদ্য। ভাতের সাথে ডাল এবং শাক-সবজি তারা খায়। তাছাড়া শূকর, মুরগি, ইঁদুর, কাঠবিড়ালী, গুঁইসাপ, পাখি, লাল পিঁপড়া ইত্যাদি তাদের পছন্দের খাবার। উৎসব-অনুষ্ঠান এবং নৃত্যের সময় তারা চাউল থেকে তৈরি 'হাড়িয়া' নামক মদ পান করে।

সাঁওতাল অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। ভূমিহীন হওয়ার কারণে ৯০ শতাংশ সাঁওতাল কৃষিশ্রমিক হিসাবে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করে। মহিলা-পুরুষ উভয়ই মাঠে কাজ করে। কৃষি ছাড়াও জেলে, কুলি, দিনমজুর, চা-শ্রমিক, রিকশা-ভ্যানচালক প্রভৃতি কাজে সাঁওতাল নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায়।

সাঁওতাল মেয়েরা সাধারণত কাঁধের উপর জড়িয়ে শাড়ি পরে। তবে ঘোমটা দেয় না। মেয়েরা হাতে রাং, লোহা কিংবা শাঁখের বালা পরে। পুরুষেরা লুঙ্গি পরে। কোনো কোনো পুরুষ গলায় মালা ও হাতে বালা ব্যবহার করে। পুরুষ ও বালকদের ধুতি পরতে দেখা যায়।

সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষিতের হার খুব কম। ইদানিং তারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। কোনো কোনো সাঁওতাল এলাকায় তাদের নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কারণে সাঁওতাল সমাজে পরিবর্তন এসেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো লিপিবদ্ধ করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন অধিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হচ্ছে সাঁওতাল। সমতলের এ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী প্রধানত বরেন্দ্র অঞ্চলে বসবাস করে। তাদের মূলত কৃষিজীবী। তবে ভূমিহীন হওয়ায় অধিকাংশ সাঁওতাল কৃষিশ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। নিজস্ব ভাষা থাকলেও তাদের মধ্যে শিক্ষার হার খুবই কম। তবে পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় তারাও ক্রমশ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সাঁওতালরা কয়টি গোত্রে বিভক্ত?

ক) ১০টি
খ) ১২টি
গ) ১৫টি
ঘ) ১৮টি

২। ' কারমেলি' ও ' মাহলেস' কী?

ক) সাঁওতাল ভাষার দু'টি উপভাষা
খ) সাঁওতালদের ধর্ম
গ) সাঁওতালদের গোত্র
ঘ) সাঁওতালদের উৎসব

৩। 'মারাংবুরো' কী?

ক) সাঁওতালদের বর্ষবরণ
খ) সাঁওতালদের মন্দিরের নাম
গ) সাঁওতালদের বিবাহপ্রথা
ঘ) সাঁওতালদের প্রধান গ্রামদেবতা

পাঠ-৪.৯ মণিপুরি ও রাখাইন
Manipuri and Rakhine

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- মণিপুরি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- রাখাইন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মণিপুরি, রাখাইন, সমতল, সিলেট, পটুয়াখালী, কক্সবাজার, আরাকট, মণিপুর।

বাংলাদেশের সমতল অঞ্চলের অন্যতম প্রধান দু'টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হচ্ছে মণিপুরি এবং রাখাইন। উভয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এ ভূখণ্ডে বাহিরাগত। মণিপুরিরা ভারতের আসাম সংলগ্ন মনিপুর অঞ্চল এবং রাখাইনরা মায়ানমারের আরাকান অঞ্চল থেকে বাংলাদেশে প্রবশে করেছিল। স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ধারণ করে বর্তমানে তারা বাংলাদেশের অধিবাসী।

মণিপুরি সম্প্রদায়ের নৃতাত্ত্বিক ও জাতিগত পরিচয়: সাধারণত মণিপুর রাজ্যের অধিবাসীদেরকে 'মণিপুরি' বলা হয়। ভারতের আসাম সংলগ্ন 'মণিপুর' রাজ্য থেকে উদ্বাস্তু হয়ে ১৭৫৬, ১৭৫৮ এবং ১৮৯১ সালে মণিপুরি সম্প্রদায়ের লোকেরা বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। লোককথায় প্রচলিত আছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে মণিপুর রাজ্যের এক রাজপুত্র মণিপুর থেকে পালিয়ে সফরসঙ্গীসহ সিলেটে চলে আসেন। ধারণা করা হয় যে, এরাই হচ্ছে বাংলাদেশের বর্তমান মণিপুরিদের পূর্বপুরুষ।

মণিপুরিরা কোনো নরগোষ্ঠীর অন্তর্গত তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা মুশকিল। তবে দেহের গঠন ও মুখমন্ডলের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এদের সাথে চীনা ও বার্মিজদের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। তাই এদেরকে আদি-মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়। ধারণা করা হয় যে, মণিপুরিরা ভারতের আসামরাজ্যের কুকি জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত। তাদের পূর্বপুরুষের নাম 'পাখাংবা'। প্রবাদ আছে যে, পাখাংবা একজন সর্পপুরুষ ছিলেন। অরণ্যে গর্তের ভিতর থেকে একজন সুপুরুষ যুবক হিসাবে তিনি বেরিয়ে আসেন। জনপথে হাঁটার সময় জুমচাষরত এক অপূর্ব সুন্দরী রমণীকে দেখে মুগ্ধ হন এবং তাকে বিয়ে করে সংসারজীবন শুরু করেন। এই দম্পতি থেকে মণিপুরি জাতিগোষ্ঠীর উৎপত্তি বলে মনে করা হয়।

ভাষা, ধর্ম ও আবাস: মণিপুরিদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। মণিপুরি ভাষার দু'টি উপবিভাগের একটি হচ্ছে বিষ্ণুপ্রিয়া, অপরটি হচ্ছে মৈতৈ ভাষা। বিষ্ণুপ্রিয়ার সাথে অহমিয়া, উড়িয়া বাংলা ভাষার সাদৃশ্য রয়েছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার নিজস্ব বর্ণলিপি আছে। তবে উৎপত্তিগত দিক থেকে এটি মাগধি-প্রাকৃত থেকে আগত। মৈতৈ মণিপুরিদের ব্রহ্মীয় ভাষার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারো কারো মতে, মণিপুরিদের ভাষার সাথে কুকীদের ভাষার সাদৃশ্য রয়েছে।

মণিপুরিরা হিন্দু ধর্মের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়ে তারা পূজা করে থাকে। সাধারণত তাদের মন্দিরে শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ, শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেব এবং শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গের মূর্তি দেখা যায়।

বাংলাদেশের মণিপুরি সম্প্রদায় সিলেটের তামাবিল, মৌলভীবাজারের ভানুগাছ এবং হবিগঞ্জের আসামপাড়া এলাকায় বসবাস করে। এছাড়া ঢাকার তেজগাঁও এলাকায় কিছুসংখ্যক মণিপুরি বাস করে।

বিবাহ, পরিবার ও অর্থনীতি: মণিপুরিদের মধ্যে বর্হিগোত্র বিবাহ প্রচলিত আছে। একই গোত্রের মধ্যে বিয়ে এখানে নিষিদ্ধ। তাদের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রচলন নেই। তবে তালাক ও বিধবা বিবাহের প্রচলন রয়েছে। মণিপুরিদের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক এবং পিতৃসূত্রীয় পরিবার ব্যবস্থা প্রচলিত। ছেলেরা পিতার সম্পত্তিতে সমান ভাগ পেলেও মেয়েদের কোনো অধিকার নেই। তবে পিতা ইচ্ছা করলে তার মেয়েকে সম্পত্তি দান করতে পারেন। কোনো দম্পতির পুত্রসন্তান না থাকলে মেয়ে পিতার সম্পত্তির পূর্ণ উত্তরাধিকারী বলে গণ্য হয়। এদের মধ্যে একক বা অনুপরিবার বেশি পরিলক্ষিত হয়।

মণিপুরিরা কৃষির ওপর নির্ভরশীল। নারী-পুরুষ উভয়ই কৃষিক্ষেতে কাজ করে। পাহাড়ি এলাকার মণিপুরিরা জুম পদ্ধতিতে এবং সমতলবাসীরা হালচাষ করে। নারী-পুরুষ সবাই কৃষিকাজে দক্ষ। কৃষিকাজ ছাড়াও তারা কাপড় বোনা ও তাঁত পরিচালনায় পারদর্শী। তারা নিজেদের পোশাক নিজেরাই তৈরি করে। পুরুষরা সাধারণত ধুতি এবং মেয়েরা বুক আবৃত করে লুঙ্গি পরিধান করে থাকে। ব্যবসা, দোকান পরিচালনা, চাকরি প্রভৃতি কাজেও মণিপুরি ছেলেমেয়েরা সম্পৃক্ত হয়।

জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও সংস্কৃতি: মণিপুরি নৃগোষ্ঠী বিভিন্ন জ্ঞাতিগোষ্ঠীতে বিভক্ত। এর মধ্যে প্রধান দু'টি জ্ঞাতিগোষ্ঠী হচ্ছে ভাষার ভিত্তিতে। একটি বিষ্ণুপ্রিয়া, অপরটি মৈথৈ। এছাড়াও মৈরাং, লুয়াং, অমংগোম, ক্ষুমল, নিংথৌজা, খরা, নংবা ইত্যাদি জ্ঞাতিগোষ্ঠী পরিলক্ষিত হয়। মণিপুরীদের লোকসংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ। বিশেষ করে মণিপুরি নৃত্য ও সংগীত জাতীয়ভাবে সমাদৃত। মণিপুরিদের প্রধান খাদ্য ভাত। তা ছাড়া মাছ ও শাক-সবজি তাদের খাদ্য তালিকায় থাকে। মণিপুরিরা নিজেদের পোশাক নিজেরা তৈরি করে। বাঙালি সমাজের প্রভাবে মণিপুরি মেয়েরা তাদের ঐতিহ্যবাহী লুঙ্গির পরিবর্তে কেউ কেউ শাড়ি পরছে। তাদের আচার-আচরণ ও রীতিনীতিতে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে এবং এ সমাজে সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	মণিপুরি সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো লিপিবদ্ধ করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

রাখাইন

সমতলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে রাখাইন অন্যতম। তবে পাহাড়ের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মারমাদের সাথে ভাষা নৃতাত্ত্বি সাদৃশ্য রয়েছে। মারমারা যেমন 'মগ' নামে পরিচিত, তেমনি রাখাইনরাও। প্রাচীনকালে এরা 'মগধ' রাজ্যে বসবাস করত বলে ইতিহাসে এরা 'মগ' নামে পরিচিতি লাভ করে। রাখাইন শব্দের উৎপত্তি পালি ভাষা থেকে। এ ভাষায় 'রাখাইন' শব্দের অর্থ হল রক্ষণশীল অর্থাৎ যারা নিজেদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, পরিচয় ইত্যাদিকে সংরক্ষণ করতে সচেষ্ট থাকে। সম্প্রদায়গত দিক থেকে থেকে রাখাইনরা অনেকটা রক্ষণশীল। রাখাইনরা নিজেদেরকে 'রাক্ষাইন' এবং তাদের বাসভূমিকে 'রাক্ষাইন পি' (রাখাইন ভূমি) নামে অভিহিত করে। এর ভাবার্থ হচ্ছে, তারা তাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ভূমি সংরক্ষণের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ভাষা ও আবাস: রাখাইনদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনেক প্রাচীন এবং সমৃদ্ধ। তারা 'মগধ' রাজ্য থেকে মায়ানমারের আরাকান রাজ্যে বসবাস শুরু করে। ১৭৮৪ সালে বার্মিজ রাজা 'বোদোপ্রা' আরাকান রাজ্য জয় করলে বিপুলসংখ্যক রাখাইন সেখান থেকে পালিয়ে বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলা পটুয়াখালী এবং কক্সবাজারে আশ্রয় নেয়। রাখাইনরা মঙ্গোলীয়দের ভোটবার্মি (Bhotbormi) সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। রাখাইনদের মুখমণ্ডল গোলাকার, নাক বোঁচা, চুলকালো এবং দেহের রং হালকা বাদামি ও উচ্চতায় খাটো।

রাখাইনদের ভাষা ভোটবার্মি দলের ভাষার অন্তর্ভুক্ত। উত্তর ভারতের আদি ব্রাহ্মীলিপি থেকে রাখাইন বর্ণমালার উৎপত্তি। রাখাইনরা কয়েক হাজার বছর আগে মগধে মৌখিকভাবে এই ভাষার উৎপত্তি ঘটায় বলে ধারণা করা হয়। প্রায় ছয় হাজার বছর আগে পাথরে খোদাই করা শিলালিপিতে রাখাইন বর্ণমালা পাওয়া যায়। এটি প্রথম রাখাইন বর্ণমালার উদ্ভবের দলিল। বাংলাদেশের রাখাইনরা বাংলা ভাষায়ও পারদর্শী।

বাংলাদেশের কক্সবাজার, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় তাদের বসবাস। পটুয়াখালির কুয়াকাটা ও খেপুপাড়ায় রাখাইনদের বসতি রয়েছে।। কক্সবাজারের রামু, পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান, মানিকছড়ি, টেকনাফ ও চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলাতেও রাখাইনদের বসতি লক্ষ করা যায়।

অর্থনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতি: রাখাইনদের প্রধান পেশা কৃষি ও মৎস্য শিকার। এছাড়া তারা ব্যবসা-বাণিজ্য, তাঁত বুনন, নৌকা নির্মাণ ও অন্যান্য কারিগরি পেশার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। হস্তচালিত তাঁত থেকে কাপড় বোনার কাজে রাখাইনরা দক্ষ। রাখাইনরা লবণ এবং গুড় তৈরি করে। কৃষিকাজে রাখাইন নারী-পুরুষ উভয়েই অংশ গ্রহণ করে। রাখাইন নারীরা পোল্ট্রি ও গৃহপালিত পশু পালনও করে থাকে।

রাখাইনরা বৌদ্ধ ধর্মালম্বী। ধর্মীয় এবং ভাষাগত জ্ঞানের জন্য বৌদ্ধ মন্দিরে যায়। বৌদ্ধ পাঠশালা বা খ্যাং (khyang/ Monastery) এ রাখাইন শিশুদের শিক্ষা জীবন শুরু হয়। বৌদ্ধ ধর্মের পাশাপাশি রাখাইনরা যাদুবিদ্যা, অতিপ্রাকৃতিক শক্তি এবং নানাবিধ কুসংস্কারে বিশ্বাসী। তারা ধর্মীয় বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব উদযাপন করে থাকে। গৌতম বুদ্ধের জন্মবার্ষিকী ও প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপন রাখাইন অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ।

রাখাইন সমাজের রীতি অনুযায়ী বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান বা দিবসের শুরুতে তারা পিতা-মাতা, বয়স্ক ব্যক্তি এবং বুদ্ধের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে তারা বিভিন্ন নকশা করা পিঠা ও মিষ্টি জাউ-ভাত (Prorridge) পরিবেশন করে থাকে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বাইরে রাখাইনদের নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব রয়েছে। রাখাইনদের সবচেয়ে বড় উৎসবকে হচ্ছে জলকেলি উৎসব। এপ্রিল মাসে নববর্ষের প্রাক্কালে চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে তিন দিন ধরে এ উৎসব উদযাপন করা হয়। তারা বসন্ত উৎসবও পালন করে থাকে।

শিল্পকলা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাখাইনদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে। স্থাপত্যকলা, চারু ও কারুকলা, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, নাটক, সংগীত, নৃত্যকলা ইত্যাদিতে রাখাইন জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য সমৃদ্ধ। নদীর তীরবর্তী অঞ্চল ও সমুদ্র উপকূলের সমতল ভূমিতে রাখাইনরা বসবাস করে। নিচে খালি রেখে উঁচু ভিত বা মাচার উপর ঘর নির্মাণ করে তারা বসবাস করে। ঘর তৈরির উপকরণ হিসেবে তারা গোলপাতা, টিন প্রভৃতি ব্যবহার করে।

খাদ্য, পোশাক, পরিবার ও বিবাহ: রাখাইনরা সাধারণত ভাত, মাছ, ডাল এবং শাক সবজি খেয়ে থাকে। শূকর এবং শুটকি মাছ তাদের প্রিয় খাবার। রাখাইন পুরুষেরা সাধারণত লুঙ্গি ও ফতুয়া পরে থাকে। রাখাইনরা বিভিন্ন ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে মাথায় পাগড়ি পরে। রাখাইন নারীরা নকশাকৃত লুঙ্গি এবং ব্লাউজ পরিধান করে। রাখাইন নারীরা তাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের অলংকার এবং চুলে ফুল পরে থাকে।

বিবাহ রাখাইন সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সাধারণত অভিভাবকেরাই বিবাহ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকেন। তবে বর্তমানে প্রেমের বিয়েও এ সমাজে দেখা যায়। যৌতুক প্রথা রাখাইন সমাজে নিষিদ্ধ। রাখাইন পরিবার ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। পিতাই পরিবারের প্রধান। পরিবারে নারী-পুরুষ প্রত্যেকেরই সমান অধিকার রয়েছে। পুত্র এবং কন্যা উভয়েরই পৈতৃক সম্পত্তিতে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	রাখাইন সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো লিপিবদ্ধ করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে মণিপুরি এবং রাখাইন উভয়েই সমতলের অধিবাসী। তারা বর্তমান ভারত এবং এবং মায়ানমার থেকে আগত হলেও এখন এদেশের নাগরিক। তাদের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্যময় করেছে। পেশা, বিবাহ এবং পরিবার কাঠামোয় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। মণিপুরিরা বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে বসবাস করে। রাখাইনদের বসবাস প্রধানত পটুয়াখালী এবং কক্সবাজারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মণিপুরি ভাষার দু'টি উপবিভাগের নাম কী?

ক) বিষ্ণুপ্রিয়া ও মৈতৈ খ) বাংলা ও অহমিয়া
গ) উড়িয়া ও অহমিয়া ঘ) কোনোটি নয়

২। বাংলাদেশে মণিপুরিদের মূল বাসস্থান কোথায়?

ক) পটুয়াখালী খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম
গ) সিলেটে ঘ) রাজশাহী

৩। 'রাখাইন' শব্দের অর্থ কী?

ক) ঐতিহ্যবাহী খ) রক্ষণশীল গ) ঈশ্বরের সন্তান ঘ) সাগরপুত্র

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১। ডাকওয়ার্থ (Duckworth) কিসের ভিত্তিতে নরগোষ্ঠীর শ্রেণিবিভাগ করেছেন?
(ক) চুলের ভিত্তিতে (খ) মাথা, চোয়াল ও করোটিতত্ত্বের ভিত্তিতে
(গ) গায়ের রঙের ভিত্তিতে (ঘ) কোনোটিই নয়

২। জাতিগতভাবে বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় কী?
(ক) কৃষ্ণকায় (খ) অস্ট্রেলীয়
(গ) দ্রাবিড়ীয় (ঘ) সংকর জাতি

৩। চাকমা সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের মূলে রয়েছে–
(i) কেন্দ্রীয় শাসনের প্রভাব
(ii) আধুনিক শিক্ষা
(iii) মুদ্রা ও বাজার অর্থনীতি
সঠিক উত্তর কোনটি?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
এ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বোমাং সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত। এদের সমাজের প্রধান হলেন বোমাং চিফ বা বোমাং রাজা। এদের ভাষায় এ গ্রামকে বলা হয় 'রোয়া'। গ্রামবাসী দ্বারা গ্রামের প্রধান মনোনীত হয়, যাকে 'রোয়াজা' বলা হয়।

৪। উদ্দীপকে কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে?
(ক) চাকমা (খ) মারমা
(গ) গারো (ঘ) ত্রিপুরা

৫। কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বান্দরবান জেলায় বেশি বসবাস করে?
(ক) মারমা (খ) চাকমা
(গ) গারো (ঘ) ত্রিপুরা

খ) সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্নঃ

উদ্দীপকটি পড়ুন এব নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।
সংগীতা কলেজের বন্ধুদের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারে শিক্ষা সফরে গিয়েছিল। বাড়িতে ফিরে সে বাবা-মায়ের সাথে অনেক গল্প করলো। সে রাঙামাটিতে চাকমা, বান্দরবানে মারমা জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা এবং সংস্কৃতি দেখেছে। কক্সবাজারেও বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উপস্থিতি তাকে অভিভূত করেছে। বিশেষ করে বিভিন্ন দোকানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মেয়েরা পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করছে।

১) বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত? ১
২) পাহাড় এবং সমতলের দু'টি করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নাম লিখুন। ২
৩) উদ্দীপকের আলোকে মারমা জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা এবং সংস্কৃতি বর্ণনা করুন। ৩
৪) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি কীভাবে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে? ব্যাখ্যা করুন। ৪

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১	:	১। ঘ	২। ক			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২	:	১। খ	২। ক	৩। ঘ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩	:	১। গ	২। খ			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪	:	১। খ	২। গ	৩। গ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৫	:	১। ক	২। গ	৩। ঘ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৬	:	১। খ	২। ঘ			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৭	:	১। ক	২। গ	৩। ঘ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৮	:	১। খ	২। ক	৩। ঘ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৯	:	১। ক	২। গ	৩। খ		
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	:	১। খ	২। ঘ	৩। ঘ	৪। খ	৫। ক

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের আর্থ-সামাজিক পটভূমি
Socio-Economic Background of the Emergence of Bangladesh

ইউনিট ৫

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি যে বিজয় অর্জন করে তার প্রেক্ষাপট রচিত হয় মূলত ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই। প্রায় দুইশো বছরের ব্রিটিশ শাসনের পর ভারত এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনপদ হিসেবে পূর্ববাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দেশ বিভাগের মাধ্যমে পাওয়া এই স্বাধীনতাকে পূর্ববাংলার মানুষও স্বাগত জানায়। তবে স্বাধীনতা লাভের কিছুদিনের মধ্যেই তারা হতাশ হন। পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী প্রথম আক্রমণ করেন এ দেশের মানুষের ভাষার উপর। তারা উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি মানুষের ভাষাকে অবজ্ঞা করে অন্যায্য ঘোষণার প্রতিবাদে পূর্ববাংলার জনগণ সংক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। জীবনের বিনিময়ে এক পর্যায়ে শাসকগোষ্ঠী বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। মূলত ভাষা আন্দোলনের সূত্র ধরেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি, শোষণ, লুণ্ঠনও ক্রমশ বাঙালির স্বাধীকারের দাবিকে জোরালো করে তোলে। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা দাবি, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হয়। জাতীয়তাবাদী চেতনায় গোটা জাতি দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়। এই চেতনায় উজ্জীবিত হয়েই পূর্ব বাংলার জনগণ ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

	ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৫.১ : ভাষা আন্দোলন
পাঠ- ৫.২ : পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য
পাঠ- ৫.৩ : বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ

পাঠ-৫.১ ভাষা আন্দোলন

Language Movement

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- ভাষা আন্দোলনের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ভাষা আন্দোলন, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সাল, রাষ্ট্রভাষা।

ভাষা আন্দোলনের পটভূমি

ভারতবর্ষের জনগণের প্রবল প্রতিরোধের মুখে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটে। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পর তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রথম আঘাত হানে বাঙালির ভাষার উপর। পূর্ব পাকিস্তানের ৯৫ শতাংশ এবং গোটা পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। অথচ পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েক মাস পূর্বে ১৯৪৭ সালের মে মাসে মুসলিম লীগ নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের জাতীয় বা একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের অনেকে তখন থেকেই উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে যুক্তি ও মতামত তুলে ধরেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর শাসক গোষ্ঠী উর্দু এবং ইংরেজিকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। মুদ্রা, ডাকটিকিট, মানি-অর্ডার ফরম, রেলের টিকেট প্রভৃতিতে কেবল ইংরেজি ও উর্দুর ব্যবহার হতে দেখা যায়। পাকিস্তান গণ-পরিষদের সরকারি ভাষা হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে শুধু ইংরেজি ও উর্দুকে নির্বাচন করা হয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল কাসেম প্রমুখ বাংলার পক্ষে সোচ্চার হন। ১৯৪৭ সালের ০৬ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস বিল্ডিং প্রাঙ্গনে অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকসহ অনেক শিক্ষার্থী যোগদান করেন।

ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্ব

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। এ অধিবেশনে কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু এবং ইংরেজির সাথে বাংলাকেও গণ-পরিষদের সরকারি ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি উত্থাপন করেন। মুসলিম লীগ সদস্যদের বিরোধিতার মুখে তা বাতিল হয়ে যায়। গণ-পরিষদের এই খবর ঢাকায় পৌঁছালে ছাত্র-সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এর প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে এক সভা অনুষ্টিত হয়। এ সভা থেকে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। শামসুল আলমকে এ পরিষদের আহ্বায়ক করা হয়। সংগ্রাম পরিষদ ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ সমগ্র পূর্ব বাংলায় ধর্মঘট পালনের ডাক দেয়। ১১ মার্চ ধর্মঘট পালনকালে ছাত্র–জনতার উপর পুলিশ হামলা চালায়। মিছিল থেকে শামসুল হক, শেখ মুজিবর রহমান, শওকত আলী, অলি আহাদ, কাজী গোলাম মাহবুবসহ অনেককে গ্রেফতার করা হয়।

এ আন্দোলন ক্রমশ সারা পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনের মুখে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন ১৫ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ও উর্দুর সমমর্যাদা প্রদানসহ বিভিন্ন দাবি মেনে নিয়ে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তিদানের ঘোষণা দেন। এ বিষয়ে তিনি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে একটি চুক্তিও স্বাক্ষর করেন। তবে খাজা নাজিমউদ্দীনের এই ঘোষণা ছিল একটি কূটকৌশল। পাকিস্তানের গর্ভনর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রথম পূর্ব পাকিস্তান সফরকে নির্বিঘ্ন করতেই এই চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন।

২১ মার্চ, ১৯৪৮ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসভায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন, 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। ২৪ মার্চ, ১৯৪৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে বিশেষ সমাবর্তনেও তিনি একই ঘোষণা প্রদান করেন। উপস্থিত শিক্ষার্থীরা তাৎক্ষণিকভাবে 'নো, নো' ধ্বনিতে এ ঘোষণার প্রতিবাদ জানান। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্ররা ধর্মঘট পালন করেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের মধ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি। ঢাকা ত্যাগের পূর্বে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সংগ্রাম পরিষদের স্বাক্ষরিত চুক্তি বাতিল করেন। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান আরবি অক্ষরে বাংলা লেখা এবং পূর্ব

পাকিস্তানে উর্দু শিক্ষা বিস্তারের প্রস্তাব করেন। ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে এর তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়।

ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ স্মরণে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ১১ মার্চ 'প্রতিবাদ দিবস' পালন করা হতো। ১৯৫০ সালের প্রতিবাদ দিবস পালন উপলক্ষে আব্দুল মতিনকে আহ্বায়ক করে 'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা হয়। ১৯৫১ সাল জুড়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সভা-সমাবেশ, ইশতেহার ছাপানো, বিতরণ, প্রচারণা, স্মারকলিপি প্রদান ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পালিত হয়। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি পল্টন ময়দানের এক জনসভায় পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দীনও জিন্নাহর মতো ঘোষণা করেন, "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোনো ভাষা নয়"। তাঁর এ ঘোষণার প্রতিবাদে আবার সংগ্রাম শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ৩০ জানুয়ারি ১৯৫২ সালে দেশব্যাপী ধর্মঘট আহবান করা হয়। এ ধর্মঘটের প্রতি সর্বস্তরের জনগণ স্বঃতস্ফূর্ত সমর্থন জানান। ধর্মঘটে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরাও অংশগ্রহণ করে। সবাই সমস্বরে আওয়াজ তোলে "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই"।

৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রসভা থেকে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ২১ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে প্রতিবাদ দিবস পালনের ডাক দেওয়া হয়। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এ কর্মসূচিতে সমর্থন ব্যক্ত করে। প্রতিবাদ কর্মসূচির আওতায় বিক্ষোভ মিছিল, প্রতিবাদ সমাবেশ, ঢাকায় পরিষদ ভবন ঘেরাও ইত্যাদি ঘোষিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারিকে সামনে রেখে ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকাসহ সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারির প্রস্তুতি দেখে সরকার বিচলিত বোধ করে। মুসলীম লীগ সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে টানা এক মাসের জন্য ঢাকায় হরতাল, সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করে। ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার বিষয়ে ঐকমত্য না হওয়ায় ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে গাজীউল হকের সভাপতিত্বে আবার সভা অনুষ্ঠিত হয়। আব্দুল মতিনের প্রস্তাবে সভার অধিকাংশ শিক্ষার্থীর সমর্থনে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আব্দুস সামাদের প্রস্তাবে ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে ১০ জন করে মিছিল নিয়ে পরিষদ ভবনের (বর্তমান জগন্নাথ হল) দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'-এ স্লোগান দিতে দিতে প্রথম দলটি গেটের বাইরে আসামাত্র পুলিশ এসে তাদেরকে টেনে-হিচড়ে ট্রাকের উপর তুলে নেয়। ট্রাকের উপর থেকেও তারা স্লোগান দেন, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। এতে উদ্দীপ্ত হয়ে বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী রাস্তায় নেমে আসে। পুলিশের বেধড়ক লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস উপেক্ষা করে হাজার হাজার ছাত্রজনতা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিতে থাকে। মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে চারদিকে পুলিশের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়। পুলিশ ও ছাত্র-জনতা উভয়ের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। মেডিকেল কলেজ হোস্টেল এলাকায় ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ইট পাটকেল ছোঁড়াছুড়ি হয়। এভাবে ছাত্র–পুলিশ সংঘর্ষ চলাকালে বেলা প্রায় ৩টার দিকে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। এক পর্যায়ে পুলিশ ছাত্র-জনতার উপর গুলি বর্ষণ করে। পুলিশের গুলিতে প্রথম শহিদ হন মানিকগঞ্জের ছাত্র রফিকউদ্দিন আহমদ। অতঃপর গফরগাঁওয়ের আবদুল জব্বার। অছাত্র এই যুবক গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে মৃত্যুবরণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকতও গুলিতে আহত হয়ে অপারেশন থিয়েটারে মৃত্যুবরণ করেন। সেদিন আরো শহিদ হন সচিবালয়ের আব্দুস সালাম।

আব্দুস সালাম আবুল বরকত রফিক উদ্দিন আহমদ শফিউর রহমান আব্দুল জব্বার

ভাষা আন্দোলনের শহিদগণ

২১ ফেব্রুয়ারি মোট ৬ জন তরুণের শহিদ হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। তবে পুলিশের নির্বিচার গুলিতে আহত হয়েছিলেন অনেকে। গুলিবর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের খবর দ্রুতই চারদিকে এমনকি ঢাকা বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকার বিভিন্ন মহল্লা হতে দলে দলে মানুষ বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালে জমায়েত হন। ২১ ফেব্রুয়ারি রাতে মেডিকেল কলেজের ছাত্র গোলাম মাওলাকে আহ্বায়ক করে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' পুনর্গঠন করা হয়। পরদিন সকালে মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে গায়েবানা জানাজা, শোকসভা এবং প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে ছাত্র আন্দোলন ক্রমশ গণআন্দোলনে পরিণত হয়। ভাষা আন্দোলনের এ তীব্রতায় সরকার বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার বিষয়ে নমনীয় হয়। ১৯৫৪ সালের ৭ মে গণপরিষদে এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব পাস হয়। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ভাষা আন্দোলনের প্রভাব

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনের বহুমাত্রিক প্রভাব রয়েছে। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছে। পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে ঐক্য, সংহতি তৈরিতে যেমন ভাষা আন্দোলনের প্রভাব ছিল, তেমনি অন্যয়ের বিরুদ্ধে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও এই আন্দোলন ছিল গুরুত্বপূর্ণ এক মাইলফলক। এখানে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

০১) **জাতীয়তাবাদের উত্থান:** ভাষা আন্দোলনের ফলে পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদ নতুন গতি ও মাত্রা লাভ করে। এ কারণে অনেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ভাষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ বলে উল্লেখ করেন।

০২) **স্বাধীনতার পথ সুগম করে:** ভাষা আন্দোলনের সাফল্যের পথ ধরেই স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ বিকশিত হয়। ৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভাষা আন্দোলনের ঐক্য এবং সাফল্য প্রভাব বিস্তার করেছিল।

০৩) **সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি:** ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে ছাত্র-জনতা, শ্রমজীবী-পেশাজীবী সবার মধ্যে ভাষাভিত্তিক ঐক্য তৈরি হয় এবং সবাই এক কাতারে চলে আসেন। পূর্ব বাংলার স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও দূরত্ব হ্রাস পায় এবং মুসলিম লীগ তথা পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী জোট শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

০৪) **বাংলা ও বাঙালির মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়:** রক্ষক্ষয়ী ভাষা আন্দোলনের বিজয় বাংলা ভাষা ও বাঙালি জনগোষ্ঠীর মর্যাদা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছিল। বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি লাভ করায় পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

০৫) **শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ:** ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে ভাষা দাবি অর্জিত হওয়ায় পত্র-পত্রিকা, শিল্প-সাহিত্য, কবিতা-গান, নাটক-উপন্যাস নানা ধারায় নতুন প্রেরণায় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে থাকে। এর মাধ্যমেও মানুষ জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত হতে থাকে।

০৬) **শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবর্তন:** অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভের পর বাংলায় শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার ঘটে। বাংলায় বই-পুস্তক রচনা, কর্মসংস্থানে বাংলা শিক্ষার স্বীকৃতি, নতুন চেতনা ও উদ্দীপনায় বাংলায় লেখাপড়ার প্রসার ঘটে।

০৭) **আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি:** ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ করার ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে খুব বেশি নেই। সে দিক থেকে বাংলাদেশের মানুষ ভাষার জন্য গৌরব বোধ করতে পারেন। ইউনেস্কো কর্তৃক ১৯৯৯ সালে ২১ ফেব্রুয়ারিকে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" ঘোষণার মধ্য দিয়েও বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে পরিচিতি, সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	ভাষা আন্দোলনের প্রভাবসমূহ চিহ্নিত করুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে যে সবচেয়ে প্রথম প্রভাব ফেলে সেটি হলো ভাষা আন্দোলন। এই আন্দোলন জাতীয়তাবাদ বিকাশের ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ, আন্দোলন-সংগ্রাম ইত্যাদি বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয়, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা কর্মসূচি, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ এবং অবশেষে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনেও ভাষাভিত্তিক ঐক্য ও চেতনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কত সালে পাকিস্তান গণ-পরিষদে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপন করেছিলেন?

(ক) ১৯৪৮ সালে (খ) ১৯৫১ সালে

(গ) ১৯৫২ সালে (ঘ) ১৯৫৪ সালে।

২। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি কার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়?

(ক) আব্দুল মতিন (খ) আবুল হাশিম

(গ) গাজিউল হক (ঘ) আবুল কাশেম

৩। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মোট কত জন তরুণ শহিদ হয়েছিলেন?

(ক) ৩ জন (খ) ৬ জন

(গ) ৯ জন (ঘ) ১১ জন

পাঠ-৫.২ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য
Socio-economic Discrimination Between East and West Pakistan

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সরকারি চাকরির বৈষম্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান, বৈষম্য, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সরকারি চাকরি।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তান নামে পৃথক দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ভৌগোলিক গঠনগত দিক পাকিস্তান রাষ্ট্রটি ছিল অস্বাভাবিক। পাকিস্তানের পৃথক দু'টি অংশের একটি পূর্ব পাকিস্তান, অপরটি পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দূরত্ব ছিল প্রায় ১০০০ মাইল (১৬০০ কিলোমিটার)। মাঝখানে বিশাল দেশ ভারত। ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে দুই পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ব্যবধানও ছিল অনেক বেশি। শাসকগোষ্ঠীর ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি এ ব্যবধানকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। বর্তমান পাঠে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সরকারি চাকরিতে সৃষ্ট বৈষম্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

(০১) **সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য:** ভৌগোলিক দূরত্বের কারণেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিস্তর অমিল ছিল। ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যভ্যাস, রীতিনীতি, মূল্যবোধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পার্থক্যের সূত্র ধরেই পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি তাচ্ছিল্যপূর্ণ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতো। ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলার মোট জনসংখ্যার প্রায় ২২ শতাংশ ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী (পর্যায়ক্রমে এ সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে)। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে তারা "হিন্দুয়ানি সংস্কৃতি" বিবেচনা করতো। এদেশের মুসলমানদেরকেও তারা "হিন্দু ভাবাপন্ন" বলে মনে করতো। তাদের বিবেচনায় পূর্ব বাংলার মুসলমানেরা উন্নত বা "খাঁটি মুসলমান" নয়। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানিরা কখনো এদেশের সাধারণ জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা পূর্ব বাংলার মানুষকে অপমান ও অসম্মান করতো এবং বিভিন্ন বৈষম্যমূলক নীতি চাপিয়ে দিত। এর প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে রাষ্ট্রভাষার ক্ষেত্রে। সমগ্র পাকিস্তানের শতকরা প্রায় ৫৬ ভাগ মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। অথচ তারা বাংলাকে বাদ দিয়ে মাত্র ০৮ শতাংশ মানুষের ভাষা উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেয়। মাতৃভাষার উপর আঘাতের মাধ্যমে তারা এদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে দুর্বল করে দিয়ে শোষণ-বৈষম্যকে পাকাপোক্ত করতে চেয়েছিল। এ ছাড়া আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব, শিক্ষার্থীদের উর্দু শেখা বাধ্যতামূলক করা এবং শিক্ষার মাধ্যমে হিসেবে উর্দুকে অগ্রাধিকার প্রদান করাও ছিল বাংলা ভাষা ও বাঙালি জনগোষ্ঠীকে দুর্বল করে দেওয়ার অপচেষ্টা। পহেলা বৈশাখ পালনে নিষেধাজ্ঞা, অমুসলিম আখ্যা দিয়ে রেডিও-টিভিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং পাঠ্যপুস্তকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য নিষিদ্ধ করা হয়। এরূপ আরো নানা কায়দায় পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের উপর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য ও নিপীড়ন চালিয়েছিল।

(০২) **রাজনৈতিক বৈষম্য:** পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে সব সময় উদাসীন ছিল। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয় লাভ করে সরকার গঠন করলেও মাত্র ৫৬ দিনের মাথায় ভেঙ্গে দেওয়া হয়। পূর্ব বাংলার জনগণের অধিকারের কথা বলার জন্য এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমানসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দকে বার বার জেল-জুলুমের শিকার হতে হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে নানা টালবাহানা শুরু করে। রাজনৈতিক প্রতিশোধ নিতে তারা পূর্ব বাংলার নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের উপর নির্বিচার গণহত্যা চালায়। পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় কোনো বাঙালির অধিষ্ঠানকে তারা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারতো না। ২৩ বছরের শাসনকালে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীসহ শীর্ষ রাজনৈতিক পদের অধিকাংশ ব্যক্তি ছিলেন পশ্চিম পাকস্তিানের এবং উর্দুভাষী।

(০৩) **অর্থনৈতিক বৈষম্য:** পাকিস্তানের মুদ্রা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতো কেন্দ্রীয় সরকার। দেশের সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। পাট, চা, চামড়াজাত দ্রব্য সবকিছু রপ্তানি হতো করাচি বন্দর থেকে। বৈষম্যমূলক মুদ্রানীতির কারণে বাংলাদেশের পাট চাষী ও পাট ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্থ হতেন। অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে দৃশ্যমান বৈষম্য বিরাজমান ছিল। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৫ সালে মোট বৈদেশিক মুদ্রার ৫১.৫ শতাংশ আয় করতো পূর্ব পাকিস্তান, কিন্তু উন্নয়ন ব্যয়ের ৭০ শতাংশ বরাদ্দ করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের ৬১.৪ শতাংশ রপ্তানী আয়ের বিপরীতে পশ্চিম পাকিস্তানের রপ্তানী আয় ছিল ৩৮.৬ শতাংশ। অথচ মোট জাতীয় বাজেটের ৭৫ শতাংশ ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিস্তানে, আর পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় হতো মাত্র ২৫ শতাংশ। বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের মাত্র ১০-১৫ শতাংশ বরাদ্দ করা হতো পূর্ব পাকিস্তানের জন্য। এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে ৪.৩ শতাংশ হারে, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে এই হার ছিল ৬.৪ শতাংশ। বৈষম্যের প্রভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানের সেভাবে বৃদ্ধি পায়নি। নিচের সারণিতে বিষয়টি উপস্থাপন করা হলো।

পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় (টাকায়)

সময়	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	বৈষম্য
১৯৪৯-১৯৫০	২৮৮	৩৫১	৬৩
১৯৫৪=১৯৫৫	২৯৪	৩৬৫	৭১
১৯৫৯=১৯৬০	২৭৭	৩৬৭	৯০
১৯৬৪=১৯৬৫	৩০৩	৪৪০	১৩৭
১৯৬৯=১৯৭০	৩৩১	৫৩৩	২০২

(০৪) **শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য:** পাকিস্তান আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান চরম বৈষম্যের শিকার হয়। জাতীয় শিক্ষা বাজেটের প্রায় ৭০ শতাংশ বরাদ্দ পেত পশ্চিম পাকিস্তান, আর পূর্ব পাকিস্তান পেত মাত্র ৩০ শতাংশ। পশ্চিম পাকিস্তানে বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসহ উচ্চশিক্ষার জন্য অনেকগুলো নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলোতেও পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেওয়া হতো। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে উচ্চশিক্ষার জন্য নতুন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় যেমন কম প্রতিষ্ঠা করা হয়, তেমনি পুরাতনগুলোর জন্যও বরাদ্দ ছিল সীমিত। শিক্ষা ও প্রশাসনে উর্দুর প্রাধান্য থাকায় পূর্ব বাংলা শিক্ষায় ক্রমশ পিছিয়ে পড়ে। বিদেশে পড়ালেখা ও উচ্চশিক্ষার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের নাগরিকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হতো। এ ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকরা বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হতেন। শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষকদেরকে পূর্ব পকিস্তানেপদায়ন করা হতো। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষকমণ্ডলী পদোন্নতি এবং সুযোগ-সুবিধায় বঞ্চিত হতেন। পাকিস্তান সৃষ্টির সময় শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চিম অপেক্ষা পূর্ব পাকিস্তান এগিয়ে ছিল। কিন্তু সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির কারণে পূর্ব পাকিস্তান ক্রমশ পিছিয়ে পড়ে।

(০৫) **চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য:** সামরিক বাহিনীর (বিমান, নৌ ও সেনা) সদর দপ্তর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, মহাপরিচালকের কার্যালয় সবকিছু ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রায় ৫৬ শতাংশ ব্যয় হতো সামরিক খাতে, যার মাত্র ১০ শতাংশ ব্যয় হতো পূর্ব পাকিস্তানে। নিয়োগের ক্ষেত্রেও পশ্চিম পাকিস্তানিদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হতো। পশ্চিম পাকিস্তানের ৮৯৪ জন সেনাকর্মকর্তার বিপরীতে বাঙালি সেনাকর্মকতা ছিলেন মাত্র ১৪ জন। পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে মোট ৫১২ জন কর্মকর্তার মধ্যে বাঙালি ছিলেন ১৮৬ জন। পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্যের বিষয়টি একটি সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের চাকরির বৈষম্য

ক্রম	চাকরির ক্ষেত্র	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
০১	কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস	৩৪%	৬৬%
০২	ফরেন সার্ভিস	১৫%	৮৫%
০৩	ফরেন মিশন প্রধান	৯ জন	৬০ জন
০৪	প্রশাসনের ১ম শ্রেণি কর্মকর্তা	২৩%	৭৭%
০৫	প্রশাসনের ২য় শ্রেণি কর্মকর্তা	২৬%	৭৪%
০৬	সেনাবাহিনী	৫%	৯৫%
০৭	শীর্ষ সেনা কর্মকর্তা	১ জন	১৬ জন
০৮	পাইলট	১১%	৮৯%
০৯	আমর্ড ফোর্স	২০,০০০	৫০,০০০
১০	এয়ারলাইন্স	২৮০ জন	৭০০ জন

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পেলেও পূর্ব বাংলার জনসাধারণ নতুন করে ঔপনিবেশিক শোষণের কবলে পড়ে। নতুন এই ঔপনিবেশিক শক্তি ছিল পশ্চিম পাকিস্তান। তারা পূর্ব বাংলার মানুষের ভাষা, সংস্কৃতিতে যেমন আঘাত হেনেছে, তেমনি অথর্নীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, চাকরি-বাকরি প্রতিটি ক্ষেত্রে শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্য চালিয়েছে। আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার মানুষ এর প্রতিবাদও জানিয়েছে। এই প্রতিবাদেরই চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

	শিক্ষার্থীর কাজ	পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের একটি সারণি প্রস্তুত করুন। **সময়: ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের যেমন অস্বাভাবিক ভৌগোলিক দূরত্ব ছিল, তেমনি আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও ছিল বিস্তর ব্যবধান। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর ঔপনিবেশিক মনোভাব, তাদের শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্য এই ব্যবধানকে আরো অনেক বেশি বাড়িয়ে দিয়েছিল। ভাষা ও সংস্কৃতি, শিক্ষা, চাকরি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তারা পূর্ব পাকিস্তানের উপর তাদের অন্যায় আধিপত্য চাপিয়ে দিয়েছে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য পূর্ব পাকিস্তানকে ক্রমশ নিঃস্ব করে দিয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের এই শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান রুখে দাঁড়িয়েছে, আন্দোলন-সংগ্রাম কওে দাবি আদায় কওে নিয়েছে। আর এভাবেই ছিনিয়ে এনেছে স্বাধীনতার স্মারক লাল-সবুজের পতাকা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন ($\surd$) দিন।

১। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের কতদিনের মধ্যে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল?

(ক) ৫৬ দিন (খ) ৯০ দিন

(গ) ১৬০ দিন (ঘ) ২৪২ দিন

২। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রবৃদ্ধির হার কত শতাংশ ছিল?

(ক) যথাক্রমে ৬.৩ শতাংশ ও ৫.৪ শতাংশ (খ) যথাক্রমে ৫.৫ শতাংশ ও ৭.৪ শতাংশ

(গ) যথাক্রমে ৫.৫ শতাংশ ও ৫.৬ শতাংশ (ঘ) যথাক্রমে ৪.৩ শতাংশ ও ৬.৪ শতাংশ

পাঠ-৫.৩ বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ

Development of Bengali Nationalism

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- জাতীয়তাবাদের বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	জাতীয়তাবাদ, ভাষা আন্দোলন, বৈষম্য, গণঅভ্যুত্থান।

জাতীয়তাবাদ কী

নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিসরে অভিন্ন লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং স্বার্থের ভিত্তিতে সংগঠিত মানবগোষ্ঠী একেকটি জাতি গঠন করে। জাতি গঠনের তীব্র আবেগ, আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে কেবল ভৌগোলিক পরিসীমা নয়, ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐক্য, নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্য এবং আর্থ-সামাজিক মেলবন্ধন থাকা অপরিহার্য। বস্তুত, জাতীয়তাবাদ হচ্ছে এক ধরনের অনুভূতি। এ অনুভূতির সাথে স্বদেশপ্রেমের সংশ্লেষ রয়েছে। তবে দেশপ্রেম অপেক্ষা জাতীয়তাবাদ অনেক বেশি ব্যাপক, বিস্তৃত এবং স্বতন্ত্র। জাতিভিত্তিক জাতীয়তাবাদ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও বিস্তৃত হতে পারে। যেমন বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাংলাদেশের বাইরে বসবাসকারী বাঙালিরাও বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হতে পারেন। অন্যদিকে বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অবস্থান করছে। তারা নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশী হলেও তাদের স্বতন্ত্র জাতিগত পরিচয় রয়েছে। সে ক্ষেত্রে নাগরিক হিসেবে সবাই বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ধারক। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সমস্বার্থ নিয়ে স্বাধীনভাবে বসবাসের অনুভূতিই জাতীয়তাবাদ গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সেদিক থেকে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার আকাঙ্ক্ষাই জাতীয়তাবাদ। ইটালির চিন্তাবিদ নিকোলো ম্যাকিয়েভেলি (Niccolo Machiavelli) তাঁর *The Prince* (1532) গ্রন্থে সর্বপ্রথম আধুনিক জাতিরাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদের ধারণা ব্যক্ত করেন। জাতীয়তাবাদের প্রধানত দু'টি ধারা রয়েছে। যথা: ক) কট্টর বা আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ, এবং খ) উদার জাতীয়তাবাদ। বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ উদার জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে। তবে ইসরাইলসহ কিছু রাষ্ট্র বা গোষ্ঠী কট্টর আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের চর্চা করে।

জাতীয়তাবাদের উপাদান

জাতীয়তাবাদ গঠন বা চর্চা করতে হলে এর কতগুলো অপরিহার্য উপাদান থাকতে হয়। যেমন:

১) ভৌগোলিক সীমানা ও নৈকট্য
২) ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐক্য
৩) স্বাধিকারের চেতনা
৪) শিক্ষা ও সচেতনতা
৫) স্বজাতিবোধ এবং স্বদেশপ্রেম
৬) শোষণ–বঞ্চনার বিরুদ্ধে সচেতনতা
৭) রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক চেতনা
৮) নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহ্যগত ঐক্য
৯) রাজনৈতিক ঐক্য
১০) ভাবগত বা মনস্তাত্ত্বিক ঐক্য

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ

ঔপনিবেশিক ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলায় জাতীয়তাবাদের বিকাশ শুরু হয়। সে সময়ের অখন্ড ভারতবর্ষে 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদ' বিকাশে বাঙালি নেতৃবৃন্দ এবং বাংলার সচেতন জনগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেও বাঙালি জনগোষ্ঠী তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনার স্বতন্ত্র ধারা অব্যাহত রাখে। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ঘটনাবলি বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

(১) **১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন:** বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো ভাষা আন্দোলন। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশের ভাষা ছিলো বাংলা। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেয়। এদেশের সর্বস্তরের জনগণ তাদের এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাখান করে এবং প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে। ১৯৪৮ সাল থেকেই শুরু হয় ভাষার দাবিতে আন্দোলন। ১৯৫২ সালে রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একগুচ্ছ তাজা প্রাণের বিনিময়ে পাকিস্তান সরকার বাঙালিদের দাবী মানতে বাধ্য হয়। ১৯৫৬ সালে প্রবর্তিত পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে এদেশের মানুষের মধ্যে ঐক্য, সংহতি ও সচেতনতা গড়ে ওঠে। ন্যায়ের পক্ষে আন্দোলনের সাফল্য সবার মধ্যে তীব্র আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলায় সাংগঠনিক শক্তি, রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ও শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-সাহিত্য নানা ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদও বিকশিত হয়।

(২) **১৯৫৪ সালের নির্বাচন:** ১৯৫৪ সালের নির্বাচন বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। স্বাধীনতার শুরু থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি উদাসীন, অবজ্ঞাসুলভ, শোষণমূলক ও ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটায়। ভাষার অধিকার কেড়ে নেওয়ার হীন প্রচেষ্টা বাঙালি নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনগণ ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। এমন প্রেক্ষাপটে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এক অভূতপূর্ব ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম, গণতন্ত্রী দল এবং খিলাফতে রব্বানি পার্টির সমন্বয়ে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ৩০৯ আসনের মধ্যে ২২৮টি আসন লাভ করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার তৃণমূল পর্যন্ত মুসলিম লীগ বিরোধী জনসচেতনতা তৈরি হয়। রাজনীতি বিষয়ে এই জনসচেতনতাই পরবর্তীকালে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে আরো সুদৃঢ় করেছিল।

(৩) **১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান:** বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আগরতলা মামলা ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৮ সালের ছাত্র অসন্তোষ ক্রমশ গণআন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। নানা ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে বাংলার জনগণ আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে। শেখ মুজিবের মুক্তি এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে সমগ্র ঢাকা শহর রূপান্তরিত হয় মিছিলের নগরীতে। গভর্নর হাউস ঘেরাও হলে পুলিশের সাথে জনতার ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এই সূত্র ধরে আন্দোলন আরও জোরদার হয়। জেলখানার ভিতরে সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা, পুলিশের গুলিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শামসুজ্জোহা, ঢাকায় কিশোর মতিউরসহ অসংখ্য মানুষের শহিদ হওয়ার মধ্য দিয়ে আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। গণঅভ্যুত্থানের মুখে প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হন। একইসাথে তিনি ক্ষমতা ছাড়ারও ঘোষণা দেন এবং অঙ্গীকার করেন, পরবর্তী নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হবেন না। গণ-আন্দোলনের এ বিজয় বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে আরও একটি অনন্য ঘটনা।

(৪) **১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন:** ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন বাঙালি জাতীয়তাদের বিকাশের ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখে। দীর্ঘদিনের শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষ আরও বেশি সোচ্চার হয়ে ওঠে। ১৯৭০ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রলয়ংকরী ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস আঘাত করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তখন অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ায়নি। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি পূর্ব বাংলার মানুষ আরো বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। পরবর্তী নির্বাচনে এর ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এককভাবে প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ টি আসনের মধ্যে ২৮৮ টি আসনে এবং জাতীয় পরিষদের (পূর্ব পাকিস্তান) ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি আসনে জয় লাভ করে। নির্বাচনের এই ফলাফল একদিকে যেমন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের প্রতি পূর্ব বাংলার মানুষের অনস্থা প্রকাশ করে, তেমনি ৬ দফা, আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবের প্রতি মানুষের নিরঙ্কুশ সমর্থনের দলিল হিসেবেও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ফলে পূর্ব বাংলার মানুষ স্বাধীনতার একদফা আন্দোলনে ধাবিত হয়। সুতরাং, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন বাঙালি জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে গঠিত ঐক্য ও সংহতি কতটা সুদৃঢ় হয়।

(৫) **শাসক গোষ্ঠীর শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্য:** পাকিস্তানীরা বাঙালিদের প্রতি অসম্মানজনক ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতো। তাদের দৃষ্টিতে বাঙালিরা ছিল পাকিস্তানের 'দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক'। সামাজিক অমর্যাদার পাশাপাশি ভাষাসহ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তারা বাঙালিদেরকে নিপীড়ন করতো। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সরকারি চাকরিতে সংঘটিত প্রকট বৈষম্য থেকে মুক্তি পেতে পূর্ব বাংলার মানুষ স্বাধীকারের জন্য সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। পাকিস্তানীদের শোষণ ও লুণ্ঠন বাঙালিদেরকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং সত্তরের নির্বাচনে শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-বৈষম্যই পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে দিয়েছিল। ব্রিটিশদের শোষণ, লুণ্ঠন ও বৈষম্য যেমন স্বদেশি আন্দোলনকে গতিশীল করেছিল, তেমনি পাক-শাসকদের শোষণ-বৈষম্য বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে ত্বরান্বিত করেছিল।

(৬) **১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ:** ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের কবল থেকে ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে। পাকিস্তানের অংশ হিসেবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতার কোনো সুফল পায়নি। শুরু থেকে তারা নতুন ধারায় শোষিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত হতে থাকে। ফলে পূর্ব বাংলার মানুষের স্বাধীকারের দাবি ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকে। এর চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে। মুষ্টিমেয় রাজাকার, আল-বদর ছাড়া বাংলার জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষ সবাই জীবনের মায়া ত্যাগ করে দেশের জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ফলে এ যুদ্ধ হয়ে ওঠে এক জনযুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহীদ এবং প্রায় দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে এটাই শ্রেষ্ঠ অর্জন। ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে মুক্তিযুদ্ধই সবচেয়ে প্রভাবশালী উপাদান। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে প্রভাবশালী উপাদানগুলো চিহ্নিত করুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বাঙালি জাতীয়তাবাদ একদিনে, হঠাৎ করে বিকশিত হয়নি। হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য সংস্কৃতি যেমন জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে, তেমনি বহিরাগত ঔপনিবেশিক শক্তির শোষণ, বঞ্চনা, লুণ্ঠন, নিপীড়ন বাংলার মানুষকে সচেতন ও স্বাধীনতাকামী করে তুলেছে। জাতীয়তাবাদ বিকাশে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা উপাদান হচ্ছে ভাষা আন্দোলন। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাংলার মানুষ সুদৃঢ় ঐক্যে আবদ্ধ হয়। এরপর ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয়, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ, সর্বোপরি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের জাতীয়তাবাদ পরিপূর্ণতা লাভ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন ($\surd$) দিন।

১। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কয়টি আসনে জয়লাভ করেছিল?

(ক) ২১২ টি (খ) ২২৮ টি

(গ) ২৪১ টি (ঘ) ২৫২ টি।

২। পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রবর্তিত হয় কত সালে?

(ক) ১৯৪৮ সালে (খ) ১৯৫২ সালে

(গ) ১৯৫৬ সালে (ঘ) ১৯৬২ সালে

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১	:	১। ক	২। গ	৩। খ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২	:	১। ক	২। ঘ			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩	:	১। খ	২। গ			
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	:	১। গ	২। খ	৩। ঘ	৪। খ	৫। ক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

১। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা?
(ক) ৩৯ শতাংশ (খ) ৫১ শতাংশ
(গ) ৫৬ শতাংশ (ঘ) ৬১ শতাংশ

২। পাকিস্তানের মোট জাতীয় শিক্ষা বাজেটের কত শতাংশ পশ্চিম পাকিস্তানে বরাদ্দ দেওয়া হতো?
(ক) ৯০ শতাংশ (খ) ৭০ শতাংশ
(গ) ৫৬ শতাংশ (ঘ) ৪৫ শতাংশ

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বচনী প্রশ্ন

৩। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে ভূমিকা রেখেছে–
(i) ৫২'র ভাষা আন্দোলনের
(ii) ৬৬'র ছয় দফা
(iii) ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান
সঠিক উত্তর কোনটি?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

গ. নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বীজ রোপিত হয়েছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। এরপর ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয়, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার জনগণ স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়।

৪। পাকিস্তান গণপরিষদে কে প্রথম বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপন করেছিলেন?
(ক) মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (খ) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
(গ) শেখ মুজিবুর রহমান (ঘ) শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক

৫। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে কতটি আসনে জয়লাভ করে?
(ক) ১৬৭টি (খ) ১৯৭টি (গ) ২১১টি (ঘ) ২৮৮টি

ঘ) সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্নঃ

উদ্দীপকটি পড়ুন এব নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

মৌলি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এইচএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থী। তিনি একদিন সমাজবিজ্ঞান বইয়ের জাতীয়তাবাদ বিকাশ সম্পর্কিত পাঠটি পড়ছিলেন। কিন্তু তার কাছে বিষয়টি বেশ জটিল মনে হয়। অতঃপর তিনি ইউটিউবে এ বিষয়ে দু'টি ভিডিও লেকচার দেখেন। একদিন টিউটোরিয়াল ক্লাসে স্যারকে প্রশ্ন করেও বিষয়টি সম্পর্কে তিনি ধারণা লাভ করেন। এ পর্যায়ে তিনি বুঝতে পারেন, জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেমের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে। একটি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যেমন জাতীয়তাবাদের ভূমিকা আছে, তেমনি একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় ঐক্য-সংহতি গড়ে ওঠার জন্যও জাতীয়তাবাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১) ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিজয়ী যুক্তফ্রন্টের শরিক দু'টি রাজনৈতিক দলের নাম লিখুন। ১
২) ১১ মার্চ কেন প্রতিবাদ দিবস হিসেবে পালন করা হতো? ২
৩) পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ কীভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে ভূমিকা রেখেছে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন ৩
৪) "জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেমের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে"-মৌলির এ ধারণার সাথে আপনি কি একমত? ব্যাখ্যা করুন। ৪

বাংলাদেশের গ্রামীণ ও নগর সমাজ
Rural and Urban Society of Bangladesh

ইউনিট ৬

সমাজ এবং সমাজ কাঠামোর প্রধান দু'টি রূপ হচ্ছে গ্রামীণ ও নগর সমাজ। সভ্যতার সূচনা হয়েছে গ্রামীণ সমাজকে কেন্দ্র করে যা ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়েছে নগর সমাজের মাধ্যমে। গ্রামীণ সমাজ কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার ধারক। অন্যদিকে নগর সমাজ হচ্ছে আধুনিক শিল্পোৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও আধুনিক সেবাখাতের প্রসারের মাধ্যমে শহুরে জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণের নিয়ামক। গ্রামীণ সমাজ ঐতিহ্যকে লালন করে। নগর সমাজ শিক্ষা ও আধুনিকতার পৃষ্ঠপোষক। বাংলাদেশের প্রাণ হচ্ছে গ্রামীণ সমাজ। এদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, নীতিবোধ, সামাজিক প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান, ভাষা, সংস্কৃতি, পেশা, জীবন-জীবিকা সবকিছু গ্রামীণ সমাজকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ ভাগ বাস করেন গ্রামে। সেদিক থেকে গ্রামীণ সমাজ অধ্যয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। অন্যদিকে নগর সমাজের বিকাশ শুরু হয় খ্রিস্টপূর্ব ৫ম থেকে ২য় শতাব্দীতে। মধ্যপ্রাচ্যের মেসোপটেমিয়া (ইরাক), পারস্য (ইরান) এবং মিশরে নগরের গোড়াপত্তন ঘটে। ক্রমান্বয়ে এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল, ইউরোপ এবং ল্যাটিন আমেরিকায়ও নগর সভ্যতা বিকশিত হয়। শিক্ষা, প্রশাসন, শিল্পায়ন এবং প্রগতিশীল ও আধুনিকতা চিন্তাধারা নগর সমাজের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশের প্রায় ৩৫ শতাংশ মানুষ এখন শহরে বসবাস করে। গ্রামীণ ও নগর সমাজের পার্থক্য কেবল এর উৎপাদন ব্যবস্থায় নয়; সামগ্রিক জীবনমান ও জীবনযাত্রার ভিন্নতাই গ্রামীণ ও নগর সমাজের পার্থক্য তৈরি করে। গ্রামীণ ও নগর সমাজের সামাজিক শ্রেণি, স্তরবিন্যাস, ক্ষমতা কাঠামো যেমন পৃথক, তেমনি আর্থ-সামাজিক অবস্থা, উৎপাদন ব্যবস্থা, সামাজিক সম্পর্ক, জীবন-জীবিকা প্রভৃতি ক্ষেত্রে দৃশ্যমান পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৬ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৬.১ : বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো
পাঠ- ৬.২ : বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ এবং এর সামাজিক স্তরবিন্যাস
পাঠ- ৬.৩ : গ্রামীণ সমাজের ক্ষমতাকাঠামো
পাঠ- ৬.৪ : বাংলাদেশের নগর সমাজ
পাঠ- ৬.৫ : নগর সমাজের স্তরবিন্যাস ও ক্ষমতাকাঠামো
পাঠ- ৬.৬ : গ্রাম ও নগর সমাজের তুলনামূলক চিত্র

পাঠ-৬.১ বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো
Social Structure of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সমাজ কাঠামোর সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোর উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;

মুখ্য শব্দ	সমাজ কাঠামো, দল, প্রতিষ্ঠান, উপাদান, উৎপাদন ব্যবস্থা, পরিবার, অর্থনীতি।

সমাজের কাঠামো গঠিত হয় সমাজের মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে, যার উপর ভিত্তি করে সমাজ টিকে থাকে এবং যেসব উপাদানের মাধ্যমে আমরা সমাজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি সেগুলোর সমন্বিত রূপ হচ্ছে সমাজ কাঠামো। সমাজবিজ্ঞানে 'সমাজ কাঠামো' (Social structure) প্রত্যয়টি প্রথম ব্যবহার করেন প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞান হার্বার্ট স্পেন্সার।

সমাজ কাঠামো সম্পর্কে রেডক্লিফ ব্রাউন (Radcliffe Brown, 1950) বলেছেন, সমাজ কাঠামোর উপাদান হচ্ছে মানব সম্প্রদায় এবং তাদের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন সম্পর্ক।

সমাজ কাঠামোর সংজ্ঞায় মরিস জিন্সবার্গ বলেছেন, সমাজ কাঠামোর অধ্যয়ন হচ্ছে সামাজিক সংগঠনসমূহের প্রধান প্রধান রূপ। সামাজিক সংগঠনের ভিতরে রয়েছে সামাজিক গোষ্ঠী, সংঘ, সমিতি, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। এসবের জটিল রূপই হচ্ছে সমাজ কাঠামো। (The study of social structure is concerned with the principal forms of social organisations i.e. types of groups, association and institutions and the complex of these which constitute society.)

মার্ক্স ও তাঁর অনুসারীরা বলেন, সমাজ কাঠামোর প্রধান দু'টি দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে সমাজের মৌল ভিত্তি (Basic structure) অন্যটি উপরি কাঠামো (Super structure)। মৌল কাঠামো হচ্ছে সমাজের অর্থনৈতিক বিষয় বা উৎপাদন ব্যবস্থা। আর উপরিকাঠামো হচ্ছে সমাজের রাষ্ট্র, আইন, সরকার, প্রথা, বিশ্বাস, সংস্কৃতি ইত্যাদি। এ মৌল কাঠামো এবং উপরিকাঠামোর সমন্বয়েই তৈরি হয় সমাজ কাঠামো।

বস্তুত সমাজ কাঠামো হচ্ছে সমাজের মৌল উপাদানের সমষ্টি। সমাজ কাঠামোই মূলত সমাজকে দৃশ্যমান এবং কার্যকর করে তোলে। সমাজের অর্থনৈতিক ও উৎপাদান ব্যবস্থা, পরিবার ও সামাজিক সম্পর্ক, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক পরিচয়, যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা ইত্যাদির সমন্বয়ে সামাজিক কাঠামো তৈরি হয়।

বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো এবং এর উপাদানসমূহ

বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো গ্রামীণ ও নগর সমাজের সমন্বিত রূপ। এখানে কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার পাশাপাশি আধুনিক শিল্পভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থাও কার্যকর অবদান রাখছে। সেবাখাতের ক্রমবর্ধমান বিকাশও বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিবেচনা করে অনেকে বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোকে 'আধা সামন্ততান্ত্রিক এবং আধা পুঁজিবাদী' বলে অভিহিত করে থাকেন। এখানে বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোর প্রধান প্রধান উপাদান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১) **কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা:** বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা। আবহমান কাল থেকে এদেশের মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষিতে খোরাকি উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে বাণিজ্যিক উৎপাদন ব্যবস্থায় রূপান্তর ঘটেছে। যদিও জিডিপি'তে কৃষির অবদান এবং কৃষিখাতে শ্রমশক্তির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে, কিন্তু দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে কৃষির অবদান এখনো অপরিসীম।

২) **ক্রমবর্ধমান শিল্পোৎপাদন:** কৃষির পাশাপাশি দেশের শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে। দেশের মোট শ্রমশক্তির একটি বড় অংশ শিল্পখাতে নিয়োজিত। জিডিপি'তেও শিল্পের অবদান উত্তরত্তোর বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে তাই বাংলাদেশের সমাজ বর্তমান কাঠামোর অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা।

৩) **বিকাশমান সেবাখাত:** অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং আধুনিকায়ন দেশের সেবাখাত বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন, উন্নত প্রযুক্তিভিত্তিক যোগাযোগ, তথ্য প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেবাখাত ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। পেশা, আয়-উপার্জন, দৈনন্দিন জীবন ব্যবস্থা প্রভৃতি সেবাখাত দ্বারা প্রভাবিত।

৪) **ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদ ও সম্প্রসারমান পুঁজিবাদ:** জবাবদিহিমূলক গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন সামন্তবাদী ব্যবস্থা ও ধ্যান-ধারণাকে ক্রমশ বিলুপ্তির পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রসারিত হচ্ছে পুঁজিবাদ। ব্যক্তিগত মালিকানা, উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থা, মানুষের বৈষয়িক চিন্তা-ভাবনা, শ্রেণি শোষণ ও বৈষম্য প্রতিটি ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের প্রভাব লক্ষণীয়। 'সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে পুঁজিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় রূপান্তর' বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ কাঠামোর এক অনিবার্য বাস্তবতা।

৫) **সম্প্রসারমান বাজার ব্যবস্থা:** পুঁজিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রভাবে বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থা ক্রমশ সম্প্রসারিত ও বিকশিত হচ্ছে। শিল্পের কাঁচামাল, উৎপাদিত দ্রব্য, ভোগ্যপণ্য, সেবা, জনশক্তি সবকিছু এখন বাজারের পণ্য। গ্রাম থেকে শহর, জাতীয় থেকে আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক প্রতিটি পর্যায়ে প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো এক এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছে।

৬) **প্রভাবশালী মুদ্রা অর্থনীতি:** পুঁজিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা এবং বাজার ব্যবস্থার প্রভাবে বাংলাদেশের মুদ্রা অর্থনীতি অনেক বেশি শক্তিশালী। সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি, সম্মান ও মর্যাদা, সুযোগ-সুবিধা, নেতৃত্ব অধিকারের অন্যতম উপাদান অর্থবিত্ত বা নগদ টাকা। এমনকি স্বাস্থ্য, শিক্ষার মত মৌলিক অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রেও মুদ্রা অর্থনীতির ভূমিকা রয়েছে।

৭) **ধনী-দরিদ্র বৈষম্য:** বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোর এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ধনী-দরিদ্র বৈষম্য। দেশের পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ধনী আরো ধনী হচ্ছে; দরিদ্র হচ্ছে আরো নিঃস্ব। সবার মাথাপিছু গড় আয় বাড়ছে। কিন্তু ধনীর আয় দরিদ্র মানুষের তুলনায় অনেক গুণ বেশি। ফলে ধনীদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার পাশেই ছিন্নমূল মানুষের বসবাস পরিলক্ষিত হয়।

৮) **অনু পরিবার ব্যবস্থা:** বাংলাদেশের ভিত্ হচ্ছে বর্ধিত ও যৌথ পরিবার। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনের অনিবার্য ফল হচ্ছে অনু পরিবার। গ্রাম কিংবা শহর, শিক্ষিত কিংবা নিরক্ষর, কৃষক, শ্রমিক কিংবা পেশাজীবী সবাই অনু পরিবারের অংশ। বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো থেকে যৌথ পরিবার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে এবং স্থান করে নিয়েছে অনু পরিবার।

৯) **উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণি:** শিক্ষা, শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলে দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিকশিত হচ্ছে। নাগরিক সমাজ, পেশাজীবী এবং শিক্ষিত-সচেতন জনগোষ্ঠী মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে সমৃদ্ধ করছে। জনমত গঠন, নীতি নির্ধারণ, সামাজিক আন্দোলন প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১০) **সচেতন রাজনৈতিক শ্রেণি:** শিক্ষা ও গণমাধ্যমের বিকাশ দেশে সচেতন রাজনৈতিক শ্রেণি তৈরি করছে। রাজনৈতিক চেতনা, আদর্শ এবং চর্চা এখন প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ছে। বর্তমানে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়।

১১) **কর্মক্ষম যুব সমাজ:** দেশের মোট জনগোষ্ঠীর বৃহদাংশ কর্মক্ষম যুব সমাজ। এরা দেশের উন্নতি, অগ্রগতি ও সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই যুব সমাজের কারণেই দেশের ষোল কোটি মানুষ 'সমস্যা' না হয়ে আজ 'সম্পদ' বলে পরিগণিত। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই যুব সমাজের ভূমিকা অপরিসীম।

১২) **অধিকার সচেতন নারী সমাজ:** সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কারণে বাংলাদেশের নারী সমাজ দীর্ঘকাল যাবৎ শিক্ষা ও সচেতনায় অনগ্রসর ছিল। কিন্তু বর্তমান সামাজিক কাঠামোয় নারী সমাজ শিক্ষিত এবং অধিকার সচেতন। বাল্যবিবাহ এবং যৌতুক প্রথা রোধ, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সম্পদের মালিকানা এবং ক্ষমতায়ন নারী সমাজকে বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত করেছে।

১৩) গ্রামীণ ও নগর সমাজের নৈকট্য: বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোয় এখন গ্রামীণ ও নগর সমাজের ব্যবধান অনেক হ্রাস পেয়েছে। ভৌত ও তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা, গণমাধ্যম, শিক্ষা, পেশা ইত্যাদি নগর ও গ্রামীণ সমাজের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করছে। গ্রাম ও শহরের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ ও সম্পর্ক ক্রমশ নিবিড় থেকে নিবিড়তর হচ্ছে। বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজে এর দৃশ্যমান প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	**বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোর উপাদানসমূহ চিহ্নিত করুন। সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজকে জানা এবং উপলব্ধি করার মূলসূত্র হচ্ছে এর কাঠামো। সমাজের প্রধান প্রধান দল, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, উৎপাদন ব্যবস্থা, আচরণবিধি ইত্যাদির সমন্বয় হচ্ছে সামাজিক কাঠামো। বাংলাদেশের সামজ কাঠামো বুঝতে হলে এর বিভিন্ন উপাদানকে জানতে হবে। বস্তুত কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা, ক্রমবর্ধমান শিল্পোৎপাদন, বিকাশমান সেবাখাত, ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদ ও সম্প্রসারমান পুঁজিবাদ, বিকাশমান বাজার ব্যবস্থা, প্রভাবশালী মুদ্রা অর্থনীতি, বর্ধিত ও যৌথ পরিবারের পরিবর্তে অনু পরিবারের সৃষ্টি, উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণি, সচেতন রাজনৈতিক শ্রেণির সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সমাজ কাঠামো হচ্ছে মৌল কাঠামো এবং উপরি কাঠামোর সমষ্টি– কার অভিমত?

(ক) ম্যাকাইভার (খ) কার্ল মার্কস
(গ) অগাস্ট কোঁতে (ঘ) হার্বার্ট স্পেনসার

২। বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোর উপাদান হচ্ছে–

(i) কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা
(ii) উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণি
(iii) আমলাতন্ত্র

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii
(গ) i ও ii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.২ বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ এবং এর সামাজিক স্তরবিন্যাস
Rural Society of Bangladesh and Its Social Stratification

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের স্তরবিন্যাসের ধরন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- গ্রামীণ সমাজে স্তরবিন্যাসের বিভিন্ন উপাদান বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	গ্রামীণ সমাজ, সামাজিক স্তরবিন্যাস, ভূমি, কৃষি, বংশ, বর্ণ, জ্ঞাতিগোষ্ঠী, শিক্ষা কৃষি বহির্ভুত পেশা।

গ্রামীণ সমাজ

বৈশিষ্ট্যগত কারণেই গ্রামীণ সমাজ অন্য যেকোনো সমাজ থেকে আলাদা। বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশ প্রধানত গ্রামনির্ভর জনপদ। যুগ যুগ ধরে এখানে গ্রাম-সমাজ টিকে ছিলো অপরিবর্তিত রূপে। গ্রামীণ সমাজের মূল ভিত্তি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সম্প্রদায়। গ্রামের মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় সব উপকরণ নিজেরাই উৎপাদন করতো। ফলে বাইরের গ্রাম বা শহরের সাথে তাদের যোগাযোগ ছিল খুবই সীমিত। গ্রামীণ সমাজ বলতে মূলত কৃষিকাজ ও কৃষক সমাজ নিয়ে গঠিত জনপদকে বুঝায়। চাষযোগ্য জমি, কৃষকের উঠান, লাঙ্গল-জোয়ালসহ চাষীর মাঠে গমন, আঁকা-বাঁকা কাঁচা সড়ক কিংবা ছোট নদী আর গাছ-গাছালি, স্নেহ-ছায়া ও পাখ-পাখালির কল-কূজনে মুখরিত গুচ্ছ গুচ্ছ বাড়ি ঘর নিয়ে গ্রাম গড়ে ওঠে। এ গ্রামের আদিবাসীরা যে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে তা-ই মূলত গ্রামীণ সমাজ। গ্রামে শহরের তুলনায় জনবসতির ঘনত্ব কম। Nelson তাঁর *Rural Sociology* গ্রন্থে বলেছেন, "পরিসংখ্যানগত দিক থেকে গ্রাম হচ্ছে সে জনপদ যার জনসংখ্যা ২৫০০ জনের কম।"

গ্রামীণ সমাজ হচ্ছে শহরের যান্ত্রিক সভ্যতা থেকে দূরের একটি বিচ্ছিন্ন জনপদ; যেখানে রয়েছে চারদিকে আবাদযোগ্য জমি, বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ, স্বল্প ঘনত্বের কৃষি নির্ভর জনবসতি, মোটামুটি দূরত্ব বজায় রেখে একটার পর একটা বাড়ি (Homestead), প্রতিটা বাড়িতে বাস করে এক বা অনেকগুলো পরিবার (Household)। অন্য গ্রাম থেকে সনাক্তকরণের জন্য প্রতিটি গ্রামেরই রয়েছে নিজস্ব নাম ও সুনির্দিষ্ট পরিসীমা। গ্রামের জনসমষ্টির মধ্যে সম্প্রদায়ের মত স্বতন্ত্র মূল্যবোধ, গ্রামীণ চেতনা, নিজস্বতা, পৃথক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য পরিলক্ষিত হতে পারে। গ্রামের আদিবাসীদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত সমাজই গ্রামীণ সমাজ বলে বিবেচিত হয়।

গ্রামীণ সমাজের বৈশিষ্ট্য

গ্রামীণ সমাজ কিছু বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। তবে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এদের পরিবর্তনও হয়ে থাকে। গ্রামীণ সমাজের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে: ক) জনসংখ্যার স্বল্প ঘনত্ব, খ) স্বল্প মাত্রার সামাজিক স্তরবিন্যাস, গ) সামাজিক গতিশীলতা কম, ঘ) মন্থর গতির সামাজিক পরিবর্তন, ঙ) কৃষিপ্রধান জীবন ব্যবস্থা চ) ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার আধিপত্য, ছ) স্বতন্ত্র ক্ষমতা কাঠামো ও শ্রেণি কাঠামো, জ) সুদৃঢ় জ্ঞাতি সম্পর্ক, ঝ) স্বল্পমাত্রার প্রযুক্তি, ঞ) যৌথ পরিবারের প্রচলন। এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ পরিবেশ ও সমাজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়।

সামাজিক স্তরবিন্যাস

সামাজিক স্তরবিন্যাসের মূলে রয়েছে সমাজের মানুষের মধ্যে বিদ্যমান অসমতা। সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে প্রচলিত সুযোগ-সুবিধা, সম্পদ, সামাজিক অবস্থান, সম্মান এবং পদমর্যাদাকে কেন্দ্র করে সামাজিক অসমতা সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ সামাজিক অসমতা হলো সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে ভিন্নতা তৈরির এমন একটি প্রক্রিয়া, যার দ্বারা সামাজিক মান-

মর্যাদা, যশ ,খ্যাতি, বিত্ত-বৈভব ইত্যাদি বিকশিত হয় ও ব্যক্তি সমাজে একটি নির্দিষ্ট পরিচিতি লাভ করে। সামাজিক অসমতা তীব্র এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করলে আমরা তাকে সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে পারি। সমাজস্থ জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে উঁচু-নীচু পর্যায়ে বিভক্ত করাকেই সামাজিক স্তরবিন্যাস বলে। অর্থাৎ সামাজিক স্তরবিন্যাস হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা সমাজের ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে উঁচু ও নিচু স্তরে বিভক্ত করা যায়। P. Sorokin বলেছেন, সকল স্থায়ী ও সংগঠিত গোষ্ঠী স্তরবিন্যস্ত। সদস্যদের ভেতর বিদ্যমান প্রকৃত সমতাসম্পন্ন স্তরবিহীন সমাজ একটি অলীক কল্পনামাত্র, যা মানব জাতির ইতিহাসে কখনো বাস্তবায়িত হবে না।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের সংজ্ঞা

স্তরবিন্যাস (Stratification) শব্দটি মৃত্তিকা বিজ্ঞান থেকে এসেছে। ভূ-গঠনে মাটির বিভিন্ন স্তরের ন্যায় সমাজের মানুষও বিভিন্ন শ্রেণি ও স্তরে বিভক্ত। নানা উপাদানের ভিত্তিতে সমাজের মানুষের মধ্যে যে উঁচু-নীচু বিন্যাস পরিলক্ষিত হয় সাধারণ অর্থে তাকে সামাজিক স্তরবিন্যাস বলে। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সামাজিক স্তরবিন্যাসকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন: জিসবার্ট (Gisbert) তাঁর *'Fundamentals of Sociology'* গ্রন্থে বলেছেন, "সমাজকে একটি স্থায়ী দল বা প্রকরণে বিভক্ত করাই হচ্ছে সামাজিক স্তরবিন্যাস যেখানে একে অন্যের সাথে মানের উচ্চক্রম এবং নিম্নক্রমের ভিত্তিতে সম্পর্কিত।" সামাজিক স্তরবিন্যাসের আলোকে সমাজে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত ছাড়াও শাসক, শোষিত, মালিক–শ্রমিক, ধনী–দরিদ্র ইত্যাদি পার্থক্যমূলক শ্রেণি বা গোষ্ঠী দেখা যায়।

ডেভিস ও মুর (Davis and Moore) মনে করেন, সামাজিক স্তরবিন্যাস হচ্ছে সমাজের মানুষের মধ্যে বিভক্তি। এর মূলে রয়েছে মানুষের বিভিন্ন কর্মপ্রক্রিয়া। অর্থাৎ কে কী কাজ করে তার আলোকে সমাজে যে ভেদাভেদ সৃষ্টি হয় তা-ই সামাজিক স্তরবিন্যাস। তাঁদের মতে, "স্তরবিন্যাস হচ্ছে সর্বজনীন ও চিরন্তন। কেননা এটি সবকল সমাজের সদস্যদেরকে নানা পদমর্যাদায় বিভক্তির মাধ্যমে শ্রমবিভাজন সৃষ্টি করে।"

পরিশেষে বলা যায়, বিভিন্ন উপাদান এবং সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথার ভিত্তিতে সমাজের সদস্যদের মধ্যে যে পার্থক্য এবং ভেদাভেদ পরিলক্ষিত হয় তাই সামাজিক স্তরবিন্যাস। এখানে সামাজিক ভিন্নতা, অসমতা এবং পার্থক্য স্থায়ী, প্রতিষ্ঠিত এবং কাঠামোবদ্ধরূপ পরিগ্রহ করে।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধরন

সমাজবিজ্ঞানীরা সাধারণত সামাজিক স্তরবিন্যাসের চারটি ধরনের উল্লেখ করে থাকেন। এগুলো হচ্ছে:

১) **দাস ব্যবস্থা (Slavery):** সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রথম ধরন হচ্ছে দাস ব্যবস্থা। এখানে সামাজিক স্তরবিন্যাস হচ্ছে দাস এবং দাস মালিকের মধ্যে।

২) **এস্টেট (Estate):** মধ্যযুগের সামাজিক স্তরবিন্যাসের ভিত্তি হচ্ছে এস্টেট। এটি সামন্ত ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। এখানে সামন্ত প্রভু এবং ভূমিদাস ছাড়াও বেশকিছু মধ্যস্বত্বভোগীদের মধ্যে স্তরবিন্যাস বিদ্যমান ছিল।

৩) **বর্ণপ্রথা (Caste system):** বর্ণপ্রথা হচ্ছে ভারতীয় সমাজের হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রচলিত স্তরবিন্যাস। বর্ণপ্রথায় প্রধানত চারটি পৃথক বর্ণের মধ্যে স্তরবিন্যাস রয়েছে। এগুলো হচ্ছে: ক) ব্রাহ্মণ খ) ক্ষত্রীয় গ) বৈশ্য এবং ঘ) শূদ্র।

৪) **সামাজিক শ্রেণি (Social class):** আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের স্তরবিন্যাসে শ্রেণি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পেশা, সম্পদ, ক্ষমতা ও মর্যাদার ভিত্তিতে সমাজে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণির উপস্থিতি লক্ষণীয়।

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের স্তরবিন্যাস: সামাজিক স্তরবিন্যাসের উপর্যুক্ত ধরনগুলো চিরন্তন ও সর্বজনীন। কিন্তু বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের স্তরবিন্যাসে নিজস্ব কিছু উপাদান রয়েছে যার ভিত্তিতে এখানে নানা ধরনের সামাজিক শ্রেণি ও স্তরবিন্যাস পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

ক) **ভূমি ও কৃষিভিত্তিক স্তরবিন্যাস:** গ্রামীণ সমাজে ভূমি ও কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে কতগুলো শ্রেণি তৈরি হয়। এসব শ্রেণির মধ্যে সুনির্দিষ্ট ব্যবধান বা অসমতা রয়েছে। এর ভিত্তিতে তৈরি হয় গ্রামীণ সমাজের ভূমি ও কৃষিভিত্তিক স্তরবিন্যাস। এখানকার ক্রমোচ্চ শ্রেণিগুলো হচ্ছে:

১) *ভূমিহীন দিনমজুর/কৃষিমজুর:* গ্রামীণ সমাজের ৪৭.৫ শতাংশ মানুষ ভূমিহীন (বিবিএস ২০১০)। এদের একটি বড় অংশ কৃষিমজুর বা দিনমজুর হিসেবে জীবীকা নির্বাহ করেন। এদের কোনো ব্যক্তিগত সম্পদ নেই। যে কারণে তারা সমাজে কোনো উঁচু পদমর্যাদা ভোগ করেন না। তারা মূলত স্বল্প মজুরিতে ধনী ও মাঝারি কৃষকের জমিতে শ্রম বিক্রির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন।

২) *প্রান্তিক চাষী:* প্রান্তিক চাষীরা স্বল্প ভূমির মালিক এবং তারা অন্যের জমি চাষাবাদ করে। নিজের আবাদী জমিতেই তারা তাদের শ্রম বিনিয়োগ করেন। গ্রামীণ সমাজে এ ধরনের মানুষের সংখ্যা ভূমিহীনের পরে।

৩) *ক্ষুদ্র চাষী:* প্রান্তিক চাষীদের পরই ক্ষুদ্র চাষীদের অবস্থান। যারা নিজের জমি ছাড়াও অন্যের জমি চাষাবাদ করে জীবীকা নির্বাহ করেন। প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র চাষীকে বর্গা চাষী বলেও উল্লেখ করা হয়।

৪) *মাঝারি কৃষক:* যে কৃষকের ধনী কৃষকের তুলনায় কম জমি আছে, যেখানে চাষাবাদের মাধ্যমে তার পরিবারের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব তাকে মাঝারি কৃষক বলে। গ্রামীণ সমাজে এ ধরনের কৃষকের সংখ্যা এবং প্রভাব বিশেষভাবে উল্লখযোগ্য।

৫) *ধনী কৃষক:* গ্রামীণ সমাজে ধনী কৃষকের সংখ্যা হাতেগোনা। তবে তারা প্রভাবশালী। যে কৃষকের নিজের পর্যাপ্ত জমি আছে যার কিছু অংশ তিনি নিজে আবাদ করেন আবার কিছু অংশ প্রান্তিক/ক্ষুদে কৃষকের মাধ্যমে বর্গা-প্রথায় আবাদ করেন। এ শ্রেণির মানুষ সমাজে যেমন প্রভাবশালী, তেমনি বিত্তশালীও। কারণ, এরা রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অনেক শক্তিশালী।

৬) *অনুপস্থিত ভূমি মালিক:* নগরায়ন ও আধুনিকায়নের ফলে অনেকে শহরে বসবাস করেন। এদের কেউ চাকরি করেন, কেউবা ব্যবসা। কিন্তু উত্তরাধিকার কিংবা ক্রয়সূত্রে এদের অনেকে পর্যাপ্ত কৃষি ভূমির মালিক। বিভিন্ন পার্বণ, উৎসব কিংবা উপলক্ষে তারা গ্রামে যান এবং নানা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

খ) **বংশগত বা বর্ণভিত্তিক স্তরবিন্যাস:** গ্রামীণ সমাজের স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে বংশগত বা বর্ণভিত্তিক স্তরবিন্যাস একসময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তবে বর্তমানের এর প্রভাব অনেক কম। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন বংশ বা জ্ঞাতিগোষ্ঠী বিশেষ প্রভাব ও মর্যাদার অধিকারী। তারা অন্যদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। যেমন কোনো একটি অঞ্চলে 'সৈয়দ' বা 'চৌধুরী' বংশ নিজেদেরকে শ্রেয়তর বিবেচনা করতে পারে। আবার অন্য একটি অঞ্চলে 'খান' কিংবা 'শেখ' বংশের আধিপত্য দেখা যায়। হিন্দু ধর্মে চতুর্বণ প্রথা তাদের পেশা ও মর্যাদা নির্ধারণ করে দেয়। বংশ, বর্ণ কিংবা জ্ঞাতিগোষ্ঠী মানুষকে বিভিন্ন স্তরে বিভাজিত করে, পরস্পরের মধ্যে অসমতা তৈরি হয়। ফলে বিয়েসহ যেকোনো সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও দৃশ্যমান পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

গ) **ধর্মভিত্তিক স্তরবিন্যাস:** বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। পাশাপাশি এখানে হিন্দু, খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ ধর্মের মানুষও বসবাস করে। ধর্মীয় পরিচয় মানুষের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে। মুসলমান-হিন্দু, আশরাফ-আতরাফ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র ইত্যাদি বিভাজন তৈরি হয় ধর্মের ভিত্তিতে। অনেক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে ধর্ম এখনো মানুষের সামাজিক স্তরায়নে প্রভাব বিস্তার করে।

ঘ) **শিক্ষা ও পেশাভিত্তিক স্তরবিন্যাস:** শিক্ষা এবং কৃষি বহির্ভুত পেশা গ্রামীণ সামাজিক স্তরবিন্যাসে এখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গ্রামে এখন নিরক্ষর, স্বল্পশিক্ষিত, শিক্ষিত এবং উচ্চ শিক্ষিত শ্রেণি-পেশার জনগোষ্ঠী বিদ্যমান। শিক্ষিত এবং উচ্চ শিক্ষিত শ্রেণির অনেকে কৃষি বহির্ভুত পেশায় নিয়োজিত। বিশেষ প্রভাব বিস্তারকারী পেশার কে কেউ কখনো কখনো সাধারণ মানুষের উপর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা করেন। সুতরাং গ্রামের সামাজিক স্তরবিন্যাসের অন্যতম ধরন হিসেবে শিক্ষা এবং পেশা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ঙ) **ক্ষমতা, রাজনীতি ও সম্পদভিত্তিক স্তরবিন্যাস:** শিক্ষা ও পেশার পাশাপাশি ক্ষমতা, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, এবং ধন-সম্পদ গ্রামীণ সামাজিক স্তরবিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যিনি অনেক অর্থ-বিত্তের মালিক তিনি গ্রামের সবার উপর কর্তৃত্ব খাটাতে পারেন। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতা, জনপ্রতিনিধি এবং তাদের নিকটাত্মীয়রা বিশেষ ক্ষমতা ও মর্যাদা প্রদান করে। সুতরাং ক্ষমতা, রাজনীতি ও ধন-সম্পদ গ্রামীণ সমাজের স্তরবিন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

গ্রামীণ সমাজের স্তরবিন্যাসের উপাদানসমূহ

উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে গ্রামীণ সমাজের স্তরবিন্যাসের বিভিন্ন উপাদান এখানে তুলে ধরা হলো:

১) **কৃষিজমি:** কৃষি জমির মালিকানার ভিত্তিতে গ্রামীণ সমাজে স্তরবিন্যাস তৈরি হয়। ভূমিহীন, প্রান্তিক কৃষক, ক্ষুদে কৃষক, মাঝারি কৃষক এবং বড় কৃষক গ্রামের প্রধান প্রধান শ্রেণি যার মূলে রয়েছে ভূমির মালিকানা।

২) **জ্ঞাতিগোষ্ঠী:** বংশ, বর্ণ বা জ্ঞাতিগোষ্ঠী গ্রামীণ সমাজে স্তরবিন্যাস তৈরি করে। সম্ভ্রান্ত এবং ঐতিহ্যবাহী বংশ, যেমন-হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, বৈশ্য, শূদ্র মূলত বংশগত বিভাজন।

৩) **ধর্ম:** ধর্মের ভিত্তিতেও গ্রামীণ সমাজে সামাজিক স্তরবিন্যাস তৈরি হয়। যেমন মুসলিম সমাজে আশরাফ ও আতরাফ অন্যদিকে হিন্দু সমাজে রয়েছে ব্রাহ্মণ-শূদ্র ইত্যাদি।

৪) **শিক্ষা:** গ্রামে নিরক্ষর, স্বল্প শিক্ষিত, শিক্ষিত এবং উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি বা পরিবারের মধ্যে শ্রেণি এবং মর্যাদাগত পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং গ্রামীণ সমাজের সামাজিক স্তরবিন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে শিক্ষা।

৫) **সম্পদ ও অর্থবিত্ত:** সম্পদ এবং অর্থবিত্ত গ্রামীণ সামাজিক স্তরবিন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর মাধ্যমে সমাজে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণি গঠিত হয়।

৬) **পেশা:** গ্রামের সনাতন পেশা হচ্ছে কৃষি। নগদ অর্থ উপার্জন, সামাজিক সম্মান ও ক্ষমতা কৃষি বহির্ভূত পেশাকে ক্রমশ জনপ্রিয় করেছে। পেশাগত ক্ষমতা, মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা গ্রামের সামাজিক স্তরবিন্যাসে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৭) **ক্ষমতা, রাজনীতি:** ক্ষমতাসীন রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সমাজে বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করে থাকে। ক্ষমতা এবং রাজনীতি সমাজে ক্ষমতাশালী এবং ক্ষমতাহীন শ্রেণি তৈরি করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	**বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের স্তরবিন্যাসের ধরনসমূহ চিহ্নিত করুন। সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

স্তরবিন্যাস সমাজের একটি চিরন্তন বিষয়। নানা উপাদানের ভিত্তিতে সমাজের মানুষের মধ্যে অসমতা তৈরি হয়। এর থেকে তৈরি হয় সামাজিক স্তরবিন্যাস। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে ভূমি, অর্থ-সম্পত্তি, পেশা, বংশ মর্যাদা ইত্যাদি ধরন এবং উপাদানগুলো বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "স্তরবিন্যাস হচ্ছে সর্বজনীন, চিরন্তন" – কে বলেছেন?
(ক) ম্যাকাইভার (খ) কার্ল মার্কস
(গ) ডেভিস ও মুর (ঘ) হার্বার্ট স্পেনসার

২। হিন্দু সমাজে প্রধানত কয়টি বর্ণ রয়েছে?
(ক) দু'টি (খ) তিনটি
(গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

পাঠ-৬.৩ গ্রামীণ সমাজের ক্ষমতা কাঠামো
Power Structure of Rural Society

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ক্ষমতা কাঠামো সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;

মুখ্য শব্দ	ক্ষমতা কাঠামো, ভূমি মালিকানা, বংশ মর্যাদা ও জ্ঞাতি সম্পর্ক, শিক্ষা, পেশা, রাজনৈতিক প্রভাব, ডিলারশিপ।

ক্ষমতা হচ্ছে এক প্রকার শক্তি, যার মাধ্যমে অন্যের সিদ্ধান্ত, ইচ্ছা, মতামত, এমনকি আচার-আচরণকে প্রভাবিত করা যায়। অন্যের উপর নিজের সিদ্ধান্ত, ইচ্ছা বা মতামতকে চাপিয়ে দেয়ার সামর্থ্যই ক্ষমতা। আর ক্ষমতা কাঠামো হচ্ছে ক্ষমতা প্রয়োগের প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থা। অর্থাৎ যে প্রক্রিয়া বা কাঠামোর মধ্য দিয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায় তাকে ক্ষমতা কাঠামো (Power structure) বলে।

গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো

গ্রামীণ সমাজে ক্ষমতা প্রয়োগের যে শ্রেণি কাঠামো এবং ব্যবস্থা বিদ্যমান তাকে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো বলে। ড. আতিউর রহমান তাঁর *'বাংলাদেশে উন্নয়নের সংগ্রাম'* গ্রন্থে ক্ষমতা কাঠামো সম্পর্কে বলেছেন, "শ্রেণিসমূহের অবস্থান, পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এদের ভূমিকা ইত্যাদি প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ সমাজে সামাজিক শক্তিসমূহ যে কাঠামোর মধ্য দিয়ে বিকশিত হয় তাকে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো বলা যেতে পারে।"

গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থা, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থায় কারা প্রভাব ও কর্তৃত্ব স্থাপন করে, কিভাবে এ কর্তৃত্ব বিকশিত হয়– এসব মিলিয়ে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো তৈরি হয়। ক্ষমতার যেসব উপাদান উল্লিখিত বিষয়গুলো নির্ধারণ করে সেসব উপাদানের সমন্বয়ে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

গ্রামীণ ক্ষমতার ব্যবহার, প্রয়োগ এবং বিকাশ হয় মূলত গ্রামীণ শ্রেণি কাঠামোর মাধ্যমে। এক্ষেত্রে এলিট শ্রেণি ক্ষমতার চর্চা করেন। সাধারণ মানুষের উপর ক্ষমতার প্রয়োগ হয়। অর্থাৎ ক্ষমতা কাঠামো বিন্যাসে এক শ্রেণি নিয়ন্ত্রক বা শাসকের ভূমিকা পালন করেন, অন্য শ্রেণি নিয়ন্ত্রিত বা শাসিত হয়। গ্রামীণ সমাজে ক্ষমতার চর্চা ও প্রয়োগকে কেন্দ্র করেই গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো গড়ে ওঠে।

গ্রামীণ ক্ষমতার উপাদান

সাধারণত গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় যেসব শক্তি বা উপকরণ ব্যক্তিবিশেষকে ক্ষমতার অধিকারী করে তোলে সেগুলোকে গ্রামীণ ক্ষমতার উপাদান বলে। গ্রামীণ কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে ভূমি হচ্ছে ক্ষমতা কাঠামোর মূল ভিত্তি। তবে একবিংশ শতকে ভূমি ছাড়াও নগদ অর্থ, শিক্ষা, পেশা, ক্ষমতাসীন রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্টতা গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর প্রভাবশালী উপাদান হিসেবে বিবেচিত। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, অর্থনৈতিক শক্তিই ক্ষমতার কাঠামোর প্রধান নিয়ামক। সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর উপাদানেও পরিবর্তন এসেছে। এখানে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর পরিবর্তিত উপাদান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

ক) **ষাটের দশক:** ষাটের দশকে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় ভূমিতে ব্যক্তিমালিকানা, ধর্ম, জনপ্রতিনিধিত্ব, বংশ মর্যাদা, জ্ঞাতিত্ব ও বর্ণপ্রথা, জীবনযাত্রার মান, সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এছাড়া মূল্যবোধ, প্রথা, সমাজ, সংস্কৃতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। ওঝা, ফকির, পির-মাশায়েখদেরও সমাজের উপর কর্তৃত্ব পরিলক্ষিত হতো।

খ) **সত্তরের দশক:** সত্তরের দশকে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় বংশ মর্যাদা ও জ্ঞাতি সম্পর্ক, কৃষি উন্নয়নে আধুনিক উপকরণ যেমন সেচযন্ত্রের মালিকানা, সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদির ডিলারশীপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ভূমিকা

পালন করেছিল। এছাড়া ভূমির মালিকানা, শহরের সাথে যোগাযোগ, ভূমি জরিপের সাথে সংশ্লিষ্টতা, চর দখলের ক্ষমতা ইত্যাদি গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর উপাদান হিসাবে বিবেচিত।

গ) **আশির দশক :** আশির দশকে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর উপাদান হিসেবে বংশ মর্যাদা, জ্ঞাতিগোষ্ঠীর প্রভাব, ভূমি মালিকানা, স্থানীয় সরকারের সাথে সংশ্লিষ্টতা, সমবায় সমিতি, পুলিশ ও প্রশাসনের সাথে সম্পর্ক, ডিলারশিপ, চাকরি এবং রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি ও তার পরিবার, ব্যবসায়ী, আইন প্রয়োগকারী ব্যক্তিবর্গ, ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী, দালাল প্রমুখ গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্টতা এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণও গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর অপরিহার্য উপাদান। তবে পূর্ব থেকে প্রচলিত মহাজন, সুদের কারবারি, টাউট এবং মাতব্বরদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ এখনো অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এনজিও কর্মী, ফতোয়াবাজ শ্রেণির লোকেরাও গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠোমোয় প্রভাব বিস্তার করে থাকে। প্রবীণ এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ এখনো সমীহের পাত্র হিসেবে বিবেচিত।

আশির দশকের পর থেকে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় কৃষি বহির্ভূত আয়, নগদ টাকা, শিক্ষা, বিভিন্ন সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্টতা ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। গ্রামে অবস্থান করে শিক্ষিত মানুষের কৃষি বহির্ভুত পেশায় যুক্ত হওয়ার প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসায় শিক্ষকতা, ব্যাংকে চাকরি, উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরে চাকরি এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুযোগও আগের থেকে অনেক বেশি অবারিত। শিক্ষিত পেশাজীবীরা আধুনিক গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর প্রভাবশালী গোষ্ঠী। ইমাম, মৌলভি, মাওলানা, পুরোহিত, ব্রাহ্মণ প্রমুখের সামাজিক মর্যাদা, প্রভাব ও ক্ষমতা সর্বজনবিদিত। গ্রামীণ সমাজে মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের পরিবার এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরও বিশেষ সম্মান এবং প্রভাব রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে গ্রামের যারা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মালিক কিংবা এর ব্যবহার জানেন তারাও গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় স্থান করে নিয়েছেন। কেউ পর্যাপ্ত তথ্য দিতে পারলেও মানুষ তাকে গুরুত্ব দেয়। ইন্টারনেট ব্যবহারকারী এবং স্যাটেলাইট চ্যানেলের মালিকদের প্রভাবশালী মনে করা হয়। যুব সমাজও গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

ড. আতিউর রহমান তাঁর 'বাংলাদেশে উন্নয়নের সংগ্রাম' নামক গ্রন্থে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর স্বাধীন ও অধীন চলকের ভিত্তিতে মোট ১৯টি উপাদানের উল্লেখ করেছেন। এগুলো হচ্ছে: ১। ভূমির মালিকানা; ২। অর্থনৈতিক শক্তি; ৩। সমাজে নেতৃত্ব; ৪। বংশ মর্যাদা ও নেতৃত্ব; ৫। বৃহৎ জ্ঞাতি গোষ্ঠীর নেতৃত্ব; ৬। ব্যক্তিগত গুণাবলি; ৭। রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক; ৮। রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্ক; ৯। ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিত্ব; ১০। শহরের সাথে যোগাযোগ; ১১। সমবায় সমিতি / (এন. জি. ও.); ১২। গ্রামীণ কর্মসংস্থানগুলোর নেতৃত্ব; ১৩। জনগণের অংশ বিশেষের নেতৃত্ব; ১৪। আধুনিক প্রযুক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ; ১৫। অর্থঋণ প্রদান; ১৬। চাকরি; ১৭। শিক্ষা; ১৮। সন্ত্রাস সৃষ্টির ক্ষমতা এবং ১৯। জনগণের সমষ্টিবদ্ধতা।

বস্তুত, এই ১৯টি উপাদানই গ্রামীণ সমাজের ক্ষমতার মূল ভিত্তি। তবে এ উপাদানগুলো প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোকে সমৃদ্ধ এবং একইসাথে পরিবর্তনশীল করেছে। এর মধ্যে ভূমির মালিকানা মালিকানা প্রায় সব সময়ই মৌলিক উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। যদিও সম্প্রতি জমি ছাড়াও নগদ অর্থ, ক্ষমতাশালী চাকরি ইত্যাদি অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	**বাংলাদেশের গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর উপাদানগুলো চিহ্নিত করুন। সময়: ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজ যেমন পরিবর্তনশীল, তেমনি সমাজের ক্ষমতা নির্ধারণকারী উপাদানেরও পরিবর্তন ঘটে। ষাট, সত্তর এবং আশির দশকের সাথে আজকের ক্ষমতা কাঠামোর উপাদানে পার্থক্য রয়েছে। তবে কিছু উপাদান আছে চিরন্তন, যেমন ভূমির মালিকানা, অর্থবিত্ত ইত্যাদি। আবার আধুনিক ক্ষমতা কাঠামোয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মত নতুন নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে যা সমাজ কাঠামোকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "বাংলাদেশে উন্নয়নের সংগ্রাম" গ্রন্থের রচয়িতা কে?
(ক) ড. আতিউর রহমান (খ) আকবর আলি খান
(গ) থিওডর শানিন (ঘ) ড. ইকবাল হুসাইন

২। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর সত্তরের দশকের প্রভাবশালী উপাদান কোনটি?
(ক) শিক্ষা ও পেশা (খ) ব্যাংকিং ব্যবস্থা
(গ) আই.সি.টি'র সক্ষমতা (ঘ) বংশ মর্যাদা ও জ্ঞাতিত্ব

৩। ড. আতিউর রহমান স্বাধীন চলক এবং অধীন চলকের সমন্বয়ে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর কতটি উপাদানের কথা বলেছেন?
(ক) ১০টি (খ) ১৫টি
(গ) ১৯টি (ঘ) ২৬টি

৪। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় প্রভাব বিস্তার করতে পারেন–
(i) ভূমি মালিক (ii) শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা (iii) টাউট, দালাল, চর দখলকারী
সঠিক উত্তর কোনটি?
(ক) i (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.৪ বাংলাদেশের নগর সমাজ
Urban Society of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- নগর সমাজ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- নগর সমাজের বৈশিষ্ট্য এবং উপাদান বর্ণনা করতে পারবেন;

মুখ্য শব্দ	নগর, নগর সমাজ, জনসংখ্যা, কৃষিবহির্ভুত পেশা, আধুনিক সংস্কৃতি, শিল্প-বাণিজ্য।

সাধরণত নগর বলতে বুঝায় একটি ঘনবসতিপূর্ণ জনপদ যেখানে কৃষিবহির্ভুত পেশার আধিক্য রয়েছে। আধনিক সভ্য সমাজের অনিবার্য এবং অপরিহার্য জনপদ হচ্ছে নগর। ব্যবসায়-বাণিজ্য, শাসন ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড, তীর্থস্থানকে ঘিরে বিশ্বের অনেক প্রাচীন শহর বা নগর গড়ে উঠেছিল। তবে আধুনিক নগর সমাজে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্প ও প্রযুক্তি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা, উন্নত ও প্রায়োগিক শিক্ষা ব্যবস্থা, বিলাসবহুল বাসস্থান পরিলক্ষিত হয়।

নগর এবং নগর সমাজ

'নগর' এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে Urban, City, Town ইত্যাদি প্রচলিত। পাকা ভবন, প্রশস্ত পাকা রাস্তা, মানুষের কোলাহল, যন্ত্র নির্ভর গতিশীল জীবন নিয়ে গড়ে উঠে নগর। কোনো জনপদকে নগর, শহর বা পৌর অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হলে সেখানে উচ্চমাত্রার জনসংখ্যা এবং কৃষি বহির্ভুত পেশার আধিক্য থাকতে হয়। সমাজবিজ্ঞানী Dr. William Munro বলেছেন, বিপুল জনগোষ্ঠী, স্বল্প পরিসরের মধ্যে অসংখ্য বাসস্থান, স্বায়ত্তসাশিত পৌর কর্তৃপক্ষ, নানাবিধ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং জীবিকার তাগিদে ছুটে চলা মানুষের ব্যস্ত জীবন নিয়ে গড়ে ওঠে নগর সমাজ।

Louis Wirth এর মতে, নগর হল সামাজিক দিক হতে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ মানুষের তুলনামূলকভাবে বড়, ঘন এবং স্থায়ী বাসস্থানের অঞ্চল। Alvin Boskoff নগর সমাজের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। এগুলো হচ্ছে: ক) শিল্প-বাণিজ্য এবং বৃত্তি সম্পর্কীয় অকৃষি পেশার আধিক্য, খ) নিয়মতান্ত্রিক শ্রমবিভাজন, গ) জনসখ্যার অত্যধিক ঘনত্ব এবং ঘ) জ্ঞাতি সম্পর্কের বন্ধনহীন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ।

নগর সমাজের সাথে জনবসতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তবে একটি নির্দিষ্ট জনপদে ঠিক কত মানুষ বসবাস করলে তাকে 'নগর' বলা হবে দেশ ও অঞ্চলভেদে এর তারতম্য রয়েছে। যেমন যুক্তরাষ্ট্র, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে একটি অঞ্চলে ২৫০০ মানুষ বসবাস করলে তাকে শহর বলা যায়। গ্রিস ও স্পেনে কোনো অঞ্চলকে শহর হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে সেখানে ১০ হাজার মানুষের বসবাস থাকতে হবে। বাংলাদেশে কোনো নির্দিষ্ট এলাকাকে শহর (পৌরসভা) হতে হলে পৌরসভা আইন ২০০৯ (সংশোধন ২০২২) অনুযায়ী নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ করতে হয়:

ক) মোট জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশকে অকৃষি পেশায় সম্পৃক্ত থাকতে হবে;
খ) ৩৩ শতাংশ অকৃষি ভূমি থাকতে হবে;
গ) মোট জনসংখ্যা হতে হবে ৫০ হাজার এবং প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ন্যূনতম ২০০০ মানুষের বসবাস থাকতে হবে।

সুতরাং নগর হচ্ছে স্বল্প পরিসরে বিপুলসংখ্যক অকৃষি পেশার মানুষের স্থায়ী বসবাসের স্থান। ব্যাপক ঘনত্বের এ বিশাল জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবন-জীবিকা, পারস্পরিক সম্পর্ক, উৎপাদন ব্যবস্থা, রীতিনীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নগর সমাজ।

নগর সমাজের বৈশিষ্ট্য এবং উপাদান

নগর সমাজের বৈশিষ্ট্য এবং উপাদানকে পৃথক করা মুশকিল। বস্তুত যার মাধ্যমে নগর সমাজকে চিহ্নিত করা যায় সেগুলোই যুগপৎভাবে নগর সমাজের বৈশিষ্ট্য এবং উপাদান। এ দু'এর সমন্বয়ে নিম্নে নগর সমাজ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১) **নির্দিষ্ট এলাকা:** প্রতিটি শহরই একটি নির্দিষ্ট পরিসরে গড়ে ওঠে। শহর, নগর বা পৌর এলাকার একটি নির্দিষ্ট সীমানা (Boundary) থাকে।

২) **বিপুল জনসংখ্যা এবং উচ্চ ঘনত্বের জনবসতি:** শহর বা নগর হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় বিপুলসংখ্যক মানুষের বসবাস। সেখানে জনসংখ্যার ঘনত্বও অনেক বেশি পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশে শহর বা পৌর এলাকা হতে হলে সেখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কমপক্ষে ১৫০০ জন করে মোট ৫০ হাজার বা তারচেয়ে অধিক মানুষ বসবাস করতে হয়।

৩) **কৃষি বহির্ভুত পেশা এবং অকৃষি ভূমির প্রাধান্য:** নগর বা পৌর এলাকার অধিকাংশ মানুষ কৃষি বহির্ভুত পেশায় নিয়োজিত। মোট জমির এক তৃতীয়াংশ অকৃষি খাতে ব্যবহৃত হতে হবে।

৪) **শিল্প, বাণিজ্য, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক কার্যক্রমের আধিক্য:** নগরে কৃষি বহির্ভুত পেশা হিসেবে শিল্প, বাণিজ্য, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের আধিক্য রয়েছে।

৫) **শিক্ষা, চিকিৎসাসহ নানাবিধ নাগরিক সুবিধা:** শহরাঞ্চলে মানসম্মত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা এবং বিশেষায়িত উচ্চ শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। চিকিৎসাসেবাসহ অন্যান্য নাগরিক সুবিধাও মানুষের হাতের নাগালে থাকে।

৬) **সুবিন্যস্ত শ্রম বিভাজন:** নগর সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থায় সুবিন্যস্ত শ্রম বিভাজন পরিলক্ষিত হয়। আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের কারণে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় শ্রম বিভাজনের প্রতিফলন ঘটে।

৭) **পাকা ভবন, পাকা রাস্তা-ঘাট এবং পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা:** বাহ্যিকভাবে শহর চেনার প্রথম ও প্রধান উপায় হচ্ছে এর অবকাঠামো। সুউচ্চ পাকা ভবন, পাকা ও প্রশস্ত রাস্তা, পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা শহরে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ও বৈশিষ্ট্য।

৮) **বিদ্যুৎ এবং যন্ত্রের উপর নির্ভরশীলতা:** নগর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিদ্যুৎ এবং প্রযুক্তিভিত্তিক আধুনিক উপকরণের উপর নির্ভরশীলতা। টিভি, ফ্রিজ, ফ্যান, এসি, ওভেন, গাড়ি, কম্পিউটার সবকিছু নগর জীবনের জন্য অপরিহার্য।

৯) **শিথিল সামাজিক সম্পর্ক:** নগর সমাজে মানুষের জ্ঞাতি সম্পর্ক খুব শিথিল থাকে। এখানে নানা জায়গার , নানা পেশার, নানা বর্ণের মানুষ পাশাপাশি বসবাস করে। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। কেউ কারো উপর খুব বেশি নির্ভরশীল নয়। পরস্পরের প্রতি দায়বদ্ধতাও কম। ফলে সেখানে পরস্পরের সামাজিক সম্পর্কও খুব শিথিল।

১০) **উন্নত, গতিশীল ও নিরাপদ জীবনযাপন:** নগর সমাজের অধিবাসীরা গ্রামের তুলনায় উন্নত, গতিশীল ও নিরাপদ জীবনযাপনে অভ্যস্ত। তাদের পেশা, পারিবারিক জীবন, জীবনমান, কর্মকাণ্ড ইত্যাদি উন্নত, আধুনিক এবং গতিশীল।

১১) **বস্তি সমস্যা:** নগর জীবনের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো বস্তি সমস্যা। নানা কারণে গ্রাম থেকে আসা স্বল্প আয়ের মানুষেরা শহরের পরিত্যাক্ত কিংবা অব্যবহৃত জায়গায় অপরিকল্পিতভাবে বসতি গড়ে তোলে। শহরের দিনমজুর, নির্মাণশ্রমিক, পোশাক শ্রমিক, গৃহকর্মী, রিক্সাচালকদের অধিকাংশ বস্তিতে বসবাস করে।

১২) **আধুনিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল:** গ্রামের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক চর্চার বিপরীতে শহরে আধুনিক এবং ভিনদেশি সংস্কৃতির চর্চা ও আধিক্য বেশি। বিনোদন, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যভ্যাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে আধুনিক সংস্কৃতির চর্চা পরিলক্ষিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	**বাংলাদেশের নগর সমাজের বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করুন। সময়: ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার এক অনিবার্য বাস্তবতা নগর জীবন। কৃষিবহির্ভুত পেশার বিপুল জনগোষ্ঠী শহরের সীমিত পরিসরে বসবাস করে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্যাস, বিদ্যুৎ, যন্ত্রপাতিসহ নানা নাগরিক সুবিধা নগর জীবনকে স্বাতন্ত্র্য দান করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পৌরসভা আইন ২০০৯ অনুযায়ী শহরের কত ভাগ মানুষ কৃষি বহির্ভুত পেশায় নিয়োজিত থাকবে?
(ক) এক চতুর্থাংশ (খ) তিন চতুর্থাংশ (গ) এক তৃতীয়াংশ (ঘ) দুই তৃতীয়াংশ

২। শহরাঞ্চলে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ন্যূনতম কত মানুষ বাস করে?
(ক) ১০০০ জন (খ) ১২০০ জন (গ) ১৫০০ জন (ঘ) ১৮০০ জন

পাঠ-৬.৫ নগর সমাজের স্তরবিন্যাস ও ক্ষমতাকাঠামো
Stratification and Power Structure of Urban Society

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- নগর সমাজের স্তরবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- নগর সমাজের ক্ষমতা কাঠামো বিশ্লেষণ করতে পারবেন;

মুখ্য শব্দ	স্তরবিন্যাস, ক্ষমতা কাঠামো, মালিকানা, পেশা, রাজনীতি, নেতৃত্ব, শিক্ষা, বসবাসের এলাকা।

বর্তমান ইউনিটের পাঠ ৬.২ এ গ্রামীণ সমাজের স্তরবিন্যাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে সামাজিক স্তরবিন্যাসের মৌলিক ধারণাও ব্যক্ত করা হয়েছে। সাধারণত সামাজিক স্তরবিন্যাস হচ্ছে সমাজের মানুষ পেশা, শিক্ষা, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ইত্যাদিও উঁচু-নিচু বিন্যাস বা বিভক্তি। বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাগত উপাদানের ভিত্তিতে সমাজের কিছু মানুষ অপেক্ষাকৃত উঁচু শ্রেণিতে অবস্থান কওে; আবার কিছু মানুষ অপেক্ষাকৃত নিচু শ্রেণিতে অবস্থান করে। সমাজস্থ মানুষের উঁচু-নিচু শ্রেণিতে অবস্থান করাই সামাজিক স্তরবিন্যাস।

নগর সমাজের স্তরবিন্যাস

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রধান চারটি ধরন হচ্ছে ১) দাসপ্রথা, ২) এস্টেট, ৩) বর্ণপ্রথা এবং ৪) সামাজিক শ্রেণি। বর্তমান নগর সমাজে দাসপ্রথা এবং এস্টেট ব্যবস্থা নেই। বর্ণপ্রথা মূলত হিন্দু সমাজ কাঠামোতে বিদ্যমান। গ্রামে বসবাসকারী হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা যতটা বর্ণপ্রথা মেনে চলেন সে তুলনায় শহরের বর্ণপ্রথা কিছুটা শিথিল। শহরে বসবাসকারী হিন্দু ধর্মের অনেকেই বর্ণপ্রথা পরিহার করেন। নগর সমাজের স্তরবিন্যাসে সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধরন হচ্ছে সামাজিক শ্রেণি। নানা উপাদানের ভিত্তিতে নগর সমাজের মানুষের মধ্যে শ্রেণি বিভাজন পরিলক্ষিত হয়। এখানে নগর সমাজের শ্রেণিভিত্তিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১) **পেশাভিত্তিক সামাজিক স্তরবিন্যাস:** শহরে কৃষিবহির্ভুত নানা পেশার মানুষ বসবাস করে। তাদের মধ্যে ক্ষমতা, মর্যাদা এবং শ্রেণিগত ভেদাভেদ রয়েছে। যেমন ক) উচ্চপদস্থ (ক্ষমতাশালী) সরকারি কর্মকর্তা এবং তাদেও অধীনস্ত সাধারণ সরকারি কর্মচারি; খ) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক বনাম সাধারণ কর্মচারি গ) শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক বনাম শ্রমিক শ্রেণি।

২) **বাসস্থানের ভিত্তিতে সামাজিক স্তরবিন্যাস:** বসবাসের ভিত্তিতে শহরের মানুষকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়; বাড়িওয়ালা এবং ভাড়াটিয়া। চাকরির সুবাদে অনেকে সরকারি বাসায় থাকেন। এরাও একটি বিশেষ শ্রেণি। শহরে অনেক ছিন্নমূল মানুষও রয়েছে যারা বস্তিতেও ঠাঁই না পেয়ে ফুটপাথ, স্টেশন, রেললাইন প্রভৃতি স্থানে (ভাসমান) রাত্রি যাপন করে। বাসস্থানের ভিত্তিতে এরা শহরের নিম্নবর্গের মানুষ।

৩) **বসবাসের এলাকার ভিত্তিতে সামাজিক স্তরবিন্যাস:** শহরে কিছু অভিজাত এলাকা রয়েছে। যেমন ঢাকা শহরের গুলশান, বারিধারা, বনানী, ধানমণ্ডি এলাকায় বসবাসকারীরা নিজেদেরকে অভিজাত এবং উচ্চবিত্ত শ্রেণির বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু যারা বস্তি, ঘিঞ্জি এবং অনুন্নত এলাকায় বসবাস করেন তাদের বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষ।

৪) **শিক্ষার ভিত্তিতে সামাজিক স্তরবিন্যাস:** শিক্ষার ভিত্তিতে শহরে নিরক্ষর, স্বল্পশিক্ষিত, শিক্ষিত এবং উচ্চশিক্ষিত শ্রেণির মানুষ পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষার ফলে তাদের পেশা এবং সামাজিক মর্যাদাও পৃথক হয়ে থাকে।

৫) **আর্থ-সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে সামাজিক স্তরবিন্যাস:** অর্থবিত্ত, সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে শহরে উচ্চবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, বিত্তহীন এবং ভিক্ষুক ও ভবঘুরে শ্রেণির উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। সামাজিক সম্মান, মর্যাদা ও ক্ষমতার ভিত্তিতে এ শ্রেণিগুলোর দৃশ্যমান অবস্থান সর্বজনবিদিত।

নগর সমাজের ক্ষমতা কাঠামো

ক্ষমতা কাঠামোর উপাদানের সাথে নগর সমাজের সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিভিন্ন উপাদানের সাদৃশ্য রয়েছে। বস্তুত প্রতিটি সমাজেই এমনকিছু উপাদান থাকে যা ওই সমাজের স্তরবিন্যাস, শ্রেণি কাঠামো এবং ক্ষমতা কাঠামো নির্ধারণ করে। নিম্নে নগর সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর বিভিন্ন উপাদান তুলে ধরা হলো।

১) **পেশাভিত্তিক ক্ষমতা:** পেশাভিত্তিক ক্ষমতার শীর্ষে রয়েছেন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, যারা কর্তৃত্বের অধিকারী। প্রশাসন, পুলিশ ও বিচার বিভাগ এবং সশস্ত্র বাহিনীর উর্ধতন কর্মকর্তাগণ ক্ষমতা প্রয়োগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সরকারি সেবা সংস্থা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তাগণও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। পেশাগতভাবে সাংবাদিক এবং আইনজীবীদের প্রভাবও সমাজে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

২) **মালিকানার ভিত্তিতে ক্ষমতা:** শহরে বাড়ি, গাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মালিকানা মানুষকে ক্ষমতায়িত করে। এগুলোর মালিকানা একদিকে যেমন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরিচায়ক, তেমনি অন্যের উপর নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব আরোপের উপায়।

৩) **রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ও জনপ্রতিনিধিত্ব:** রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ক্ষমতা কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। জাতীয় এবং স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিগণও ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের অধিকারী। রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকগণও নিজ নিজ মহল্লায় অনেক প্রভাবশালী। ক্ষমতাসীন ছাত্র ও যুব সংগঠনের নেতা-কর্মী-সমর্থকগণও ক্ষমতা কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।

৪) **শিক্ষার ভিত্তিতে ক্ষমতা:** অধিকাংশ ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ পেশাগত দিক থেকে ভালো অবস্থানে থাকেন। সম্মান এবং মর্যাদার দিক থেকেও তারা অগ্রগামী। সুতরাং উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ প্রায়শ ক্ষমতাশালী হয়ে থাকেন।

৫) **গণমাধ্যম এবং নাগরিক সমাজ:** নগর সমাজের ক্ষমতা চর্চা ও প্রয়োগের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে গণমাধ্যম এবং নাগরিক সমাজ। প্রিন্ট বা ইলেক্ট্রোনিক গণমাধ্যম এবং নাগরিক সমাজ জনমত গঠন এবং সরকারের নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ফলে গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দ বা ব্যক্তিবর্গ ক্ষমতার দিক থেকে যথেষ্ট প্রভাবশালী।

৬) **স্থায়ী বাসিন্দা:** শহরের বিভিন্ন মহল্লায় যারা দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করেন তারা অন্য অনেকের তুলনায় ক্ষমতাশালী। এদের অনেকে ওই এলাকায় পর্যাপ্ত নিজস্ব ভূমি, জ্ঞাতিগোষ্ঠী রয়েছে যা তাদেরকে বিশেষভাবে ক্ষমতায়িত করে।

৭) **অর্থ-সম্পদ:** অর্থ-বিত্তের ক্ষমতা সর্বজনীন। গ্রাম বা শহর যেকোনো স্থানে যিনি পর্যাপ্ত অর্থ-সম্পদের মালিক তিনি ক্ষমতারও অধিকারী। 'টাকার জোরে' তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন।

৮) **ব্যবসায়িক নেতৃত্ব:** নগর সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বণিক সমিতি, ব্যবসায়িক সংগঠন, দোকান মালিক সমিতি যেকোনো স্তরের নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ পরিসরে যথেষ্ট প্রভাবশালী।

৯) **ক্ষমতাধর ব্যক্তি বা সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্টতা:** আত্মীয়তা কিংবা পেশাগতভাবে কোনো ক্ষমতাধর ব্যক্তি বা সংগঠনের সাথে সম্পর্ক থাকলে অনেকে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে পারেন। কোনো মন্ত্রী-এমপি'র আত্মীয়, পুলিশ-র‍্যাবের সোর্স, পাসপোর্ট অফিসের দালাল, স্থানীয় ক্লাবের নেতা প্রমুখ নগর সমাজের ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারেন।

১০) **স্থানীয় মাস্তান:** মহল্লার ত্রাস সৃষ্টিকারী মাস্তানদের সবাই সমীহ করে। যারা মাস্তানি কিংবা চাঁদাবাজী করে তাদেরকে সবাই ভয় করে। সুতরাং অনৈতিক বা অবৈধ হলেও মাস্তা এবং চাঁদাবাজরা ক্ষমতা কাঠামোর অনিবার্য অংশীদার।

শিক্ষার্থীর কাজ	**নগর সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর উপাদানগুলো চিহ্নিত করুন।**	**সময়: ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

ক্ষমতা হচ্ছে কর্তৃত্ব আরোপের উপায়। নানা উপাদানের মাধ্যমে কর্তৃত্ব আরোপ বা ক্ষমতার প্রয়োগ করা যায়। নগর সমাজে পেশা, মালিকানা, রাজনীতি, নেতৃত্ব, অর্থ-সম্পদ ইত্যাদি ক্ষমতা প্রয়োগের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাসস্থানের ভিত্তিতে নগর সমাজের প্রধান দু'টি শ্রেণি (স্তর) কি কি?

(ক) মালিক-শ্রমিক (খ) আশ্রয়দাতা-আশ্রিত

(গ) উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্ত (ঘ) বাড়িওয়ালা-ভাড়াটিয়া

২। নিচের কোন শ্রেণিটি নগর সমাজে অধিকতর ক্ষমতাশালী?

(ক) কৃষিজমির মালিক (খ) উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা

(গ) বড় জ্ঞাতিগোষ্ঠী (ঘ) তরুণ বেকার সমাজ

পাঠ-৬.৬ গ্রাম ও নগর সমাজের তুলনামূলক চিত্র
Comparison between Rural and Urban Society

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- গ্রামীণ ও নগর সমাজের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	গ্রামীণ সমাজ, নগর সমাজ, সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য, উৎপাদন ব্যবস্থা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, পেশা, নাগরিক সুবিধা।

সমাজ বিকাশের গোড়ার দিকে শুধু কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল। বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজ ক্রমশ জটিল রূপ লাভ করেছে। উৎপাদন ব্যবস্থা, রাষ্ট্র, প্রশাসন, সংস্কৃতি ইত্যাদি উপাদান নগর সমাজের গোড়াপত্তন ঘটিয়েছে। আধুনিক সামাজিক কাঠামোর অনিবার্য দু'টি উপাদান হচ্ছে গ্রামীণ সমাজ এবং নগর সমাজ। গ্রামীণ সমাজ কৃষিভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতি এবং ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির ধারক। অন্যদিকে নগর সমাজের ভিত্তি হচ্ছে কৃষি বহির্ভুত শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা এবং আধুনিক সংস্কৃতি।

গ্রামীণ ও নগর সমাজের সাদৃশ্য

গ্রামীণ ও নগর সমাজের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য থাকলেও কিছু সাদৃশ্যও রয়েছে। যেমন:

১) **নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা:** গ্রামীণ ও নগর সমাজ উভয়ই একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে গড়ে ওঠে।

২) **জনসংখ্যা:** সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত হচ্ছে জনসংখ্যা। কম-বেশি জনসংখ্যা ব্যতীত কোনো সমাজই গড়ে উঠতে পারে না।

৩) **উৎপাদন ব্যবস্থা:** যেকোনো সমাজের নিজস্ব একটি উৎপাদন ব্যবস্থা রয়েছে। গ্রামীণ এবং নগর সমাজের ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে প্রযোজ্য।

৪) **সংস্কৃতি ও জীবন প্রণালী:** একটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব এবং আবহমান সংস্কৃতি ও জীবন প্রণালীকে ঘিরে ঐ সমাজ বিকশিত হয়। গ্রামীণ এবং নগর সমাজেরও রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবন প্রণালী।

৫) **অসমতা, স্তরবিন্যাস এবং শ্রেণি ও ক্ষমতা কাঠামো:** গ্রামীণ এবং নগর উভয় সমাজে অসমতা এবং স্তরবিন্যাস রয়েছে। শ্রেণিভিত্তিক সমাজে ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব আরোপ করার মানুষ যেমন আছেন, তেমনি ক্ষমতাহীন সাধারণ মানুষও বিদ্যমান। উভয় সমাজেই ধন-সম্পদের মালিকানা, শিক্ষা, পেশা, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততা শ্রেণি ও ক্ষমতা কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত।

৬) **গ্রামীণ সমাজ থেকেই নগর সমাজের উৎপত্তি:** প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল গ্রামীণ সমাজকে কেন্দ্র করে। বিকশিত হতে হতে কোনো কোনো বর্ধিষ্ণু গ্রামীণ সমাজই একসময় নগর সমাজে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং প্রতিটি নগর সমাজের আদিরূপ হচ্ছে গ্রামীণ সমাজ।

৭) **একে অপরের পরিপূরক:** আজ যারা শহরে বসবাস করেন তাদের প্রায় সবারই শেকড় গ্রামে। অর্থাৎ গ্রাম থেকে আসা লোকজনই নগর সমাজকে সমৃদ্ধ করেছে। আবার নগর সমাজে বসবাসের ফলে অনেকে সনাতন চিন্তা, সংস্কার, গোঁড়ামি থেকে বের হয়ে আধুনিক, যৌক্তিক ও বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে ওঠেন। গ্রামের সাথে এসব মানুষের যোগাযোগের ফলে গ্রামীণ সমাজ এবং সংস্কৃতি পরিবর্তিত হয়। এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও গ্রামীণ এবং নগর সংস্কৃতি একে অপরকে প্রভাবিত করে।

গ্রামীণ ও নগর সমাজের বৈসাদৃশ্য

বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাদৃশ্য থাকলেও গ্রামীণ ও নগর সমাজের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য পার্থক্য বিদ্যমান। গ্রামীণ ও নগর সমাজের বৈসাদৃশ্য বাহ্যিকভাবে পরিলক্ষিত হয়, তেমনি এর তাৎপর্যগত পাথর্ক্যও নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নের ছকে গ্রামীণ ও নগর সমাজের বৈসাদৃশ্য তুলে ধারা হলো।

ক্রম#	উপাদান	গ্রামীণ সমাজ	নগর সমাজ
০১	**উৎপাদন ব্যবস্থা**	কৃষিভিত্তিক।	শিল্পোৎপাদন ও সেবাভিত্তিক।
০২	**সংস্কৃতি**	সনাতন ও ঐতিহ্যবাহী।	অগ্রসরমান ও আধুনিক।
০৩	**জনসংখ্যা**	নির্দিষ্ট জনসংখ্যার বাধ্যবাধকতা নেই। একটি গ্রামে সাধারণত এক থেকে দশ হাজার মানুষের বসবাস।	একটি জনপদকে শহর হতে হলে কমপক্ষে ৫০ হাজার মানুষ বসবাস করতে হয়। কোনো কোনো মেগাশহরে এক কোটির অধিক মানুষ বসবাস করে।
০৪	**জনসখংখ্যার ঘনত্ব**	গ্রামে জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক কম।	শহরে জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি।
০৫	**কৃষি ভূমি**	বসতবাড়ি ও জলাশয় ব্যতীত অধিকাংশ ভূমি কৃষি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।	শহরে কৃষি ভূমি নেই বললেই চলে।
০৬	**পেশা**	কৃষি, ক্ষুদ্র ব্যবসা, দিনমজুরি ও স্থানীয় পেশাভিত্তিক জনগোষ্ঠী।	কৃষি বহির্ভুত শিল্পোৎপাদন ও সেবাভিত্তক পেশার আধিক্য।
০৭	**শিক্ষা**	শিক্ষার হার কম, উচ্চশিক্ষিত মানুষ খুব কমই গ্রামে বসবাস করেন।	শিক্ষার হার অপেক্ষাকৃত বেশি। শহরে অনেক শিক্ষিত এবং উচ্চশিক্ষিত মানুষ বসবাস করেন।
০৮	**সামাজিক গতিশীলতা**	গ্রামে সামাজিক গতিশীলতা অনেক ধীর, কম।	নগর জীবনে দ্রুত এবং অনেক বেশি সামাজিক গতিশীলতা দেখা যায়।
০৯	**প্রথা, জ্ঞাতি সম্পর্ক**	অত্যন্ত শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ।	নগর জীবনে প্রথা ও জ্ঞাতি সম্পর্কের অস্তিত্ব অনেক দুর্বল ও শিথিল।
১০	**যন্ত্র ও প্রযুক্তির ব্যবহার**	যন্ত্র ও প্রযুক্তির উপস্থিতি ও ব্যবহার অনেক কম।	উৎপাদন ব্যবস্থা, সেবা এবং দৈনন্দিন জীবন অনেকটাই যন্ত্র ও প্রযুক্তি নির্ভর।
১১	**অবকাঠামো**	গ্রামের অধিকাংশ ঘরবাড়ি কাঁচা, টিন, মাটি বা খড়ের তৈরি; রাস্তা–ঘাট ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা অনুন্নত।	শহরের প্রায়ই পাকা ভবন, প্রশস্ত রাস্তা–ঘাট, উন্নত অবকাঠামো এবং স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা রয়েছে।
১২	**প্রশাসনিক ব্যবস্থা**	গ্রামীণ সমাজে স্থানীয় সরকারভিত্তিক সীমিত প্রশাসনিক কার্যক্রম দেখা যায়।	প্রশাসন ও সেবাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সদরদপ্তরগুলো প্রধানত নগরকেন্দ্রিক। নগরে এগুলোর কার্যক্রম অনেক বিস্তৃত এবং দৃশ্যমান।
১৩	**নাগরিক সুযোগ-সুবিধা**	গ্যাস, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধা তুলনামূলকভাবে কম।	গ্যাস, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পয়ঃনিষ্কাশনসহ নাগরিক সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশি এবং উন্নত।
১৪	**সামাজিক নিয়ন্ত্রণ**	জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, প্রথা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হয়।	আইন এবং বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান মূখ্য ভূমিকা পালন করে।
১৫	**ক্ষমতা কাঠামো**	কৃষি জমি, বৃহৎ জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, বংশ মর্যাদা ইত্যাদি সনাতন উপাদানের অস্তিত্ব লক্ষণীয়।	কর্তৃত্বপূর্ণ পেশা, শিক্ষা, নগদ অর্থ, বিলাসবহুল বাড়ি-গাড়ি, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিকানা, রাজনৈতিক প্রভাব প্রভৃতি উপাদানের দৃঢ় ভূমিকা রয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	**গ্রামীণ ও নগর সমাজের পার্থক্যসমূহ চিহ্নিত করুন।**	**সময়: ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

গ্রামীণ ও নগর সমাজের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, স্বকীয়তা এবং পৃথক পরিবেশ ও পরিমণ্ডল রয়েছে। উৎপাদন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও কর্মকাণ্ড, নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি নগর ও গ্রামীণ সমাজের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নিরূপণ করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নগর সমাজের আদিরূপ হচ্ছে–
(ক) উপজাতীয় সমাজ (খ) গ্রাম সমাজ (গ) প্রাচীন সভ্যতা (ঘ) আদিম সমাজ

২। গ্রামীণ সমাজের সাথে নগর সমাজের দৃশ্যমান পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়–
(ক) শিক্ষায় (খ) পেশায় (গ) অবকাঠামোর ভিত্তিতে (ঘ) সংস্কৃতিতে

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১ : ১। খ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২ : ১। গ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩ : ১। ক ২। ঘ ৩। গ ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪ : ১। খ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫ : ১। ঘ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৬ : ১। খ ২। গ
চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ১। ক ২। গ ৩। খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১। 'সমাজ কাঠামো হচ্ছে মৌল কাঠামো এবং উপরি কাঠামোর সমন্বয়' কোন ধারার অভিমত?
(ক) মার্কসবাদী (খ) ক্রিয়াবাদী
(গ) বিবর্তনবাদী (ঘ) কাঠামোবাদী

২। সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রধান ধরন কয়টি?
(ক) দুইটি (খ) তিনটি
(গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

৩। নগর সমাজের ক্ষমতা কাঠামোয় প্রভাব বিস্তার করে?
(i) শিক্ষা ও পেশা
(ii) নগদ অর্থ
(iii) বংশ মর্যাদা
সঠিক উত্তর কোনটি?
(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্নঃ

উদ্দীপকটি পড়ুন এব নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

হান্নানের দাদা ছিলেন কৃষক। খুব বেশি জমিজমা না থাকলেও বংশ মর্যাদা তাঁকে গ্রামের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিতে পরিণত করেছিল। হান্নানের দাদা তেমন লেখাপড়াও জানতেন না। কিন্তু তিনি তাঁর সন্তানদের শিক্ষিত করেছিলেন। হান্নানের বাবা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পর ব্যবসা করতে শুরু করেন। ব্যবসায়ের উন্নতিতে তারা গ্রামের শীর্ষধনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এখনো গ্রামে হান্নানদের পরিবারই সর্বাধিক প্রভাবশালী।

১) সামাজিক স্তরবিন্যাস কী? ১
২) গ্রামীণ সমাজের স্তরবিন্যাসের উপাদানগুলো কি কি? ২
৩) কোন কোন উপাদানের ভিত্তিতে হান্নানদের পরিবার গ্রামে সর্বাধিক প্রভাবশালী? আলোচনা করুন। ৩
৪) 'যেকোনো সমাজের অসমতা, স্তরবিন্যাস কিংবা ক্ষমতা কাঠামোতে অর্থবিত্তই মুখ্য ভূমিকা পালন করে'– আপনি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করুন। ৪

বাংলাদেশে পরিবার, বিবাহ ও জ্ঞাতিসম্পর্ক
Family, Marriage and Kinship in Bangladesh

ইউনিট ৭

সমাজবিজ্ঞানের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়ের মধ্যে পরিবার, বিবাহ এবং জ্ঞাতিসম্পর্ক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরিবার, বিবাহ এবং জ্ঞাতিসম্পর্ক প্রত্যয়সমূহ একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বিবাহের মাধ্যমে পরিবারের সৃষ্টি হয়। পরিবার এবং বিবাহ সম্পর্কিত সম্পর্কের সাথে জ্ঞাতিসম্পর্ক ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। বিবাহ হচ্ছে নির্দিষ্ট বন্ধন যা মূলত সংশ্লিষ্ট নারী-পুরষের সমাজ, সংস্কৃতি এবং ধর্মের নিয়মানুযায়ী তৈরি একটি চুক্তি। এ চুক্তির ফলে সংশ্লিষ্ট তারা একত্রে বসবাস করার বৈধতা এবং সন্তান-সন্ততি লাভ করার অধিকার অর্জন করে। এই সম্পর্কের ফলে তাদের মধ্যে অধিকার ও কর্তব্যের বন্ধন তৈরি হয়। অন্যদিকে, পরিবার হচ্ছে এমন একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেখানে বিবাহ, রক্তের সম্পর্ক অথবা দত্তক ব্যবস্থার মাধ্যমে কিছু ব্যক্তি একত্রিত হয়ে একই গৃহস্থালিতে বসবাস করে। পরিবারে বসবাসকারী সদস্যগণ পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে অভিন্ন সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যথাযথ সামাজিক দায়-দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করে। জ্ঞাতিসম্পর্ক বলতে রক্ত, বিবাহ, বন্ধুত্ব, কাল্পনিক, দত্তক ইত্যাদি সূত্রে আবদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ককে বোঝায় এবং যার ফলে জ্ঞাতিসম্পর্কের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

	ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৭.১ : বাংলাদেশে পরিবারের ধরন ও কার্যাবলি
পাঠ- ৭.২ : বাংলাদেশের সমাজজীবনে পরিবারের গুরুত্ব
পাঠ- ৭.৩ : বাংলাদেশে বিবাহের ধরন ও গুরুত্ব
পাঠ- ৭.৪ : বাংলাদেশে জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরন ও সম্বোধন রীতি
পাঠ- ৭.৫ : বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল পরিবার, বিবাহ ও জ্ঞাতিসম্পর্ক

পাঠ-৭.১ বাংলাদেশে পরিবারের ধরন ও কার্যাবলি
Types and Functions of Family in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে পরিবারের ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে পরিবাবের কার্যাবলি আলোচনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	পরিবার, ধরন, কর্তৃত্বের মাত্রাভিত্তিক পরিবার, বাসস্থানভিত্তিক পরিবার, কার্যাবলি, জৈবিক কাজ, মনস্তাত্ত্বিক কাজ ।

বাংলাদেশে পরিবারের ধরন

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবারের বিভাজন করা হয়ে থাকে। নিম্নে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে পরিবারের বিভাজন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

কর্তৃত্বের মাত্রাভিত্তিক পরিবার: কর্তৃত্বের মাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশের পরিবারকে দুই ভাগে ভাগ কার যায়। যথা- পিতৃতান্ত্রিক পরিবার এবং মাতৃতান্ত্রিক পরিবার।

যে পরিবারের কর্তৃত্ব পিতা, স্বামী বা অন্য কোনো পুরুষের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হলে তাকে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার বলে। বাংলাদেশে এ ধরনের পরিবার ব্যবস্থা সর্বত্র বিদ্যমান।

পরিবারের কর্তৃত্ব যখন মাতা, স্ত্রী বা কোনো নারী সদস্য দ্বারা পরিচালিত হয় তখন তাকে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বলে। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর মধ্যে এ ধরনের পরিবার দেখা যায়।

বাসস্থানভিত্তিক পরিবার: বিবাহের পরে স্বামী-স্ত্রীর বসবাসের স্থানের ভিত্তিতে পরিবারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- পিতৃবাস পরিবার, মাতৃবাস পরিবার এবং নয়াবাস পরিবার। বিবাহিত নব দম্পতি বিয়ের পরে স্বামীর পিতার বাড়িতে বসবাস করলে তাকে পিতৃবাস পরিবার বলে। অন্যদিকে যে দম্পতি স্ত্রীর পিতা-মাতার বাড়িতে বসবাস করে তাকে মাতৃবাস পরিবার বলে। বাংলাদেশে পিতৃবাস পরিবার ব্যবস্থাই বেশি দেখা যায়। তবে মান্দি সম্প্রদায়ের মধ্যে মাতৃবাস পরিবার প্রচলিত।

বিয়ের পর নবদম্পতি স্বামীর কিংবা স্ত্রীর পিতা-মাতার বাড়িতে বসবাস না করে নিজস্ব ব্যবস্থায় নতুন বাড়িতে বসবাস করলে তাকে নয়াবাস পরিবার বলে। বর্তমানে নয়াবাস পরিবার ব্যবস্থা বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

বংশ এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে পরিবার: বংশ পরম্পরা এবং সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের উপর ভিত্তি করে পরিবারকে পিতৃসূত্রীয় পরিবার এবং মাতৃসূত্রীয় পরিবার এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

সন্তান-সন্ততি যদি পিতার সম্পত্তি, বংশানুক্রম এবং পারিবারিক নাম ব্যবহার করে তাহলে তাকে পিতৃসূত্রীয় পরিবার বলে। বাংলাদেশে উত্তরাধিকারের আইন ও প্রথা অনুযায়ী এ ধরনের পরিবার বেশি দেখা যায়।

অন্যদিকে সন্তান-সন্ততি যদি মাতার সম্পত্তি, বংশানুক্রম এবং পারিবারিক নাম ব্যবহার করে তাহলে তাকে মাতৃসূত্রীয় পরিবার বলে। বাংলাদশের কিছু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে এ ধরনের পরিবার ব্যবস্থা দেখা যায়।

আকার বা কাঠামো অনুসারে পরিবার: পরিবারের আকার বা কাঠামো অনুসারে পরিবারকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- অণু পরিবার, যৌথ পরিবার এবং বর্ধিত পরিবার।

একজন স্বামী, একজন স্ত্রী এবং তাদের অবিবাহিত সন্তান-সন্ততি নিয়ে যে পরিবার গঠিত হয় তাকে অণু পরিবার বলে। বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে এবং শিল্প এলাকায় অণু পরিবার বেশি দেখা যায়।

পিতা-মাতা, ভাই বোন, সন্তান-সন্ততি, ভ্রাতৃবধূ কিংবা পুত্রবধূর সমষ্টিতে গঠিত পরিবারকে যৌথ পরিবার বলে। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে এখনো যৌথ পরিবার দেখা যায়।

তিন পুরুষের পরিবারকে বর্ধিত পরিবার বলে। সাধারণত একক পরিবার থেকে যৌথ পরিবার এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে বর্ধিত পরিবার গঠিত হয়। এ পরিবারে দাদা-দাদি, পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়েসহ তিন প্রজন্মের সদস্য বাস করে। গ্রামীণ বাংলাদেশে এখনো অনেক বর্ধিত পরিবার লক্ষ করা যায়।

স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা বা বিবাহের ভিত্তিতে পরিবার: স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা বা বিবাহের ভিত্তিতে বাংলাদেশের পরিবারকে একক বিবাহভিত্তিক পরিবার এবং বহু-স্ত্রী-বিবাহভিত্তিক পরিবার এই দুই ভাগে ভাগ করা হয় ।

একক বিবাহভিত্তিক পরিবার হলো একজন পুরুষ এবং একজন মহিলার বিবাহের মাধ্যমে গঠিত পরিবার। এটিই মূলত বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিবারের প্রধান রূপ।

বহু স্ত্রী বিবাহভিত্তিক পরিবার হলো একজন পুরুষ একাধিক মহিলার সাথে বিবাহের ভিত্তিতে গঠিত পরিবার। সংখ্যায় কম হলেও বাংলাদেশে এ ধরনের পরিবার রয়েছে।

বহির্গোষ্ঠী ও অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহের ভিত্তিতে গঠিত পরিবার: বহির্গোষ্ঠী ও অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহের ভিত্তিতে বাংলাদেশের পরিবারকে বর্হিগোষ্ঠী বিবাহভিত্তিক পরিবার এবং অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহভিত্তিক পরিবার এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

যখন কোনো পুরুষ বা মহিলা তার নিজ গোত্রের বা গোষ্ঠীর বাইরে থেকে পাত্র/পাত্রী নির্বাচন করে পরিবার গঠন করে তখন তাকে বর্হিগোষ্ঠী বিবাহ ভিত্তিক পরিবার বলে।

অন্যদিকে, যখন কোনো পুরুষ বা মহিলা তার নিজ গোত্রের বা গোষ্ঠীর ভেতর থেকে পাত্র/পাত্রী নির্বাচন করে পরিবার গঠন করে তখন তাকে অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহ ভিত্তিক পরিবার বলে।

বাংলাদেশের হিন্দু সমাজে বর্ণ ও জাতভিত্তিক পরিবারসমূহে বর্হিগোষ্ঠী এবং অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠনের প্রবণতা লক্ষণীয়।

পরিবারের কার্যাবলি

(১) **জৈবিক কাজ:** জৈবিক কাজ যে কোনো দেশের পরিবারের একটি মৌলিক কাজ। বাংলাদেশের পরিবারগুলোরও মৌলিক কাজ হলো জৈবিক কার্যাবলি। পরিবারের জৈবিক কাজের মধ্যে খাদ্য, পানীয়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার যৌন সম্পর্ক, সন্তান উৎপাদন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(২) **সন্তান প্রতিপপালনমূলক কাজ:** পৃথিবীর অধিকাংশ সমাজে নবজাত শিশুর লালন পালন থেকে শুরু করে ভরণ পোষণের দায়িত্ব পরিবারকে পালন করতে হয়। তবে বর্তমান যুগে বাংলাদেশে পিতা-মাতাসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ঘরের বাইরে অর্থ উপার্জনের জন্য ব্যস্ত থাকায় শিশুকে নার্সারী অথবা দিবাযত্ন কেন্দ্রে রেখে লালনপালন করার সংস্কৃতি গড়ে উঠছে।

(৩) **মনস্তাত্ত্বিক কাজ:** জন্মের পর থেকে মানবশিশু মা-বাব ও পরিবারের সদস্যদের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল থাকে। শিশুর মানসিক বিকাশে এ ধরনের সান্নিধ্য অপরিহার্য। পরিবার শিশুর মানসিক বিকাশে যেমন সহায়ক, তেমনি সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও সঙ্গ প্রদানের মাধ্যমে প্রত্যেক সদস্যের মানসিক চাহিদা পূরণ করে। বিশেষ কোনো পরিস্থিতি, শোক-দুঃখ বা দুর্দশায় একে অপরের পাশে থেকেও পরিবার মানসিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

(৪) **নিরাপত্তামূলক কাজ:** বাংলাদেশের পরিবারসমূহ তাদের সদস্যদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে থাকে। শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তাবোধের অভাবে মানুষের মাঝে হতাশা, হীনমন্যতা ও আশঙ্কা সৃষ্টি হতে পারে। এক্ষেত্রে পরিবার তার হত্যাশাগ্রস্ত সদস্যের পাশে দাঁড়ায়।

(৫) **অর্থনৈতিক কাজ:** বাংলাদশে পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো পরিবারের সদস্যদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করা। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের পরিবারগুলো এখনও উৎপাদন, বন্টন এবং ভোগের একক হিসেবে কাজ

করে থাকে। শহরেও পরিবার প্রধান বা কর্মজীবী সদস্যের উপার্জন পরিবারেই নিবেদিত হয়। শিশু, বয়স্ক ও নির্ভরশীল সদস্যদের ভরণ-পোষণ, সন্তানের লেখাপড়ার ব্যয় পরিবারই নির্বাহ করে।

(৬) **শিক্ষামূলক কাজঃ** বাংলাদেশের পরিবারগুলো শিশুর শিক্ষার হাতেখড়ির কাজটি খুব গুরুত্বের সঙ্গে করে থাকে। পরিবার তার সদস্যদেরকে ধর্মীয় ও সামাজিক নীতিবোধ শিক্ষা, বিদ্যালয়ে ভর্তি, বাড়িতে নিয়মিত পড়ালেখার উপর নজর দিয়ে থাকে। শিশুর শিক্ষার জন্য প্রয়োজনে গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থাও পরিবারই করে থাকে। তবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষামূলক কাজ এখন পরিবারের বাইরেই সম্পন্ন হয়। যদিও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে পরিবারকেই মূল ভূমিকা পালন করতে হয়।

(৭) ধর্মীয় কাজঃ বাংলাদেশে পরিবার তার সদস্যদের জন্য ধর্মীয় রীতিনীতি ও শিক্ষা অর্জনের ব্যবস্থা করে। ধর্মীয় বিভিন্ন রীতিনীতি, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ ও বিশ্বাস তৈরি হয় পরিবার থেকেই।

(৮) **সামাজিক মর্যাদা অর্পণমূলক কাজঃ** পারিবারিক পরিচিতি এবং মর্যাদা পরিবারের যে কোনো সদস্যদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সাধারণত বাংলাদেশের সমাজে ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা পারিবারিক পরিচিতির দিক থেকে নির্ধারিত হয়। তবে ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তি তার নিজের পরিচয়েও পরিচিতি লাভ করে থাকে।

(৯) **রাজনৈতিক কাজঃ** বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের হাতেখড়ি হয় পরিবার থেকেই। নেতৃত্ব, দায়িত্ববোধ-কর্তব্য, নিয়ম-শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা বাংলাদেশের শিশুরা পরিবার থেকেই শিখে থাকে। তাছাড়া ব্যক্তির ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিষয়ে পরিবারের জ্যেষ্ঠ সদস্যদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

(১০) **সামাজিক নিয়ন্ত্রণমূলক কাজঃ** বাংলাদেশর পরিবারসমূহ তার সদস্যদের বিভিন্ন অসামাজিক কাজকর্ম থেকে বিরত রাখতে ভূমিকা পালন করে থাকে। একইসাথে সৎ, সামাজিক, কল্যাণকর ও মানবিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহ দেয় পরিবার।

(১১) **সামাজিকীকরণঃ** পরিবারের মধ্যে মানুষের প্রথম সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। পরিবার তাদের সদস্যদেরকে সামাজিক মূল্যবোধ, আচার-প্রথা, রীতি-নীতি তথা সংস্কৃতির ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে শিক্ষা দেয় এবং সামাজিক জীব হিসেবে গড়ে তুলে।

(১২) **বিনোদনমূলক কাজঃ** সমাজ বিকাশের গোড়া থেকেই বিনোদনমূলক কাজের কেন্দ্রবিন্দু ছিল পরিবার। পূর্বে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পরিবার কবিগান, পালাগান, যাত্রাপালা, নাটক, জারি-সারি, কেচ্ছা-কাহিনী ইত্যাদির আয়োজন করতো। কিন্তু বর্তমানে প্রযুক্তির উন্নয়নে মানুষের বিনোদনের ক্ষেত্রও প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে গেছে।

তবে, পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিস্থিতিতে খাপখাওয়ানোর জন্য প্রতিনিয়ত পরিবারের কার্যাবলিতে আলাদা আলাদা মাত্রা যোগ হচ্ছে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও দেখা দিচ্ছে। পরিবারের কিছু কিছু কাজ যেমন বাচ্চার লেখাপড়া, প্রতিপালন (ডে-কেয়ার বা বেবি সিটিং), বিনোদন, আর্থিক কার্যক্রম ইত্যাদি এখন পরিবারের বাইরে অন্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায়।

	শিক্ষার্থীর কাজ	**বাংলাদেশের পরিবারের কার্যাবলিগুলো লিখুন। সময়ঃ ৫ মিনিট।**

সারসংক্ষেপ

ক্ষমতার মাত্রা, বিবাহোত্তর বসবাসের স্থান, বংশ মর্যাদা, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, পরিবারের আকার স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা, পাত্র-পাত্রী নির্বাচন রীতি ইত্যাদির ভিত্তিতে বাংলাদেশের পরিবারকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ কারা হয়েছে। বাংলাদেশের পরিবারসমূহ বিভিন্ন কাজ করে থাকে। তার মধ্যে- জৈবিক কাজ, সন্তান জন্মদান এবং লালন-পালন উত্তরাধিকার সৃষ্টি, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা, বিনোদন, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক তথা জীবনের নিরাপত্তাবোধ ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে বাংলাদেশে পরিবার কত প্রকার?

(ক) ২ প্রকার (খ) ৩ প্রকার

(গ) ৪ প্রকার (ঘ) ৫ প্রকার

২। "নিচের কোন কাজটি এখন পরিবারের বাইরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দ্বারা করা হয়?"

(i) জৈবিক কাজ

(ii) সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন

(iii) শিক্ষামূলক কাজ

কোনটি সঠিক?

(ক) (i) ও (ii) (খ) (ii) ও (iii)

(গ) (iii) (ঘ) (i), (ii) ও (iii)

পাঠ-৭.২ বাংলাদেশে সমাজজীবনে পরিবারের গুরুত্ব

Importance of Family in Social Life in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের সমাজজীবনে পরিবারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	পরিবার, সমাজজীবন, গুরুত্ব।

পরিবার এমন একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যা গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজজীবনকে টিকিয়ে রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শুধু সমাজ নয়, বংশ পরম্পরা, সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষা, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, সামাজিকীকরণ এবং পরিবারের সদস্যদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক শিক্ষা এবং আশ্রয়স্থল হলো পরিবার। নিচে বাংলাদেশের সমাজজীবনে পরিবারের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো:

(১) **বংশের ধারা রক্ষা:** পরিবারের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো বংশের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। বংশের ধারাবাহিকতা রক্ষায় বিবাহভিত্তিক পরিবারের বিকল্প নেই। সুতরাং সমাজ, সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশের সমাজজীবনে পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম।

(২) **যৌন জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ:** বাংলাদেশের সমাজে অবাধ যৌনাচার নিয়ন্ত্রণ এবং যৌন জীবনের উপর সার্বিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য পরিবার ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজজীবনে পূর্ণ শান্তি-শৃংখলা, নৈতিকতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং ব্যভিচার বন্ধসহ অন্যান্য সমাজিক অপরাধমূলক কাজ থেকে সমাজের মানুষকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য বাংলাদেশের সমাজজীবনে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(৩) **সম্পত্তির উত্তরাধিকার:** বাংলাদেশে সম্পত্তির উত্তরাধিকার কাঠামো ঐতিহ্য এবং আইনগতভাবে পরিবারভিত্তিক। সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান এবং ভবিষ্যৎ বংশধর সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশের সমাজে পরিবার অত্যন্ত অপরিহার্য।

(৪) **সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা:** পরিবারের সদস্যরা তাদের পরিবারের মধ্য থেকেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন আচার-আচরণ শিখে থাকে যা সমাজের শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে অবদান রাখে। তাই বাংলাদেশে সমাজে বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজ কাঠামোতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য পরিবার ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ।

(৫) **সামাজিকীকরণ:** পরিবারের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক কাজ হলো পরিবারের সদস্যদেরকে পূর্ণ সমাজিক জীব হিসেবে গড়ে তোলা। জন্মগ্রহণের পরে শিশুর সামাজিকীকরণের প্রথম ধাপ অতিক্রান্ত হয় পরিবারের মধ্যে। বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোতে গ্রামীণ ও নগর সমাজে শিশুর সামাজিকীকরণের প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে পরিবার। পরিবারের কাছ থেকেই আদর্শ আচরণ শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজজীবনে উপযুক্ত আচরণ করতে শেখে এবং সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সাথে ভাল ব্যবহারের মাধ্যমে সম্প্রীতি বজায় রাখে।

(৬) **পারিবারিক শিক্ষা:** শিশুশিক্ষার প্রথম পাঠ পরিবার থেকেই। পরিবার থেকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। পরিবার যে শিক্ষা প্রদান করে তা মূলত পরবর্তী জীবনে মানুষের কাজে লাগে। তাই পরিবারের সদস্যদেরকে পারিবারিক শিক্ষা প্রদানের জন্য বাংলাদেশের সমাজজীবনে পরিবারের গুরুত্ব রয়েছে।

(৭) সামাজিক মূল্যবোধ শিক্ষা: সামাজিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত শিক্ষা পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্যরা মূলত পরিবারের মাধ্যমেই শিখে থাকে। তাই পরিবারের সদস্যদের মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত শিক্ষা প্রদানে পরিবার ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ।

(৮) আনুষ্ঠানিক শিক্ষার হাতেখড়ি: শিশুর শিক্ষার প্রাথমিক কাজ শুরু হয় পরিবার থেকে। বাংলাদেশের পরিবারের সদস্যদের শিক্ষাদান পারিবারিক পরিবেশে পারিবারিক কাঠামোতেই শুরু হয়। তাই পরিবারের সদস্যদের শিক্ষার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের সমাজজীবনে পরিবারের গুরুত্ব অত্যাধিক।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের সমাজজীবনে পরিবারের বিকল্প নেই। সামাজিক সমস্যা সমাধানে যেমন পারিবারিক শিক্ষার গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি সকল ধরনের মূল্যবোধ অর্জন ও শিশুর যথাযথ সামাজিকীকরণে পরিবার ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম।

	শিক্ষার্থীর কাজ	**বাংলাদেশের সমাজজীবনে পরিবারের গুরুত্ব লিখুন। সময়: ৫ মিনিট।**

সারসংক্ষেপ

পরিবার সমাজের সকল সদস্যের নিরাপদ কেন্দ্রস্থল। নানাবিধ প্রতিকূলতা থেকে সুরক্ষা প্রদানের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পরিবার। পারিবারিক পরিমন্ডলেই সকল শিশুর সামাজিকীকরণ শুরু হয়। এ ছাড়া পরিবার বংশের ধারাবাহিকতা রক্ষা, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, শান্তি-শৃঙ্খলতা রজায় রাখাসহ নানা প্রয়োজনে বাংলাদেশের সমাজেজীবনে পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। পারিবারিক পরিবেশ মানসিক সুস্থতা এবং হতাশা কাটিয়ে উঠার জন্যও অতি গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও জৈবিক চাহিদা মেটানো, সন্তান জন্মদান এবং লালন-পালন, উত্তরাধিকার সৃষ্টি, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা, বিনোদন, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সমজজীবনে পরিবারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের মানুষের শিক্ষার আধার কোনটি?

(ক) পরিবার (খ) বিবাহ
(গ) রাজনীতি (ঘ) কোনোটি নয়

২। "সম্পত্তির উত্তরাধিকার তৈরিতে কাজ করে?"

(i) রাষ্ট্র
(ii) বিবাহ
(iii) পরিবার

কোনটি সঠিক?

(ক) (i) ও (ii) (খ) (ii) ও (iii)
(গ) (i) ও (iii) (ঘ) (i), (ii) ও (iii)

পাঠ-৭.৩ বাংলাদেশে বিবাহের ধরন ও গুরুত্ব

Types and Importance of Marriage in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে বিবাহের ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে বিবাহের গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	বিবাহ, একক বিবাহ, বহুস্ত্রী বিবাহ, লেভিরেট, সরোরেট, বহির্বিবাহ, অন্তর্বিবাহ, বিবাহের গুরুত্ব।

বাংলাদেশে বিবাহের ধরন

বিবাহ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিবাহ পরিবার ব্যবস্থা গঠনের প্রধান মাধ্যম। বিবাহের মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্ক একজোড়া পুরুষ এবং নারী পারস্পরিক পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে জন্মদানকৃত সন্তানের বৈধ পিতা-মাতার অধিকার লাভ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধরনের বিবাহ ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশেও নানা ধরনের বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের নির্ণায়কের মাধ্যমে বিবাহের শ্রেণিবিভাগ করা হয়। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

(১) একক বিবাহ

একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সাথে একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারীর বিবাহকে একক বিবাহ বলে। এটি বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচলিত এবং সর্বজনস্বীকৃত বিবাহ পদ্ধতি ।

(২) **বহুস্ত্রী বিবাহ**

একজন পুরুষের সাথে যখন একাধিক মহিলার বিয়ে হয় তখন তাকে বহুস্ত্রী বিবাহ বলে। বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে এ ধরনের বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। মূলত কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে কৃষি ও গৃহস্থালীর কাজকর্মের সুবিধার জন্য বহুস্ত্রী গ্রহণের প্রচলনের উদাহরণ বাংলাদেশের সমাজে রয়েছে।

(৩) দেবর-বিবাহ বা লেভিরেট

ভ্রাতৃবিধবা বিবাহ হলো বিবাহের এমনি একটি ধরন যেখানে কোনো মহিলার স্বামী মারা গেলে মৃত স্বামীর ভাইয়ের সাথে ঐ মহিলার বিবাহ হয়। বাংলাদেশে এ ধরনের বিবাহ গ্রামাঞ্চলে কাদাচিৎ দেখা যায়।

(৪) শ্যালিকা বিবাহ বা সরোরেট

শালিকা বিবাহ বা সরোরেট ব্যবস্থায় কোনো পুরুষের স্ত্রী মারা গেলে মৃত স্ত্রীর বোনের সাথে ঐ পুরুষের বিবাহ হয়। এ ধরনের বিবাহ প্রথা বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে ব্যতিক্রম হিসেবে প্রচলিত।

(৫) **বহির্বিবাহ এবং অন্তর্বিবাহ**

কোনো পুরুষ বা মহিলা বিবাহের জন্য তার নিজ গোষ্ঠীর বাইরে থেকে পাত্র/পাত্রী নির্বাচন করে তখন বহির্বিবাহ বলে। অন্যদিকে কোনো পুরুষ বা মহিলা বিবাহের জন্য যদি তার নিজ গোষ্ঠীর ভেতর থেকে পাত্র/পাত্রী নির্বাচন করে তখন তাকে অন্তর্বিবাহ বলে। বাংলাদেশে মুসলিম ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এ ধরনের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

(৬) 'কাজিন' বিবাহ

'কাজিন' বা মামাতো, খালাতো, চাচাতো, ফুফাতো ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ বন্ধন বাংলাদেশসহ বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত। বাংলাদেশে দুই ধরনের 'কাজিন' বিবাহ প্রচলিত রয়েছে। যথা- 'প্যারালাল-কাজিন' বিবাহ এবং 'ক্রস-কাজিন' বিবাহ। 'প্যারালাল-কাজিন' বিবাহ হলো চাচাত ভাইবোন বা খালাত ভাইবেনের মধ্যে সংঘটিত বিবাহ। অন্যদিকে, 'ক্রস-কাজিন' বিবাহ হলো মামাত-ফুফাতো ভাই-বোনের মধ্যে সম্পন্ন বিবাহ।

বাংলাদেশে বিবাহের গুরুত্ব

বিবাহ হচ্ছে সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম কিংবা সাংবিধানিক আইন দ্বারা অনুমোদিত একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে পরিবার গঠিত হয়। বিবাহের একটি অন্যতম সামাজিক অবদান হলো এই যে, এর মাধ্যমে একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারীর মধ্যে সবধরনের সম্পর্ক স্থাপন হয়। এ সম্পর্কের ফসল হিসেবে তাদের সন্তান-সন্তোদি সমাজস্বীকৃত পন্থায় পিতা-মাতা পেয়ে থাকে। বাংলাদেশে বিবাহের গুরুত্ব নিম্নরূপ:

(১) **সন্তানের বৈধ পিতা-মাতা:** বাংলাদেশে বিবাহের মাধ্যমেই পরিবার সৃষ্টি হয়। বিবাহের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে সৃষ্ট বন্ধন থেকে যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে সে পায় তার বৈধ পিতা-মাতা। সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব এই পিতা-মাতার উপরই বর্তায়।

(২) **পারিবারিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা:** বিবাহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পারিবারিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা। তাই বাংলাদেশে পরিবার ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা এবং পারিবারিক ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য বিবাহের অনেক গুরুত্ব রয়েছে।

(৩) **উত্তরাধিকার সৃষ্টি:** বাংলাদেশের সমাজ মূলত পারিবারিক বন্ধনের উপর টিকে আছে। তাই পারিবারিক উত্তরাধিকার সৃষ্টির জন্য বিবাহের গুরুত্ব রয়েছে।

(৪) **জনসংখ্যার ভারসাম্য রক্ষা:** বৈধ উপায়ে জনসংখ্যার ভারসাম্য রক্ষার জন্য বাংলাদেশে বিবাহের গুরুত্ব রয়েছে।

(৫) **সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা:** বিবাহ ব্যবস্থা না থাকলে সমাজে অবাধ যৌনাচার বেড়ে যায়, সামাজি শৃংখলা নষ্ট এবং সামাজিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে। তাই সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে বিবাহের গুরুত্ব অপরিসীম।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বাংলাদেশে পরিবারের ধরন এবং গুরুত্ব সম্পর্কে জানলাম।

	শিক্ষার্থীর কাজ	**বিবাহের প্রকারসমূহের নাম লিখুন। সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

পারিবারিক জীবনের সূত্রপাত হয় বিবাহের মাধ্যমে। বিবাহ হচ্ছে সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে পরিবার গঠিত হয়। বিবাহের একটি অন্যতম সামাজিক অবদান হলো এই যে, এ ব্যবস্থা যে কোনো মানব শিশুকে সমাজস্বীকৃত পিতা ও মাতা দান করে। বাংলাদেশের সমাজে ধর্ম, বর্ণ, নৃগোষ্ঠী এবং জাতিভেদ অসুযায়ী একক বিবাহ, বহুস্ত্রী বিবাহ, বহির্বিবাহ ও অন্তর্বিবাহ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বিবাহের মাধ্যমে নারী পুরুষ কোন জীবনে প্রবেশ করে?

ক) সমাজ জীবনে খ) পারিবারিক জীবনে

গ) রাষ্ট্রীয় জীবনে ঘ) শিক্ষা জীবনে

২। 'প্যারালাল-কাজিন' কী ধরনের বিবাহ?

ক) অপরিচিত ছেলে-মেয়ের বিবাহ খ) মামাতো-ফুফাতো ভাই-বোনের বিবাহ

গ) মৃত স্বামীর ভাইকে বিবাহ ঘ) চাচাত বা খালাত ভাই-বোনের বিবাহ

পাঠ-৭.৪ বাংলাদেশে জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরন ও সম্বোধন রীতি

Types and Terminology of Kinship in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে জ্ঞাতিসম্পর্কের সম্বোধন রীতি আলোচনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	জ্ঞাতিসম্পর্ক, সম্বোধন রীতি।

জ্ঞাতিসম্পর্ক: ইংরেজি Kinship শব্দের অর্থ জ্ঞাতিসম্পর্ক। রক্ত বা বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে যখন কোনো মানুষ কোনো সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলে তখন তাকে জ্ঞাতিসম্পর্ক বলে। জ্ঞাতিসম্পর্ক বলতে মূলত রক্ত, বিবাহ, বন্ধুত্ব, কাল্পনিক, দত্তক ইত্যাদির ভিত্তিতে সমাজের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে নির্দেশ করতে বোঝানো হয়ে থাকে। তবে এটি একইসাথে সমাজের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার ফল।

জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরন: সাধারণত বাংলাদেশ দুই ধরনের জ্ঞাতিসম্পর্ক দেখা যায়। যথা-বিবাহভিত্তিক জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং সগোত্রসূচক জ্ঞাতিসম্পর্ক। বিবাহভিত্তিক জ্ঞাতিসম্পর্কের মূল ভিত্তি হলো বৈবাহিক বন্ধন। বিয়ের মাধ্যমে শুধু একজন পুরুষ আর নারীর মধ্যেই সম্পর্ক স্থাপিত হয় না বরং তাদের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যেও সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যেমন- শ্যালক, শ্যালিকা, দুলাভাই, ভাবী, দেবর, ভাসুর, ননদ, শ্বশুর, শাশুড়ি ইত্যাদি সম্পর্ক দুই পক্ষ থেকেই সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, সগোত্রসূচক জ্ঞাতিসম্পর্কের মূল ভিত্তি হলো রক্তের বন্ধন। যেমন- চাচা, ছেলে-মেয়ে, ভাই, জেঠা, ফুফু, চাচাতো ভাই, চাচাতো বোন, ফুফাতো ভাই, ফুপাতো বোন ইত্যাদি সম্পর্ক। সামাজিক জ্ঞাতিসম্পর্ক নামে আরও এক ধরনের জ্ঞাতিসম্পর্ক রয়েছে। এক্ষেত্রে বিবাহিত কোনো সন্তানহীন দম্পতি যে সন্তান দত্তক হিসেবে গ্রহণ করে এবং তার সাথে যে সম্পর্কের তৈরি হয় তাকে সামাজিক জ্ঞাতিসম্পর্ক বলে। এছাড়াও আরও দুই ধরনের জ্ঞাতি আছে। যথা- মুখ্য জ্ঞাতি এবং গৌণ জ্ঞাতি । স্বামী-স্ত্রী, বাবা- ছেলে, মা- মেয়ে, বাবা- মেয়ে, মা- ছেলে এবং ভাই- বোন এরা সবাই মুখ্য জ্ঞাতি এবং এদের সাথে যে সম্পর্ক হয় তাকে মুখ্য জ্ঞাতিসম্পর্ক বলে। অন্যদিকে চাচা/জেঠা-ভাতিজা/ভাতিজি, শ্যালক/শ্যালিকা-দুলাভাই, ননদ/দেবর-ভাবী ইত্যাদি গৌণ জ্ঞাতি এবং এদের সাথে যে সম্পর্ক গড়ে উঠে তাকে গৌণ জ্ঞাতিসম্পর্ক বলে।

বাংলাদেশের মানুষের জ্ঞাতিসম্পর্কের সম্বোধন রীতি:

মুসলিম সম্প্রদায়	হিন্দু সম্প্রদায়	মুসলিম সম্প্রদায়	হিন্দু সম্প্রদায়
আব্বা, বাজান, বাপজান	বাবা	নানা, নানাজি	দাদু
আম্মা, আম্মু/ মা	মা	নানি	দিদিমা
চাচা/কাকা/জেঠা	জেঠামশাই/খুড়ো/ কাকা	ভাবি/বাউজ	বৌদি
মামা, মামাজি	মামা	দেবর/দেওর	ঠাকুরপো
চাচি/কাকি/জেঠি	কাকিমা/জেঠিমা/খুড়িমা	ননদ	ঠাকুরঝি
মামি, মামানি	মাসিমা	ফুপা/ফুপাজি	পিসেমশাই
দাদা, দাদি	ঠাকুর্দা, ঠাকুমা	ফুফু/ফুফুজি	পিসিমা
বোন/আপা, বুবু, বুজি	দিদি	ভাই	দাদা
খালু	মেসো	দুলাভাই	জামাইবাবু
খালা	মাসি	শালা	শালাবাবু
মামাতো ভাই	মামাতো দাদা	মামাতো বোন	মামাতো দিদি

মুসলিম সম্প্রদায়	হিন্দু সম্প্রদায়	মুসলিম সম্প্রদায়	হিন্দু সম্প্রদায়
খালাতো ভাই	মাসতুতো দাদা	ফুফাতো ভাই	পিসতুতো দাদা
খালাতো বোন	মাসতুতো দিদি	ফুফাতো বোন	পিসতুতো দিদি
চাচাতো ভাই	খুড়তুতো দাদা	চাচাতো বোন	খুড়তুতো দিদি

জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরন একই ধরনের হলেও বাংলাদেশে হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে জ্ঞাতিসম্পর্কের সম্বোধন রীতিতে ভিন্নতা রয়েছে। তবে আবহমান কালের সাংস্কৃতিক ঐক্য, পারস্পরিক সহাবস্থান এবং সম্পর্কেও কারণে অনেক জ্ঞাতিসম্পর্কের সম্বোধন রীতিতে অভিন্ন শব্দও প্রয়োগ করা হয়। যেমন শালী/শ্যালিকা, ভাগ্নে/ভাগ্নি, ভাইপো-ভাইঝি/ভাতিজা-ভাতিজি, ভাসুর, বেয়াই, সম্বুন্ধী ইত্যাদি।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের জ্ঞাতিসম্পর্কের দশটি সম্বোধন রীতি লিখুন। **সময়: ৫ মিনিট।**

সারসংক্ষেপ

জ্ঞাতিসম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্কযুক্ত মানুষের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়। বাংলাদেশের হিন্দু এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের জ্ঞাতিসম্পর্কের রীতিনীতিগুলো মূলত এদেশের সংস্কৃতিরই অংশ। স্বামী-স্ত্রী, বাবা- ছেলে, মা- মেয়ে, বাবা- মেয়ে, মা- ছেলে এবং ভাই- বোন এরা সবাই মুখ্য জ্ঞাতি এবং এদের সাথে যে সম্পর্ক হয় তাকে মুখ্য জ্ঞাতিসম্পর্ক বলে। অন্যদিকে চাচা/জেঠা-ভাতিজা/ভাতিজি, শ্যালক/শ্যালিকা-দুলাভাই, ননদ/দেবর-ভাবী ইত্যাদি গৌণ জ্ঞাতি এবং এদের সাথে যে সম্পর্ক গড়ে উঠে তাকে গৌণ জ্ঞাতিসম্পর্ক বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। চাচা/জেঠা-ভাতিজা/ভাতিজি কোন ধরনের জ্ঞাতিসম্পর্ক?
(ক) সামাজিক জ্ঞাতি (খ) মুখ্য জ্ঞাতি
(গ) গৌণ জ্ঞাতি (ঘ) উপরের কোনটিই নয়

২। জ্ঞাতি সম্পর্ক প্রধানত কত প্রকার?
(ক) ২ প্রকার (খ) ৩ প্রকার
(গ) ৪ প্রকার (ঘ) ৫ প্রকার

পাঠ-৭.৫ বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল পরিবার, বিবাহ ও জ্ঞাতিসম্পর্ক
Changing Family, Marriage and Kinship in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে পরিবর্তনশীল পরিবার সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে পরিবর্তনশীল বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে পরিবর্তনশীল জ্ঞাতিসম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	পরিবার, বিবাহ, জ্ঞাতিসম্পর্ক, পরিবর্তনশীল।

বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল পরিবার

আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ, প্রয়োগ ও প্রভাব; সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নানা ধরনের পরিবর্তন ও গতিশীলতা বাংলাদেশের পরিবার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছে। সাম্প্রতিককালের আকাশ সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত সমৃদ্ধিও পরিবার ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধন করছে। বিশেষ করে ক্রমাগত শিল্পায়ন এবং নগরায়নের ফলে বাংলাদেশের পারিবারিক কাঠামোতে পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে পরিবার কাঠামোতে যে পরিবর্তন এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, এখানে শহরাঞ্চলে প্রধানত অণু পরিবারের প্রাধান্য রয়েছে। তবে গ্রামাঞ্চলে এর সংখ্যা শহরের তুলনায় অনেকটা কম। একসময় বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে যৌথ পরিবারের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, সম্পদের স্বল্পতা, পেশার পরিবর্তন, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা, মানসিকতার পরিবর্তন, পারিবারিক কলহের জের, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ইত্যাদি কারণে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা দ্রুত ভেঙ্গে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে একক বিবাহভিত্তিক পরিবার ব্যবস্থা বেশি লক্ষ করা যায়। সম্পত্তির উত্তরাধিকার তৈরি, বংশের ধারাবাহিকতা রক্ষা, গৃহস্থালী কাজকর্ম পরিচালনার জন্য গ্রামীণ ধনী ও সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে একাধিক বিবাহভিত্তিক পরিবারের অস্তিত্ব এখনও রয়েছে। তবে তা অতি নগন্য। বাংলাদেশের শহরের বস্তি এলাকাগুলোতে এবং পোশাক শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে কম-বেশি বহু-স্ত্রী বিবাহভিত্তিক পরিবার লক্ষ্যণীয়। পিতৃপ্রদান পরিবার বাংলাদেশের পরিবার ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও আধুনিক শিক্ষার প্রসার, নারীর ক্ষমতায়ন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধের বিকাশ, উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ইত্যাদি কারণে উদার দৃষ্টিসম্পন্ন পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতা ও অংশীদারিত্বের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। ঠিক একই কারণে পিতৃবাস এবং মাতৃবাসভিত্তিক পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে নয়াবাস পরিবার ব্যবস্থা জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। চাকরির বদলিজনিত কারণ, মানুষের কর্মস্থলের সুবিধার্থে অথবা ক্যারিয়ারের জন্য, সন্তানদের পড়ালেখার জন্য বাংলাদেশে বর্তমানে অনেকেই শহর ও শিল্প এলাকায় বিবাহোত্তর জীবনে নয়াবাস গড়ে তুলে। বর্তমানে বাংলাদেশের পরিবারসমূহে পিতা এবং মাতা উভয় দিকের আত্মীয়দের সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে পরিবারের বন্ধন দ্রুত শিথিল হয়ে পড়লেও, পরিবারের মৌল কাঠামো এখনও শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। আরেকটি বিষয় এখন খুব বেশি লক্ষ্য করা যায় যে সীমিত আয়, জীবন যাত্রার অধিক ব্যয় ইত্যাদি কারণেও বাংলাদেশের পরিবার ব্যবস্থাতে পরিবর্তন এসেছে। যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভাঙ্গনের মুখে পড়লেও জ্ঞাতিগোষ্ঠীর লোকজন পিতা-মাতা বা স্বামী বা স্ত্রীর পক্ষের লোকজন শহরে অণু পরিবারগুলোতে বসবাস করাতে যৌথ পরিবারের একটা আমেজ লক্ষ্য লক্ষ্য করা যায়। শিল্পায়ন ও নগরায়নের ব্যাপক প্রভাবে বাংলাদেশের পরিবারগুলোর দায়-দায়িত্বে কিছু কিছু পরিবর্তন এসেছে। যেমন- মানুষের ব্যস্ততার কারণে অবসর যাপন, শিক্ষাদান, চিত্তবিনোদন, সন্তান-সন্ততি রক্ষাণাবেক্ষণ ইত্যাদি কাজ পরিবারের বাইরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত হচ্ছে।

বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল বিবাহ

বর্তমানে বাংলাদেশে বিবাহের চুক্তিতে মা-বাবা বা অভিভাবকের নিয়ন্ত্রণ আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। ছেলে মেয়েরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমে বিবাহ করছে। আধুনিককালে বিবাহের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার নিয়ন্ত্রণ আগের মতো নেই। পূর্বে গ্রামাঞ্চলে বহুস্ত্রী বিবাহের একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যেতো। বর্তমানে আধুনিক শিক্ষার প্রসার, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশে বহু বিবাহ ব্যবস্থা আগের মতো লক্ষ করা যায় না। বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র/পাত্রীর বয়সের ক্ষেত্রেও শিথিলতা এসেছে। এখন অধিক বয়সের পার্থক্যে বিবাহের প্রবণতা কমে গেছে। গড় যৌক্তিক বয়সের দূরত্ব কম রেখে পাত্র/পাত্রী নির্বাচিত হচ্ছে। বিয়েতে পাত্র/পাত্রীর মতামতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হচ্ছে। বিবাহের ক্ষেত্রে বংশ পরিচয়, বাবার পরিচয়ের চেয়ে পাত্র/পাত্রীয় নিজের যোগ্যতাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাংলাদেশে শহুরে সমাজের বিয়েতে বর্তমানে মা-বাবা কিংবা অভিভাবকের প্রভাব লক্ষ্যণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। রোমান্টিক তথা ভালোবাসাভিত্তিক বিবাহের প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামীণ সমাজেও এর প্রভাব পড়ছে। তবে অধিকাংশ রোমান্টিক বিয়ে বাবা-মায়ের সম্মতিতে সামাজিকভাবেই সম্পন্ন হচ্ছে। এটি বাংলাদেশের বিবাহের ক্ষেত্রে নতুন ধারার সূচনা করেছে।

বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল জ্ঞাতিসম্পর্ক

বর্তমানে বাংলাদেশের জ্ঞাতিসম্পর্কে পরিবর্তন এসেছে। জ্ঞাতিসম্পর্কগুলোতে আগের মতো 'আমরা বোধ' নেই। আধুনিকতা ও নগরায়নের প্রভাবে মানুষের সম্পর্কেও কৃত্রিমতা প্রবেশ করেছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধ বিকাশের ফলে মানুষ আর আগের মতো আবেগের বশবর্তী হয়ে কারো বিপদ-আপদে অংশগ্রহণ করে না। রক্তসম্পর্কিত, বৈবাহিক ও অন্য ধরনের জ্ঞাতিদের জন্যও এখন কেউ সচরাচর ত্যাগ স্বীকার করে না। এসব কারণে গ্রামাঞ্চলে যৌথ পরিবার ভেঙে অণু-পরিবারের সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমানে অনেক সচ্ছল ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ তাদের অনগ্রসর স্বজনদের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন না। বরং ব্যক্তিস্বার্থ এবং আর্থিক কিংবা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে জ্ঞাতির বাইরের লোকদের নানা ধরনের সুবিধা প্রদান করে। ফলে জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যের বদলে অনৈক্যের সৃষ্টি হচ্ছে। সম্পর্ক শিথিল হয়ে জ্ঞাতিদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। জ্ঞাতিসম্পর্কের চেয়ে বর্তমানে রাজনৈতিক সম্পর্ককে অনেক বেশি গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। তাই জ্ঞাতিদের মধ্যে এখন দল এবং উপদলের সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষার প্রসার, সচেতনতা বৃদ্ধি, জীবনদর্শন, আচার-আচরণ, মানসিকতার পরিবর্তন, মুল্যবোধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের ফলে জ্ঞাতিসম্পর্কের সদস্যদের মধ্যে অনেক কিছুই অযৌক্তিক বলে মনে হচ্ছে। এখন শিক্ষা, পেশা তথা গুণগত যোগ্যতা সহজেই একজনকে মান-মর্যাদা, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী করে দেয় এবং এ কারণে গ্রামীণ সমাজে বংশানুক্রমিক জ্ঞাতিসম্পর্ক ভিত্তিক ক্ষমতা কাঠামোতে পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে আগের মতো গ্রামীণ জীবনে জ্ঞাতিরা নিকটজনদের আপদে-বিপদে পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়ায় না, এমনকি খোঁজ-খবর রাখে না।

পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের পরিবার, বিবাহ এবং জ্ঞাতিসম্পর্কে পরিবর্তন এসেছে। উপর্যুক্ত আলোচনায় এটি প্রতীয়মান হয় যে, সকল সামাজিক সম্পর্ক সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল পরিবার কাঠামোর উপাদানগুলো চিহ্নিত করুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

পরিবার, বিবাহ এবং জ্ঞাতিসম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের সাথে এসব সাামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। এ পরিবর্তন কোথাও দ্রুত গতির আবার কোথাও অপেক্ষাকৃত ধীর গতির। এসব পরিবর্তনের পেছনে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণ জড়িত। আর সে কারণেই পরিবার, বিবাহ এবং জ্ঞাতিসম্পর্ক নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরিবর্তন এসেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান নয়?

(ক) ব্যাংক (খ) পরিবার

(গ) জ্ঞাতিসম্পর্ক (ঘ) বিবাহ

২। বাংলাদেশে বর্তমানে কোন ধরনের পরিবার বেশি দেখা যায়"

(ক) যৌথ পরিাবর (খ) একক বা অনু পরিবার

(গ) বর্ধিত পরিবার (ঘ) উপরের কোনটিই নয়।

৩। নিচের কোনটি বাংলাদেশের ব্যাপক জনপ্রিয় বিবাহ?

(ক) একক বিবাহ (খ) বহুস্বামী বিবাহ

(গ) বহুস্ত্রী বিবাহ (ঘ) দলগত বিবাহ

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১ : ১। ক ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২ : ১। ক ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩ : ১। খ ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৪ : ১। গ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৫ : ১। ক ২। খ ৩। ক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ১। খ ২। গ ৩। গ ৪। ক ৫। ঘ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১। বাসস্থানের ধরন অনুযায়ী পরিবার কয় প্রকার?
(ক) দুই প্রকার (খ) তিন প্রকার
(গ) চার প্রকার (ঘ) পাঁচ প্রকার

২। হিন্দু ও মুসলিম জ্ঞাতিসম্পর্কে অভিন্ন সম্বোধনরীতি কোনগুলো?
(ক) পিতা-মাতা (খ) ভাই-বোন
(গ) ভাইপো-ভাতিজি (ঘ) খালা-ফুফু

৩। বিবাহের মাধ্যমে সৃষ্ট জ্ঞাতিসম্পর্ক কোনগুলো?
(i) দেবর-ভাসুর
(ii) শ্বশুর-শাশুড়ি
(iii) ভাই-বোন
(iv) স্বামী-স্ত্রী
সঠিক উত্তর কোনটি?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iv (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
জ্ঞাতিসম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্কযুক্ত মানুষের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়। বাংলাদেশের হিন্দু এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের জ্ঞাতিসম্পর্কের রীতিনীতিগুলো মূলত এদেশের সংস্কৃতিরই অংশ।

৪। জ্ঞাতিসম্পর্কেও প্রধান দু'টি ভিত্তি কী?
(ক) রক্তের সম্পর্ক ও বিবাহ (খ) সামাজিক সম্পর্ক
(গ) মৌখিক সম্পর্ক (ঘ) পেশাগত সম্পর্ক

৫। সাম্প্রাতিককালের বিবাহের ক্ষেত্রে কোন বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া হয়?
(ক) অল্প বয়স (খ) চেহারা-সৌন্দর্য
(গ) বংশ মর্যাদা (ঘ) পাত্র-পাত্রীর যোগ্যতা

খ) সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন

মৌমিতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সে পড়াশোনা করছে। ঈদের ছুটিতে বাড়িতে গিয়ে সে জানতে পারল, বাবা-মা তার বিয়ের জন্য পাত্র খুঁজছে। মৌমিতা তার মা'কে বুঝিয়ে বলল, এখনই সে বিয়ের জন্য প্রস্তুত নয়। সে পড়াশোনা শেষ করে চাকরি করবে। তারপর বিয়ে। তাছাড়া বিয়ের ব্যাপারে তার নিজের পছন্দ-অপছন্দ থাকতে পারে। বাবা-মা মৌমিতার কথা মেনে নিলেন।

১) বিবাহের সংজ্ঞা দিন? ১
২) পরিবারের ধরনগুলো কি কি? ২
৩) উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের বিবাহের ক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, বর্ণনা করুন। ৩
৪) আপনি কি মনে করেন গত তিন দশকে বাংলাদেশের পরিবারের কার্যাবলিতে বিশেষ কোনো পরিবর্তন এসেছে? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করুন। ৪

বাংলাদেশে নগরায়ণ ও শিল্পায়ন
Urbanization and Industrialization in Bangladesh

ইউনিট ৮

সমাজ কাঠামো পরিবর্তনের অন্যতম দুটি উপাদান হলো নগরায়ণ ও শিল্পায়ন। নগরায়ণ হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে গ্রামসমূহ শহরে রূপান্তরিত এবং গ্রামের মোট জনসংখ্যার একাংশ নগরে স্থানান্তরিত হয়। শিল্পায়ন নগরায়ণের গতিকে ত্বরান্বিত করে। শিল্পায়ন ও নগরায়ণ পাশাপাশি ঘটে। ব্যাপক শিল্পায়নের ফলে গ্রামীণ জীবন ছেড়ে নগর জীবন পদ্ধতি গ্রহণের প্রক্রিয়াই হলো নগরায়ণ। অন্যদিকে শিল্পায়ন হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন, যেখানে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে সমাজ ক্রমান্বয়ে শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ পরিবর্তনের মূলে রয়েছে উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার। এর মাধ্যমে কৃষি ও হস্তচালিত অর্থনীতির সমাজব্যবস্থা যান্ত্রিক, শিল্পভিত্তিক ও উৎপাদনমুখী অর্থনীতির সমাজে রুপান্তরিত হয়। অর্থাৎ সনাতন উৎপাদন পদ্ধতি থেকে যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিতে উত্তরণই হচ্ছে শিল্পায়ন। শিল্পায়ন ও নগরায়ণ সামাজিক পরিবর্তনে নিয়ে আসে নতুন ছোঁয়া। ফলে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা দেয় পরিবর্তন। বাংলাদেশে স্বাধীনতাত্তোর সময় থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত বিভিন্ন শিল্প, কল-কারখানার দ্রুত প্রসার ঘটেছে। এর মধ্যে পোশাক, ওষুধ, পাট, চা, চিনি, সুতা, কাগজ, তামাক, প্রসাধনী শিল্প প্রধান। পাশাপাশি হিমায়িত মাছসহ অনেক অপ্রচলিত শিল্পেরও প্রসার ঘটেছে। শিল্পের সম্প্রসারণে গ্রামের অনেক দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক শুধু বেকারত্ব ঘুচাতে শিল্পাঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়েছে। নগরায়ণের ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে সমাজ জীবনে সুদূর প্রসারী পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবারেও এ পরিবর্তনের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। পুরুষ কর্মীর পাশাপাশি নারী কর্মীরাও উপার্জন করছে। ফলে পুরুষের উপর মেয়েদের আর্থিক নির্ভরশীলতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। সমাজে মেয়েদের প্রতিপত্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পায়নের ফলে আমাদের সমাজজীবনে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে। দেশে উৎপাদন, মাথাপিছু আয় ও জাতীয় আয় এবং কর্মসংস্থান যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি মানুষের মধ্যে সচেতনতাবোধ, গণতান্ত্রিক চেতনা, মূল্যবোধ ও অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পরিবর্তনের মূলে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৫ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৮.১ : নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ধারণা
পাঠ- ৮.২ : বাংলাদেশের নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রকৃতি
পাঠ- ৮.৩ : বাংলাদেশে শিল্পায়নে প্রধান প্রতিবন্ধকতা সমূহ
পাঠ- ৮.৪ : বাংলাদেশের সমাজে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রভাব
পাঠ- ৮.৫ : বাংলাদেশের পোশাক শিল্প ও এর আর্থসামাজিক প্রভাব

পাঠ-৮.১ নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ধারণা
Concept of Urbanization and Industrialization

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	নগরায়ণ, শিল্পায়ন, বর্ধিত জনগোষ্ঠী, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, জ্বালানি।

নগরায়ণের ধারণা

'নগরায়ণ' শব্দটি সমাজবিজ্ঞানের আলোচিত বিষয় সমূহের মধ্যে অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ প্রত্যয়। সাধারণ অর্থে নগরায়ণ হচ্ছে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে নগরীতে রূপান্তরের মাধ্যমে উন্নত জীবন ব্যবস্থায় উত্তরণের একটি প্রক্রিয়া। 'নগর' শব্দটি অপেক্ষাকৃত গ্রাম থেকে ভিন্ন বা সক্রিয়। শ্রমের বিশেষীকরণ ও অকৃষিজ পণ্য ও পেশার সমাহারের মাধ্যমে 'নগর' শব্দটি বিশেষ রূপ ধারণ করেছে। নগর শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Urban, ল্যাটিন শব্দ Orbis এবং গ্রিক শব্দ Gorod হতে উদ্ভুত। ১৬০৯ সালে Pope সর্বপ্রথম Urban শব্দটি ব্যবহার করেন। গ্রামের মানুষ বিভিন্ন রকম কাজের সন্ধানে শহরমুখী হলে শহরের পরিসর বৃদ্ধি পায়। গ্রামের জনগোষ্ঠীর একটি অংশ শহরের দিকে ধাবিত হয়ে বসবাসের উদ্যোগ গ্রহণ করে। অস্থায়ী কাজের পরিবেশ হতে ক্রমান্বয়ে স্থায়ী কাজের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ক্ষুদ্র পরিসরে বিপুল জনসমাবেশ ঘটতে থাকে। এ বর্ধিত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজন উন্নত জীবনযাত্রা। এর জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, রাস্তাঘাট, যানবাহন, খাদ্যসামগ্রী, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ অপরিহার্য। নাগরিক জীবন ব্যবস্থায় এ ধরনের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকলে তাকে পরিকল্পিত নগরায়ণ বলা হয়। অর্থাৎ গ্রামীণ জীবনধারা হতে নগরের জীবনধারা গ্রহণের প্রক্রিয়াকে নগরায়ণ বলা হয়।

নগরায়ণের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। সমাজবিজ্ঞানী মিচেলের মতে, 'নগরায়ণ হচ্ছে শহুরে হওয়ার পদ্ধতি যা কৃষি পেশা থেকে অকৃষি পেশার রূপান্তর এবং মানুষের দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির পরিবর্তন।' সমাজবিজ্ঞানী ওয়ারেন এস. থমসনের মতে, 'নগরায়ণ হচ্ছে কৃষি প্রধান জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশের অকৃষি কার্মকাণ্ড স্থানান্তর প্রক্রিয়া।' জাতিসংঘ রিপোর্টে নগরায়ণের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'দেশের জনসংখ্যার একটি ক্রমবর্ধমান অংশ শহরে বসবাস করার প্রক্রিয়াই হলো নগরায়ণ।'

বাংলাদেশের নগরায়ণের প্রবণতা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। গ্রাম হতে লোক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। বাংলাদেশে নগরায়ণ বৃদ্ধির কারণ হলো গ্রামের সমাজ ব্যবস্থাতে কৃষি উৎপাদন বতীত অন্য পেশা গ্রহণের সুযোগ সীমিত। এছাড়া, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য-বস্ত্র, শিক্ষা-চিকিৎসাসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় নেই বললেই চলে। ফলে মানুষ অনেকটা বাধ্য হয়েই শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। পাশাপাশি নগরজীবনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা গ্রামীণ এলিট শ্রেণিকে আকৃষ্ট করছে। কৃষির উদ্বৃত্ত উৎপাদন ধনী কৃষকদের শহরে স্থানান্তরে ভূমিকা রাখছে। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশে নগরায়ণের গতি ছিল অত্যন্ত ধীর। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকে নগরায়ণ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৫১ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৪.৩৪% ছিল নগরকেন্দ্রিক। এরপর ১৯৬১ সালে এর হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫.১৯% এ। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের নগরায়ণ বৃদ্ধি পেয়ে উন্নীত হয় ৮.৭৮% এ। ১৯৮১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ১৫.১৮% নগরে বসবাস করছে। ২০২২ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যার ৩১.৬৬ শতাংশ শহরের অধিবাসী। তবে The UN's World Urbanization এর প্রক্ষেপণের ভিত্তিতে TheGlobalEconomy.com অনুমান করছে, ২০২৪ সালে বাংলাদেশের ৪১.২৩ শতাংশ মানুষ নগরবাসী। মূলত নানা কারণে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে আসছে। ফলে বাংলাদেশে নগারায়ণের সম্প্রাসরণ ঘটছে।

শিল্পায়নের ধারণা

শিল্প বিপ্লবের একটি অপরিহার্য অংশ হচ্ছে শিল্পায়ন। একটি আর্থ সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে শিল্পায়নের উদ্ভব ঘটে। জেমস ওয়াটের বাষ্পচালিত ইঞ্জিন প্রথমে রেলগাড়িতে এবং পরবর্তীতে শিল্প-কল-কারখানার উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্য দিয়ে ১৭৬০ এর দশকে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সমাজসহ সমগ্র বিশ্বে বিস্তার লাভ করে। সাধারণ অর্থে শিল্পায়ন হলো বিভিন্ন উৎপানমুখী কলখারখানা স্থাপন ও সেগুলোর প্রসার লাভ। অন্যভাবে বলতে গেলে, শিল্পায়ন হলো একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, যেখানে কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে শিল্পভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় রূপান্তরের মাধ্যমে সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। মূলত শিল্পায়ন বলতে আমরা বুঝি কৃষিজ দ্রব্যের রূপান্তর ঘটিয়ে শিল্পজাত পণ্য উৎপাদন। এ উৎপাদন ব্যবস্থা অনেকটাই প্রযুক্তি ও যন্ত্রনির্ভর। কোনো দেশের আধুনিক অর্থনীতির বিকাশ ও সমৃদ্ধির পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্পায়ন। শিল্পায়ন হচ্ছে প্রযুক্তির সহায়তায় প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যন্ত্রশক্তির মাধ্যমে ব্যাপকভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

শিল্পায়নের সংজ্ঞায় Prof. John Cornwall (1985: 386) বলেছেন, The term industrialization is meant to denote a phase of economic development in which capital and labor resources shift both relatively and absolutely from agricultural activities into industry specially manufacturing.

জাতিসংঘের শিল্পায়ন কমিটির মতে, শিল্পায়ন অর্থনৈতিক উন্নয়নের এমন একটি প্রণালী যাতে জাতীয় সম্পদের একটি ক্রমবর্ধমান অংশ অভ্যন্তরীণ আর্থিক সংগঠনের জন্য নিযুক্ত হয়, যা একাধারে প্রযুক্তিবিদ্যাসম্মত, আধুনিক ও বৈচিত্র্যময়।

শিল্পায়নের আলোচনায় Jary and Jary বলেন 'শিল্পায়ন হলো এমন একটি সাধারণ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কৃষি এবং হস্তচালিত উৎপাদন নির্ভর অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে যান্ত্রিক ও শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি ও সমাজে রূপান্তরিত হয়।'

শিল্পায়নের ফলে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে। প্রবৃদ্ধির হার এবং জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়। শিল্পায়নের কারণে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়। শিল্পায়নের ফলে সরকার ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব ভূমিকা ও কর্মপরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	নগরায়ণ ও শিল্পায়ন সম্পর্কে পাঁচটি করে বাক্য লিখুন। **সময় : ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

নগরায়ণ ও শিল্পায়ন মালিক শ্রেণির আর্থিক উন্নতি ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি শ্রমিক শ্রেণির কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়। ফলে বেকারত্ব দূর হয়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায় শিল্পায়নের বিকাশ সাধিত হয়। বাংলাদেশেও সরকারিভাবে পুঁজি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হয়। ফলে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রসার ঘটছে। এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে সামাজিক কাঠামোয়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিল্পায়নের নেতিবাচক প্রভাবও লক্ষণীয়। তাই সমাজবিজ্ঞানে নগরায়ণ ও শিল্পায়ন ধারনা দু'টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোথায় জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশী?
ক) গ্রামে খ) শহরে গ) পৌর এলাকায় ঘ) জেলায়

২। বাংলাদেশের গ্রামগুলো থেকে কেন মানুষ শহরে স্থানান্তরিত হচ্ছে?
ক) গ্রামে কর্মসংস্থানের অভাব খ) গ্রামে জনসংখ্যা বেশী।
গ) গ্রামে শিক্ষার হার কম ঘ) গ্রামে স্তরবিন্যাস কম

৩। 'Urban'' শব্দটি প্রথম কখন ব্যবহার হয়?
ক) ১৬০৯ সালে খ) ১৭৫৭ সালে গ) ১৮৫৭ সালে গ) ১৯৭১ সালে

৪। শিল্পায়নের পর জীবিকার প্রয়োজনে ও চাহিদা পুরণের নিমিত্তে বাংলাদেশে কোন সমাজের বিকাশ ঘটে?
ক) গ্রামীণ সমাজের খ) সনাতন সমাজের গ) পল্লি সমাজের ঘ) শহর সমাজের

পাঠ-৮.২ বাংলাদেশে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রকৃতি
Nature of Urbanization and Industrialization in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বাংলাদেশ, নগরায়ণের প্রকৃতি, শিল্পায়নের প্রকৃতি, অকৃষি পেশার বিকাশ, ঘনবসতি।

বাংলাদেশে নগরায়নের প্রকৃতি

নগরায়ণ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজের কোনো একটি এলাকা ক্রমশ নগরে রূপান্তরিত হয়। সাধারণভাবে নগরের উদ্ভব, বিকাশ এবং সম্প্রসারণকে বোঝাতে নগরায়ণ প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে নগরায়ণ প্রক্রিয়া দ্রুত ঘটছে। বাংলাদেশে নগরায়ণের প্রকৃতি হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

১. সীমিত এলাকায় ঘনবসতি। ঘনবসতির ফলে নগরের কোথাও কোথাও ঘিঞ্জি আবাসিক এলাকা এবং স্বল্পআয়ের মানুষের বসবাসের জন্য বস্তি এলাকা গড়ে ওঠে।

২. নগর এলাকাগুলো স্বশাসিত পৌর/সিটি কর্পোরেশন বা স্থানীয় সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়।

৩. অকৃষি পেশার বিস্তার ঘটে। শিল্পোৎপাদন, সেবা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি পেশা ও অর্থনীতির প্রধান ক্ষেত্র বলে পরিগণিত হয়।

৪. পেশাজীবীদের মধ্যে শ্রম বিভাজন এবং নির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা ও বিশেষজ্ঞতা অর্জনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

৫. শিক্ষার বিস্তার ঘটে এবং উচ্চশিক্ষার সুযোগসমূহ প্রধানত নগরকেন্দ্রিক।

৬. নগর জীবনে শিক্ষা ও পেশায় নারী অভিগম্যতা বেশি। নারী অধিকার ও নারীর ক্ষমতায়নে নগর সংস্কৃতি বিশেষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে।

৭. নগর সংস্কৃতিতে আধুনিক, উন্নত এবং গতিশীল জীবন-যাপন চর্চা হয়।

৮. উন্নত অবকাঠামো (ভবন, রাস্তা-ঘাট) এবং আধুনিক নাগরিক সুবিধা (বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস) নগর জীবনকে গ্রাম থেকে পৃথক এবং আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

৯. স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ, পরিবহন প্রভৃতি নাগরিক সেবা প্রধানত নগরকেন্দ্রিক। বাংলাদেশে নগরায়ণের এ প্রকৃতি গ্রামের মানুষকে অনেক বেশি শহরমুখী করছে।

১০. বাংলাদেশের শহরগুলোতে ধনী-দরিদ্র বৈষম্য, শিক্ষা, পেশা ও ক্ষমতা সামাজিক স্তরবিন্যাসের স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করেছে। বিলাসবহুল ভবনের ফুটপাতে বিত্তহীনের বসবাস বাংলাদেশের নগর জীবনের এক অনিবার্য বাস্তবতা।

সম্প্রতি বাংলাদেশের বিভিন্ন নগরে বিশেষ করে রাজধানী ঢাকার জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে। কিন্তু এ বাস্তবতা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ইউরোপ, আমেরিকা, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা এমনকি প্রতিবেশী ভারতের তুলনায় বাংলাদেশের নগরায়ণ এখনো অনেক পশ্চাৎপদ। বর্তমানে গ্রাম ছেড়ে নগরে স্থানান্তর যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে জনসংখ্যার মাপকাঠিতে বাংলাদেশে নগরগুলো আয়তনের দিক থেকে দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিকল্পিত নগর গড়ে তোলা কিংবা নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। তবুও উন্নত জীবনের হাতছানি প্রতিনিয়ত মানুষকে নগরে আসতে উদ্বুদ্ধ করছে। বস্তুত বাংলাদেশের অধিক জনসংখ্যা, বেকারত্ব এবং উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে নগরমুখী করছে। বাংলাদেশের গ্রামগুলো অনেকটাই পশ্চাদপদ, গতিহীন এবং সেখানে পেশার সুযোগ খুবই সীমিত। ফলে গ্রামগুলো তার অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে নগরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

বাংলাদেশের শিল্পায়নের প্রকৃতি

শিল্পায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রযুক্তিকে উৎপাদন পদ্ধতিতে প্রয়োগ করে উন্নত ও মানসম্মত পণ্য উৎপাদন, বিপণন এবং আয়ের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা হয়। শিল্পায়নের ফলে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে শিল্পায়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যদিও বাংলাদেশে শিল্পায়নের গতি বেশ মন্থর। বস্তুত প্রাচীনকাল থেকে প্রাক-ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত ভারত-বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো ছিল কৃষিভিত্তিক এবং তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল। গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর উৎপাদনের প্রাণকেন্দ্র ছিল কৃষি। তাছাড়া ভূমিনির্ভর ও কৃষিভিত্তিক গ্রামগুলো ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক স্যার চার্লস মেটক্যাফ ভারতবর্ষের এ গ্রামগুলোকে 'স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র' বলে অভিহিত করেছেন। প্রত্যেকটি গ্রাম জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ নিজেরাই উৎপন্ন বা প্রস্তুত করত। ব্রিটিশ শাসনের মধ্য দিয়ে 'স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সম্প্রদায়' ব্যবস্থা অনেকটা পরিবর্তিত হতে থাকে। এ সম্পর্কে ড. এ.কে নাজমূল করিম তাঁর *The changing Society in India, Pakistan and Bangladesh* শীর্ষক গ্রন্থে বলেন, "ভারত-বাংলার সমাজব্যবস্থায় ভূমি হচ্ছে সম্পদ এবং কৃষি হচ্ছে অর্থনীতি। ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে আমাদের সমাজকাঠামোতে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেক পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তনের ফলে ভারতে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি সাধিত হয়। অর্থনৈতিক সুবিধার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শিল্প-কল-কারখানা পরিচালনা, কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য সহজে পরিবহণের জন্য ব্রিটিশরা এদেশের অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করে। রেলপথ নির্মাণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন যুগের সূচনা করা হয়। বলা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রেল যোগাযোগের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক কলকারখানার সংখ্যা বাড়তে থাকে"।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে প্রথম কাগজের কল স্থাপিত হয়। ১৮৭২-৭৩ সালে বোম্বাই প্রদেশে ১৮টি, বাংলায় ২টি কাপড়ের কল এবং ১৮৮২ সালের মধ্যে ভারত-বাংলায় ২০টি পাটের কল স্থাপিত হয়, যারমধ্যে ১৮টি স্থাপিত হয়েছিল বাংলাদেশে। বস্তুতপক্ষে এসব শিল্প-কল-কারখানা গড়ে তোলার পিছনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থই প্রাধান্য পেয়েছিল। কারণ, ১৯১৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের কোনো শিল্পনীতি ছিল না। ১৯১৭ সালে ভারতে সর্বপ্রথম শিল্প বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ সরকারের তত্ত্বাবধানে শিল্পায়নের ফলে রপ্তানীমুখী দেশীয় কুটির শিল্প মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পাকিস্তানী আমলে বাংলাদেশে পাটকলের সম্প্রসারণ ঘটে। যদিও শোষণ, বৈষম্য এবং অব্যবস্থাপনার কারণে পাট এবং পাটজাত পণ্য রপ্তানী থেকে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান খুব বেশি লাভবান হয়নি।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশে শিল্পায়নের নতুন যুগের সূচনা হয়। প্রথমদিকে সব কল-কারখানা জাতীয়করণ করা হলেও পরবর্তীতে এগুলো আবার বেসরকারীকরণ করা হয়। বেসরকারী এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগেও নতুন নতুন অনেক শিল্প-কল-কারখানা প্রতিষ্টিত হয়। এক্ষেত্রে পোশাক শিল্প, বস্ত্রকল, পাটকল, চিনিকল, চাশিল্প, চামড়াশিল্প, সার কারখানা, প্লাস্টিক, সিরামিক, নির্মাণশিল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিংশ শতাব্দীর নব্বইয়ের দশক থেকে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে যুক্ত হওয়ার পর বাংলাদেশের শিল্পায়নে আরো গতি এবং উন্নতি সাধিত হয়। শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষ শ্রমশক্তি ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকার পাশাপাশি ইলেক্ট্রনিক্স, হিমায়িত খাদ্য, ডেইরি-পোল্ট্রিসহ বিভিন্ন শিল্প দ্রুত বিকাশ লাভ করে। সম্প্রতি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, সফ্টওয়্যার উন্নয়ন, ই-বিজনেস, ই-কমার্স প্রভৃতি শিল্পায়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। দেশের জিডিপিতে এখন কৃষি অপেক্ষা শিল্পের অবদান অনেক বেশি। মোট শ্রমশক্তির একটি বড় অংশই শিল্পে নিয়োজিত।

তবে বাংলাদেশের শিল্পায়নে কিছু প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতা রয়েছে। যোগাযোগ, অবকাঠামোগত দুর্বলতার পাশাপাশি বিদ্যুৎ ও গ্যাস সঙ্কট বিনিয়োগের বড় বাধা বলে চিহ্নিত। এ ছাড়া অব্যবস্থাপনা এবং নানা ধরনের বাহ্যিক প্রভাব ও কর্তৃত্ব শিল্পায়নের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করছে। দক্ষ শ্রমশক্তি এবং দেশীয় শিল্পকে পৃষ্ঠপোশকতা প্রদানের অভাবও শিল্পায়নের বড় অন্তরায়। আমদানি-রপ্তানীতে বিরাট ভারসাম্যহীনতা, কার্যকর নীতিমালার অভাবও শিল্পায়নকে কঠিন করে তোলে। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর হলে বাংলাদেশে শিল্পায়নের গতি এবং মান দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশে নগরায়ণের প্রকৃতিগুলো চিহ্নিত করুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

নগরায়ণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকা নগরে রূপান্তরিত হয়। নগরের উদ্ভব, বিকাশ এবং বৃদ্ধি বোঝাতে ও নগরায়ণ প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নগরায়ণের মাধ্যমে সামাজিক গতিশীলতা বাড়ে এবং সমাজ কাঠামো পরিবর্তন সাধিত হয়। নগরায়ণের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার ঘনত্ব একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বলে প্রতীয়মান হয়। নগরায়ণ নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি করে। বাংলাদেশের নগরায়ণের ক্ষেত্রে এসব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশে শিল্পায়নের সূচনা হয়েছিল ব্রিটিশ উপনেবিশ শাসনের মধ্য দিয়ে। পাকিস্তান আমলে পাটশিল্পের প্রসার ঘটেছিল। তবে স্বাধীনতোত্তর বাংলাদেশে বস্ত্র ও পোশাক শিল্পসহ সরকারি পৃষ্ঠপোশকতা এবং বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন শিল্পের প্রসার ঘটে। সম্প্রতি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং সফ্টওয়্যার উন্নয়ন শিল্পেও বাংলাদেশ অনেকটা সাফল্য অর্জন করছে। জিডিপি, মাথাপিছু আয় এবং কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকলেও নানাধরনের প্রতিকূলতা এবং প্রতিবন্ধকতা শিল্পায়নের গতিকে মন্থর করে দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন শতাব্দীতে পাশ্চাত্যে শিল্পায়নের প্রসার ঘটে?
ক) অষ্টাদশ খ) একাদশ গ) দ্বাদশ ঘ) চতুর্দশ

২। আধুনিক যান্ত্রিক প্রযুক্তির আশীর্বাদ কোনটি?
ক) প্রাচীন সমাজ খ) সামন্ত সমাজ
গ) কৃষিভিত্তিক সমাজ ঘ) শিল্পায়িত সমাজ

৩। নগরের উদ্ভব বিকাশ ও বৃদ্ধিকে বোঝাতে যে প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয় তা হলো-
ক) নগর পরিকল্পনা খ) নগর ইহিতাস
গ) নাগরিকতা ঘ) নগরায়ণ

৪। কোনটিকে শিল্পয়িত সমাজের মূলভিত্তি বলা যাবে?
ক) দক্ষ শ্রমিক খ) প্রতিযোগিতা
গ) আধুনিক প্রযুক্তি ঘ) অধিক উৎপাদন

৫। নগর মানসিকতা বলতে বোঝায়-
ক) নগরের প্রতি মানসিক আকর্ষণ খ) নগরের প্রতি ভালবাসা
গ) নগর জীবনযাত্রা প্রণালী বা নগর সংস্কৃতি ঘ) নগরবাসী হওয়ার বাসনা

পাঠ-৮.৩ বাংলাদেশে শিল্পায়নে প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ
Major Hindrances to Industrialization in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে শিল্পায়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বাংলাদেশ, শিল্পায়ন, প্রতিবন্ধকতা, উদ্যোক্তা, প্রযুক্তিভিত্তিক জ্ঞান, অদক্ষ শ্রমিক।

বাংলাদেশে শিল্পায়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ

বাংলাদেশে পর্যাপ্ত কাঁচামালসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ, সস্তা শ্রমিক, সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও শিল্প ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়নি। কেননা এ দেশের শিল্পায়নে নানারকম প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১। **ঐতিহাসিক পটভূমি:** বাংলাদেশ একটি পলি বিধৌত উর্বর ভূখণ্ড হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন সময়ে বিদেশী শাসকগোষ্ঠী দ্বারা শাসিত, শোষিত, বঞ্চিত ও লুণ্ঠিত হয়েছে। ফলে দেশটির আর্থ-সামাজিক ভিত্তি অতীত থেকেই ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে এমনকি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন পাশ্চাত্যে ব্যাপক শিল্পায়ন প্রক্রিয়া চলছিল তখন বাংলাদেশ ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রি.)। ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের কয়েকটি স্থানে শিল্প-কারখানা গড়ে উঠলেও এ অঞ্চলে শিল্পায়নের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। বরং বাংলাদেশ তখন বিলেতি পণ্যের অন্যতম বাজারে পরিণত হয়েছিল। ব্রিটিশ বস্ত্রকলের কাপড়ে বাজার নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে এ দেশের ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্পও ভেঙ্গে পড়ে। পাকিস্তান আমলে পাট শিল্পের প্রসার ঘটলেও বৈষম্যমূলক নীতির কারণে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান এর সুফল থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত এখানে শিল্পায়ণের গতি খুব বেশি ত্বরান্বিত হয়নি।

২। **উদ্যোক্তার অভাব:** মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যবসায়িক ঝুঁকি নিতে সক্ষম এমন উৎসাহী ব্যক্তি তথা পুঁজিপতির অভাব থাকায় বাংলাদেশ শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। পাশ্চাত্যের শিল্পায়িত সমাজের পুঁজিপতিরা তাদের সম্পদ শিল্প-কল-কারখানায় বিনিয়োগ করেন। মুনাফা লাভের মাধ্যমে তাদের পুঁজি ক্রমশ স্ফীত হয়। একটা সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে সম্পদশালী মানুষের অভাব ছিল। যাদের সম্পদ ছিল তাদের অনেকেই শিল্প-কল-কারখানায় বিনিয়োগকে ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করেছেন। এরা অনেকে জমিতে বিনিয়োগ, বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় কিংবা অনুৎপাদনশীল খাতে অর্থ ব্যয় করেছেন। ফলে উদ্যোক্তার অভাবে বাংলাদেশে পর্যাপ্ত শিল্পায়ন হয়নি।

৩। **আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর অভিজ্ঞতার অভাব:** শিল্পকারখানা গড়ে তুলতে প্রয়োজন আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর অভিজ্ঞতা। কারণ শিল্প কারখানায়ই আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। কেবল পুঁজি ও সদিচ্ছা থাকলেই শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা যায় না। শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত হবে এমন যন্ত্রপাতি তথা প্রযুক্তিগুলো সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ না থাকলে স্বাভাবিকভাবে শিল্প-কারখানা স্থাপনে অনেকেই সাহসী হবেন না। তাছাড়া কারখানা স্থাপনই যথেষ্ট নয় এর রক্ষণাবেক্ষণ, বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, উৎপাদন ক্ষমতাকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর জন্যও আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। বাংলাদেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞানের অভাব অন্যতম অন্তরায়।

৪। **দক্ষ শ্রমিকের অভাব:** বাংলাদেশে শিল্পায়নের অন্যতম অন্তরায় হল দক্ষ শ্রমিকের অভাব। আমাদের দেশে কারিগরি শিক্ষার হার খুবই কম। আধুনিক প্রযুক্তিগত শিক্ষার সুযোগও অত্যন্ত সীমিত। ফলে আমাদের দেশের জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ কারিগরি ও প্রযুক্তি জ্ঞানহীন। দক্ষতার অভাবে তারা শিল্প-কারখানায় মানসম্মত কাজ পায় না। অথচ আধুনিক শিল্প-কারখানায় দক্ষ ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন মানবসম্পদের বিশাল চাহিদা রয়েছে। এ ছাড়া আমাদের দেশে দক্ষ শ্রমিক

ও পেশাজীবীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বিদেশে চাকুরী নিয়ে চলে যায়। এ প্রেক্ষিতে দক্ষ শ্রমিক ও পেশাজীবীর অভাব বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা হিসেবে পরিগণিত।

৫। **রাজনৈতিক কারণ:** বাংলাদেশে শিল্পায়নের অন্যতম বাধা হচ্ছে শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে তথাকথিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও প্রভাব। অপরাজনীতি কয়েকটি উপায়ে শিল্পায়নকে বাধাগ্রস্থ করে। যেমন:

ক) তথাকথিত রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় সন্ত্রাস ও জোরপূর্বক চাঁদা আদায়। এ ধরনের হীন তৎপরতার জন্য অনেক উদ্যোক্তাই শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সাহস পায় না।

খ) স্থিতিশীলতার অভাব বাংলাদেশের শিল্পায়নের অন্যতম অন্তরায়। বিভিন্ন পরিস্থিতির মাধ্যমে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত সরকার পরিবর্তন এবং বারংবার শিল্পনীতি পরিবর্তন হওয়া বা পরিবর্তনের আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় দেশী ও বিদেশী অনেক উদ্যোক্তাই বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে সাহস পায় না। এছাড়া রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নস্যাৎ করতে যখনতখন হরতাল, ধর্মঘট, সহিংস আন্দোলন, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ইত্যাদি উদ্যোক্তাদেরকে বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত করে।

গ) কোনো শিল্পপতিই চান না তার কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হোক। কেননা উৎপাদন ব্যাহত হলে তার লোকসান অবশ্যম্ভাবী। নানা ধরনের অপতৎপরতায় আমাদের দেশে শিল্প-কারখানায় প্রায়শ উৎপাদন, সরবরাহ এবং রপ্তানী ব্যাহত হয়।

ঘ) রাজনৈতিক অর্থনীতিতে সুনির্দিষ্ট দর্শন অনুপস্থিত। শিল্প উন্নয়ন পরিকল্পনা স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী হতে পারে। কিন্তু কার্যকর পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। রাজনৈতিক অর্থনীতি অনিশ্চিত অবস্থার দিকে পতিত হয়, যা শিল্পয়নের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করে।

৬। **প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব:** বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ দরিদ্র। মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাতেও কোনো পুঁজি নেই। মানুষের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতাও কম। ফলে দেশের সম্পদশালী ও পুঁজিপতির সংখ্যা খুব বেশি নয়। এ কারণে শিল্প-কারখানায় বিনিয়োগের জন্য মূলধন যোগাড় করার কোন উৎস থাকে না। অথচ শিল্পকারখানা স্থাপনের পূর্বশর্ত হলো মূলধন। তাই প্রয়োজনীয় মুলধনের অভাবেও এখানে শিল্পায়ন ব্যাহত হচ্ছে। মোট জনগোষ্ঠীর যে ক্ষুদ্র অংশটি মূলধন গঠনে সক্ষম তাদের অনেকেই আবার ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনয়োগ করতে চান না। সুতরাং মূলধনের অভাব আমাদের শিল্পায়নের পথে অন্তরায়।

৭। **মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব:** মুদ্রাস্ফীতি শিল্পকারখানা স্থাপন ও উৎপাদিত পণ্য রপ্তানীতে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। একটি উৎপাদনমুখী শিল্পকারখানা গড়ে তুলতে সময়ের প্রয়োজন হয়। ঐ কারখানা স্থাপনের শুরুতে অবকাঠামো তৈরিতে যে খরচ হয় কয়েক বছরের ব্যবধানে তা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি বিভিন্ন উপকরণের দাম অপ্রতিহত গতিতে বেড়ে যাওয়ায় গৃহীত প্রকল্প শেষ করতে বাড়তি অর্থ খরচ করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

৮। **শর্তহীন বৈদেশিক সাহায্যের অভাব:** শিল্পায়িত অনেক দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশের উন্নয়নকল্পে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। তবে ঐ সব সাহায্যের সবই কঠিন শর্তযুক্ত। দাতা দেশগুলো তাদের দেশের যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামাল আমাদেরকে চড়া দামে কিনতে শর্ত আরোপ করে। শর্ত আরোপ করে সে দেশে এক্সপার্টদের অনেক বেতনে এদেশের বিভিন্ন উৎপাদন ইউনিটে চাকরি দিতে। ফলে বৈদেশিক সাহায্যের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সাহায্য দাতা দেশেই বিভিন্নভাবে ফেরত যায়।

৯। **অবকাঠামোর অভাব:** অবকাঠামো বা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাকব বাংলাদেশের শিল্পায়নের পথে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায়। বিশেষ করে এ দেশের স্থল ও জলপথ এতই অনুন্নত যে, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং উৎপাদিত দ্রব্য-সামগ্রী স্বল্প সময় এবং স্বল্প ব্যয়ে আনা নেওয়া করা সম্ভব হয় না। যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত হওয়ার কারণে আজও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব ও চাহিদা অনুযায়ী শিল্পকারখানা স্থাপন সম্ভব হচ্ছে না। কেবল কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলেই শিল্প কারখানা স্থাপনের কাজ সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। সুষ্ঠু পরিবহনের জন্য রাস্তাঘাটের প্রয়োজনীয় সংস্কার না করা যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলেছে।

১০। **কাঁচামাল তথা খনিজ সম্পদের অভাব:** শিল্পের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণে ও নিয়মিতভাবে কাঁচামালের সরবরাহ। দেশে বিভিন্ন ধরনের ভারি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

এটি একদিকে যেমন সময়সাপেক্ষ অন্যদিকে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়। আবার শিল্পের জন্য চাই পর্যাপ্ত শক্তিসম্পদ বা খনিজসম্পদ যেমন তেল, লৌহ, কয়লা, ইস্পাত ইত্যাদি। এগুলোর অভাবেও বাংলাদেশে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

১১। **বিদেশি পণ্যের প্রতি আকর্ষণ:** স্বদেশে তৈরি শিল্পজাত দ্রব্য কেনার পরিবর্তে দেশের মানুষ অনেক ক্ষেত্রে বিদেশি পণ্যের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ফলে দেশি শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রি বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এতে দেশীয় শিল্পগুলোকে অনেক সময় চরম লোকসানের সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়া দেশি শিল্পের বিকাশের জন্য প্রয়োজন দেশপ্রেম। আমরা যদি বিদেশি পণ্য বর্জন করে দেশি পণ্য ক্রয় করি তবে শিল্পজাত দ্রব্যের মান ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে, মূল্যও থাকবে হাতের নাগালে। তবে এক্ষেত্রে দেশি পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ জরুরি। তা না হলে অনেকেই দেশি পণ্য কিনতে দ্বিধা পোষণ করবেন।

১২। **দৃষ্টিভঙ্গির অভাব:** বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর অনেকেই শিল্প-বিনিয়োগে উদ্যোগী হতে পারেননি। উন্মুক্ত বিশ্ববাজারের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের অবস্থান মোটেও শক্ত নয়। ফলে শিল্পায়নে এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে অনেকেই ছিলেন দ্বিধান্বিত ।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশে শিল্পায়নের প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

শিল্পায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলোই শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় ধরনের হুমকি হিসেবে বিবেচিত। তবে স্থান, কালভেদে তারতম্য ঘটলেও উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশের ক্ষেত্রে এসব প্রতিবন্ধকতা শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। তাই বাংলাদেশকে শিল্পখাতে উন্নয়ন সাধন করতে হলে এসব বিষয়ের দ্রুত সমাধান করা প্রয়োজন। নতুবা বাংলাদেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়া যেমন মুখ থুবড়ে পড়বে তেমনি বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আমাদের দেশে কি কারণে শিল্পায়ন ব্যাহত হচ্ছে?
ক) উদ্যোক্তার অভাবে খ) কারিগরি জ্ঞানের অভাবে
গ) 'ক' ও 'খ' উভয় ঘ) কোনোটি নয়

২। শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে প্রয়োজন-
ক) পুঁজি খ) সদিচ্ছা গ) আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান ঘ) উপরের সবগুলো

৩। বাংলাদেশের শিল্পায়নের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা কোনটি?
ক) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা খ) দক্ষ শ্রমিকের অভাব
গ) অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা ঘ) কর্ম বিরতি

পাঠ-৮.৪ বাংলাদেশের সমাজে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রভাব

Impacts of Urbanization and Industrialization on Bangladesh Society

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের সমাজে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বাংলাদেশের সমাজ, নগরায়ণ, শিল্পায়ন, প্রভাব, পেশা, সংস্কৃতি।

বাংলাদেশের সমাজে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রভাব দু'দিক থেকে বিচার্য। ক) নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত হচ্ছে, খ) সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশে শিল্পায়নের গতি অনেকটা শ্লথ। তবে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব অনস্বীকার্য। অন্যদিকে চাহিদানুযায়ী নাগরিক সুযোগ সুবিধা ছাড়াই নগরায়ণ হচ্ছে। ফলে সমাজে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তবে নগরায়ণ ও শিল্পায়ন আমাদের সমাজ কাঠামো তথা সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তনের নতুন ধারার সূচনা করেছে।

বাংলাদেশের সমাজে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রভাব

নগরায়ণ ও শিল্পায়ন সমাজে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। সামাজিক পরিবর্তনে এর প্রভাব অনেকটা তাৎপর্যপূর্ণ। ভূমিকা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১। **কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** নগরায়ণও শিল্পায়নের ফলে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি হয়। এতে গ্রামীণ সমাজ থেকে আগত ব্যক্তিবর্গ কাজের সুযোগ পায়। নিজেদেরকে দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেতেও নগর জীবন অধিকতর সহায়ক।

২। **স্থানান্তর গমন ত্বরান্বিত হয়:** নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে গ্রাম ছেড়ে নগরে স্থানান্তরের মাত্রা বেড়ে যায়। উন্নয়নকামী দেশের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি অংশ কর্মসংস্থানের তাগিদে নগরে পাড়ি জমায়। আমাদের সমাজেও এধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

৩। **সমাজ কাঠামোয় পরিবর্তন:** নগরায়ণ ও শিল্পায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হলো সমাজ কাঠামোয় পরিবর্তন। তাছাড়া নগরে বিভিন্ন বিষয়ে বহুমুখী সুযোগ-সুবিধা থাকায় সমাজের নানা শ্রেণির মানুষ শহরে ভীড় জমায়। র উদ্ভব ঘটে। এর ফলে সমাজের স্তরবিন্যাসের তথা শ্রেণি কাঠামোয় পরিবর্তন হয়। এ প্রেক্ষিতে সমাজ কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয়। সমাজের মানুষের মধ্যে পেশাগত বৈচিত্র্য থাকায় সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায়ও এর ব্যতিক্রম কিছু নয়।

৪। **সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি:** নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন পেশার সুযোগ থাকায় নগরবাসীদের মধ্যে দ্রুতগতিতে আর্থ-সামাজিক ও মর্যদাগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

৫। **আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশ ঘটে:** নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও বিকাশ ঘটে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, বহুমুখী সংস্কৃতি, পারস্পরিক সম্পর্ক, দৈনন্দিন জীবন-যাপন প্রভৃতি ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও বিকাশে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।

৬। **গ্রামীণ জীবনে প্রভাব:** গ্রামীণ সংস্কৃতি তথা গ্রামীণ জীবনের উপর নগর সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। গ্রামের ঐতিহ্যবাহী জীবনপ্রণালী যেমন- ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, সাংস্কৃতিক আচার-প্রথা, ঐতিহ্য ইত্যাদিতে যেমন পরিবর্তন হয় তেমনি বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রেও নগরের প্রভাব গ্রামীণ জীবনের উপর গিয়ে পড়ে।

৭। **দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন:** জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে নগরায়ণ ও শিল্পায়ন অনেকাংশে দায়ী। কেননা নগরাবাসীরা তুলনামূলকভাবে বেশি বাস্তববাদী, বেশি গণতান্ত্রিক চেতনার অধিকারী। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধের ক্ষেত্রেও নগরের অধিবাসীরা বেশি অগ্রগামী। নগরবাসীরা তুলনামূলকভাবে বেশি রাজনীতি সচেতন। ধর্মনিরপেক্ষতায়ও তারা অধিকতর অগ্রসর।

৮। **আন্তর্জাতিক যোগাযোগ:** নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে বর্হিবিশ্বের সাথে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অনেক বৃদ্ধি পায়। শিল্পায়ন এবং নগরায়ণ বিশ্বায়নকে ত্বরান্বিত করে। বিশ্বায়নের ফলে নানা ক্ষেত্রে আন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগাযোগে নতুন গতি সঞ্চারিত হয়েছে।

নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রভাবে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যা

নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে যেসব সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয় সেগুলো হচ্ছে:

আবাসিক সমস্যা: আবাসিক সমস্যা বাংলাদেশের নগর সমাজের সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। নগরে বসবাসরত অধিকাংশেরই নিজের বাড়ি নেই এবং তারা ভাড়াবাড়িতে বসবাস করেন। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের জন্য সমস্যাটি চরম সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। আবাসিক সমস্যার কারণে শহরের যেখানে-সেখানে বস্তি গড়ে ওঠে এবং ভাসমান লোকজন রাস্তাঘাটে রাত কাটায়। গত তিন দশকে শহরগুলোতে নানা কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে আবাসিক সমস্যা আরও প্রকট রূপ ধারণ করেছে। সরকারি প্রচেষ্টায় এবং বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের হাউজিং সোসাইটির মাধ্যমে আবাসিক সমস্যার সমাধানের যে প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে তা একদিকে যেমন প্রয়োজনের তুলনায় কম অন্যদিকে ঐগুলো নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের অনেকেরই আর্থিক সামর্থ্যের বাইরে। ফলে নগরের নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য আবাসিক সমস্যা তাদের মৌলিক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত।

পরিবেশ দূষণ: পরিবেশ দূষণ নগর জীবনের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যা শুধু জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি নয়, পরিবেশ, প্রতিবেশ ও বাস্তুব্যবস্থাপনার জন্যও ঝুঁকিপূর্ণ। কল-কারখানা ও গাড়ি থেকে কালো ধোঁয়া নির্গত হওয়ার ফলে বায়ু দুষিত হচ্ছে। নগরের বাস-ট্রাক ও অন্যান্য গাড়ির হর্ন থেকে শব্দ দূষণ হয়। তাছাড়া মাইক বা লাউড স্পিকার ব্যবহারের ফলেও শব্দ দূষণ বৃদ্ধি পায়। সামান্য বৃষ্টিতেই রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে জলাবদ্ধতা তৈরি হয়। এর ফলে পানি দূষিত হয়। পানির পাইপ ফেঁটেও এ সমস্যা তৈরি হচ্ছে। শহরের নিম্ন অঞ্চলের ডোবা জায়গায় সহজেই বৃষ্টির পানি জমে। এর কারণে মশার বংশ বৃদ্ধি পায়। এভাবে নগর জীবন জনস্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ট্রাফিক জ্যাম: রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন বড় বড় শহরগুলোতে জনসংখ্যা এবং যানবাহন মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে রাস্তায় চলাফেরা কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন শহরগুলোতে অগণিত মানুষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, শিল্প-কল-কারখানায় ছুটে চলে। নগরজীবনে ট্রাফিক জ্যাম একটি নিত্যদিনের অসহনীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এছাড়া এর কারণে গন্তব্যস্থলে সময়মত পৌঁছানো দুষ্কর হয়ে পড়েছে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে অর্থনীতি, উৎপাদন ব্যবস্থা এবং জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে।

বেকারত্ব: নগর জীবনে বেকারত্ব অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। জনসংখ্যার তুলনায় আমাদের দেশে কর্মক্ষেত্র সীমিত। এছাড়া পরিকল্পনা ছাড়াই অনেক ক্ষেত্রে নগরের বিকাশ ঘটছে। কখনো কখনো অতি নগরায়ণ এ সমস্যাকে আরো প্রকট করে তুলেছে। গ্রাম ছেড়ে শহরে জনসংখ্যা প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। এসব জনসংখ্যার প্রায় সবাই নগরে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ছুটে যায়। আমাদের দেশে স্বল্প শিল্পায়িত ও অশিল্পায়িত নগরগুলো ক্রমবর্ধমান নগরবাসীর কর্মসংস্থানে সক্ষম হয় না। ফলে নগরে বেকারত্বের সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অপরাধ: সম্প্রতি বাংলাদেশের নগরগুলো প্রাপ্তবয়স্ক ও কিশোর অপরাধ মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সামান্য ছোট-খাটো অপরাধ থেকে শুরু করে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, ধর্ষণ, সন্ত্রাস, খুন, নারী নির্যাতন ইত্যাদি অপরাধ নিত্যদিনের। আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ইন্টারনেট সন্ত্রাস ও যৌনতাকে উস্কে দিচ্ছে। হাল ফ্যাশনের জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়লেও সেগুলো আয়ত্বে আনার আর্থিক সামর্থ্য না থাকার ফলেও অপরাধ প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বস্তুত নগরজীবনে অপরাধ করে সহসাই জনসমুদ্রে গা-ঢাকা দেওয়া যায়। এখানে কেউ কাউকে চেনে না। এটাও অপরাধ সংঘটনের অনুকূলে কাজ করে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য সংখ্যা কম ও তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ, সহায়তা ও পৃষ্ঠপোশকতা না থাকায় অপরাধ প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ অনেকটা কঠিন।

মাদকাসক্তি: মাদকাসক্তি এক ধরনের সামাজিক সমস্যা যা নানা ধরনের অপরাধের জন্য দায়ী। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার দণ্ডনীয় অপরাধ। ইদানিং বাংলাদেশের নগরগুলোতে মাদকাসক্তি মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করেছে। মাদকাসক্ত ব্যক্তির অধিকাংশই বয়সে তরুণ। এরা কেউ হতাশা কেউবা কৌতুহলবশত মাদকাসক্ত হচ্ছে। মাদকাসক্ত ব্যক্তি নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন করছে। তাছাড়া বিপন্ন করছে তার পরিবারকেও সর্বোপরি নানাবিধ অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে সৃষ্টি করছে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা।

পারিবারিক ভাঙ্গন: নগরায়ণ এবং শিল্পায়নের অন্যতম প্রভাব হলো পারিবারিক ভাঙন। গ্রামে যৌথ পরিবার ভেঙে যাবার এবং নগরে অনুপরিবার সৃষ্টির পিছনে নগরায়ণ এবং শিল্পায়ন কম দায়ী নয়। গ্রামের একই যৌথ পরিবারের সদস্য নগরে এসে

অকৃষিজ পেশায় যোগ দিয়ে সাধারণত অনু পরিবারই গড়ে তোলে। এ ছাড়া নগরে শিক্ষিত স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিত্বে সংঘাতের করণে বিবাহ বিচ্ছেদ বৃদ্ধি পায়।

অশ্লীলতা: নগর জীবনের অন্যতম সমস্যা হলো অশ্লীলতা। টেলিভিশনের কিছু চ্যানেল, ইউটিউবে এমনসব ছবি দেখা যায় যা আমাদের প্রথা, ঐতিহ্যও সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থি। অশ্লীল পত্র-পত্রিকাও নগরের জনগোষ্ঠী বিশেষ করে তরুণ সমাজকে বিপথগামী হতে সহায়তা করে। নগরে পেশাগত এবং ভাসমান যৌনকর্মীদের উপস্থিতিও সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। দারিদ্র্যসহ বিভিন্ন কারণে নগরে যৌনকর্মীদের তৎপরতা দেখা যায়। এর প্রভাবে সমাজে শৃঙ্খলা ও মূল্যবোধ বিঘ্নিত হয় এবং নানা ধরনের যৌনরোগের বিস্তার ঘটে এবং যৌন সহিংসতা বৃদ্ধি পায়।

গোলযোগ ও সংঘাত জনিত সমস্যা: আমাদের নগর জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গোলযোগ ও সংঘাত নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, মাস্তানি, আধিপত্য বিস্তার, রাজনৈতিক সংঘাত নগর জীবনকে অস্থির করে তোলে। তাছাড়া, শিল্প কারখানায়, যানবাহনে, ঘনবসতিপূর্ণ বস্তি এলাকায় ও জনাকীর্ণ রাস্তাঘাটে বিভিন্ন ধরনের গোলযোগ ও সংঘাত সংঘটিত হয়ে থাকে।

মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা: নগরবাসীরা গ্রামবাসীর তুলনায় অধিকতর মানসিক দুশ্চিন্তায় ভোগেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি, সীমিত আয় দিয়ে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্ব গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার সমস্যা নগরবাসীকে সদা ব্যস্ত রাখে। ফলে নগরের অধিবাসীরা হৃদরোগ, উচ্চ রক্ত চাপ ইত্যাদি ব্যধিতে আক্রান্ত হন যার মূলে রয়েছে মানসিক দুশ্চিন্তা।

সাংস্কৃতিক সংঘাতজনিত সমস্যা: নগরের বিভিন্ন এলাকার নানা মনমানসিকতার মানুষ পাশাপাশি বসবাস করেন। এদের জাত, বর্ণ, শ্রেণি, পেশা, বংশ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, রীতিনীতি সবই আলাদা। ফলে প্রায়শ একে অপরের সাথে খুব বেশি আন্তরিক সম্পর্কে আবদ্ধ নন। সামগ্রিকভাবে এরা নগর সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হলেও সবার ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, সামাজিকীকরণ আলাদা। ফলে নগরে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টি হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাবগুলো চিহ্নিত করুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

শিল্পায়ন ও নগরায়ণ বাংলাদেশের সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করছে। আমাদের অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতিসহ দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এর প্রভাব অনস্বীকার্য। এ প্রভাব ইতিবাচক হতে পারে, আবার নেতিবাচকও হতে পারে। তবে পরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়ণ নেতিবাচক প্রভাব প্রশমিত করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নগরায়ণ ও শিল্পায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব কোনটি?
ক) স্তরবিন্যাসের পরিবর্তন খ) সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন
গ) পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন ঘ) সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন

২। শহরগুলোতে বস্তি গড়ে ওঠার যথার্থ তাৎপর্য কোনটি?
ক) মাদকাসক্তি খ) ট্রাফিক জ্যাম গ) আবাসিক সমস্যা ঘ) পরিবেশ দূষণ

৩। নগরায়ণ ও শিল্পায়ন উভয় প্রত্যয়টির মাধ্যমে সমাজে কোন দিকটি ফুঁটে ওঠে?
ক) নতুন নতুন কর্ম ক্ষেত্র খ) আর্থিক সংকট গ) নগরের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘ) বেকার সমস্যা

৪। শহরের লোকসংখ্যা প্রনিয়ত অভাবনীয় মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে সমাজে কোনটি সমস্যা লক্ষ করা যায়?
ক) টেনশন বৃদ্ধি খ) যানবাহন সমস্যা গ) কাজের গতিহ্রাস ঘ) ট্রাফিক জ্যাম

পাঠ-৮.৫ বাংলাদেশের পোশাক শিল্প এবং এর আর্থ-সামাজিক প্রভাব
Garments Industry of Bangladesh and Its Socio-Economic Impacts

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের আর্থ-সামাজিক প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পোশাক শিল্প, আর্থ-সামাজিক প্রভাব, শ্রমিক, দক্ষতা।

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অবলম্বন হলো শিল্পায়ন। বাংলাদেশে অথনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত হচ্ছে পোশাক শিল্প। রপ্তানী আয়, জিডিপিতে অবদান, কর্মসংস্থান প্রভৃতি বিবেচনা করে পোশাক শিল্পকেই বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ শিল্প বলে অভিহিত করা যায়, যা বিশ্ববাজারে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট রপ্তানির আয়ের প্রায় ৮৫ শতাংশ এসেছে বস্ত্র ও পোশাক শিল্প থেকে। একই অর্থ বছরে বস্ত্র ও পোশাক শিল্প থেকে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয় ছিল ২৯,১০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্তমানে বিশ লক্ষেরও বেশি মানুষ কাজ করে পোশাক শিল্পে।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের কয়েকটি শাখা রয়েছে। নিটওয়্যার, সোয়েটার, ডেনিম, আন্ডারওয়্যার ইত্যাদি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের বিশেষত্ব হচ্ছে, এ খাতের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৮৫ শতাংশ নারী শ্রমিক। এ শিল্পের উন্নয়নে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং এক্সপোর্টার এ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ দেশে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়। তবে আমেরিকা, কানাডা, জার্মানি, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো বাংলাদেশি পোশাক শিল্পের বড় বাজার। বাংলাদেশের শিল্পায়নে পোশাক শিল্প সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ শিল্পের মত আর কোনো শিল্প দ্রুত বিস্তার লাভ করেনি। তবে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের বর্তমান অগ্রগতি রাতারাতি সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতার পর থেকেই ধীরে ধীরে এ শিল্পের বিকাশ হয়েছে।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে টেক্সটাইলস মিলস কর্পোরেশন নামে আলাদা একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। ১৯৮২-৮৩ সালে বিটিএমসি এর নিয়ন্ত্রণে মোট ২২টি টেক্সটাইল মিল ছিল। ঐ বছর ২টি নতুন মিলসহ ১টি পুরাতন মিল চালু হয় এবং মোট মিলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৩টি। এ বছর মিলসমূহের ৯৬০.৬০ লক্ষ পাউন্ড সুতা এবং ৫৪৬.০০ লক্ষ গজ কাপড় উৎপাদনের লক্ষ মাত্রা নির্ধারণ করে। ১৯৮৫-৮৬ সালে আরও ৫টি বিশেষ ধরনের মিল চালু হয়। ১৯৮৭-৮৮ সালে ৩৬টি সুতা ও বস্ত্রকল এবং ৫টি বিশেষ মিলসহ মোট ৪১টি মিল চালু হয়। এ ধারা নব্বইয়ের গোটা দশক জুড়ে অব্যাহত ছিল। একবিংশ শতকের প্রথম দশকে এসেও বস্ত্র এবং তৈরি পোশাক শিল্পের অগ্রযাত্রায় ছেদ পড়েনি। তবে বাংলাদেশের বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্পে ঘাটতি এবং ঝুঁকিও কম নেই। এসব ঘাটতি ও ঝুঁকি মোকাবিলা করা সম্ভব হলে এদেশের বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের ব্যাপ্তি আরো অনেক বৃদ্ধি পাবে। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১। **উৎপাদিত পণ্যে বৈচিত্র্য আনয়ন:** বাংলাদেশে তৈরিকৃত পোশাক পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশে রপ্তানি হয়। রপ্তানীতে অনেক দেশের সাথে প্রতিযোগিতার মুখোমুখী হতে হয়। উৎপাদিত পণ্যে বৈচিত্র্য না থাকলে বিদেশী ক্রেতা আকৃষ্ট হবে না এবং প্রতিযোগিতায়ও টিকে থাকা সম্ভব হবে না।

২। **শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি এবং কাজের পরিবেশ উন্নত করা:** বাংলাদেশের বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের মানসম্মত বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা জরুরি। তাদের কাজের পরিবেশ, নিরাপত্তা ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার, দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে দৃশ্যমান অগ্রগতি ব্যতীত এ শিল্পের কাঙ্ক্ষিত উন্নতি সম্ভব নয়।

৩। **শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি:** বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত মোট শ্রমিকের সিংহভাগই নারী। এদের বেশিরভাগ আবার নিরক্ষর, স্বল্পশিক্ষিত এবং অদক্ষ। ফলে শ্রমিক হিসেবে অধিক শ্রম প্রদান করার পরেও তারা কম মজুরি পায়। কারণ দক্ষতার

অভাবে তারা উৎকৃষ্টমানের পোশাক উৎপাদন করতে পারে না। দক্ষ জনবলের জন্য অনেক সময় বিদেশিদের উপর নির্ভর করতে হয়। এতে বিরাট অংকের বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয়। সুতরাং পোশাক শিল্পের উন্নয়নে দক্ষ জনবল তৈরি করা অপরিহার্য।

৪। **দেশীয় কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধি:** বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের উৎপাদন, বাজারজাতকরণ এবং রপ্তানিতে প্রচুর কাঁচামালের প্রয়োজন হয়। এসব কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। ফলে আমদানি শুল্কসহ পণ্যের মূল্য অনেক বেশি পড়ে। তাই প্রয়োজনীয় কাঁচামাল দেশে উৎপাদন করা সম্ভব হলে পোশাক শিল্পের আরো সমৃদ্ধি ঘটবে।

৫। **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা:** অতীতে বাংলাদেশের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে তৈরি পোশাক শিল্প প্রায়ই ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিদেশি বিনিয়োগকারী এবং ক্রেতাদেরকে এদেশে আসতে নিরুৎসাহিত করে।

৬। গ্যাস-বিদ্যুৎ এবং অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা: বাংলাদেশের বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের অন্যতম বাধা হচ্ছে গ্যাস-বিদ্যুতের অভাব এবং দুর্বল অবকাঠামোগত সহযোগিতা। বন্দর, রাস্তা-ঘাট, পরিবহণসহ নানা বিষয়ে শিল্পের জন্য অনুকূল সহায়তার অভাব রয়েছে। এসব সীমাবদ্ধতা দূর না হলে আগামীতে দেশের বস্ত্র ও পোশাক শিল্পকে আরো ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হতে পারে।

পোশাক শিল্পের আর্থ-সামাজিক প্রভাব

পোশাক শিল্পের দ্রুত প্রসার, বিকাশ, উন্নতি ও সম্প্রসারণ বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে। ২০১২ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী বাংলাদেশে জাতীয় আয়ে পোশাক ও বস্ত্র খাতের অবদান ৩১.৬ শতাংশ। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কর্মসংস্থান, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে পোশাক শিল্পের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের অবদান জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি বৃহৎ অংশ। নারীর ক্ষমতায়নেও পোশাক শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। বস্ত্র এবং তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক খাতে যে অবদান রাখছে এখানে সংক্ষেপে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১। **কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকারত্ব হ্রাস:** বস্ত্র ও পোশাক শিল্প দেশের অন্যতম বৃহৎ কর্মক্ষেত্র। শিক্ষিত মানুষের পাশাপাশি দেশের বিপুলসংখ্যক নিরক্ষর এবং স্বল্পশিক্ষত মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে পোশাক শিল্প।

২। দারিদ্র্য বিমোচন: কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকারত্ব দূরীকরণের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে পোশাক শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতেও এ শিল্পের অবদান রয়েছে।

৩। **অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং জাতীয় আয়ে অবদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পোশাক শিল্পের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪। **নারীর ক্ষমতায়ন:** বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের মোট শ্রমশক্তির ৮৫ শতাংশ নারী। সমাজের নিম্নবিত্ত, নিরক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিত পরিবার থেকে উঠে আসা নারীরা কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদেরকে পরিবার এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অধিকতর অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

৫। **নগরায়ণকে ত্বরান্বিত করছে:** তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের নগরায়ণকে ত্বরান্বিত করেছে। গ্রামের বিপুলসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এ শিল্পে। কর্মসংস্থানের প্রয়োজনেই গ্রামের মানুষ শহরে এসে শহরকে আরো বিস্তৃত করেছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে শহরের বাইরে তৈরি পোশাকের শিল্প-কারাখানা স্থাপন করা হয়েছে। ওই শিল্প-কারাখানাকে ঘিরে জনপদটি ক্রমশ নগরের রূপ লাভ করেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের উন্নয়নে পাঁচটি সুপারিশ এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব চিহ্নিত করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ সামাজিক কাঠামোর মূল ভিত্তিকে মজবুত করতে পোশাক ও বস্ত্র শিল্প সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তৈরি পোশাক শিল্পে দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা দেশের বেকারত্ব সমস্যার সমাধানে তাৎপর্য অবদান রাখছে। দেশের দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নেও এ শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে আমাদের অর্থনীতি ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের শতকরা কত ভাগ পোশাক শিল্প হতে আসে?

ক) ৫০% খ) ৭৬%

গ) ৮৫% ঘ) ১০০%

২। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের শিল্পায়নের শ্রেষ্ঠ খাত কোনটি?

ক) পাটশিল্প খ) চিনি শিল্প

গ) পোশাক শিল্প ঘ) মৃৎশিল্প

ইউনিট- এর উত্তরমালা:

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১ : ১। খ ২। ক ৩। ক ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২ : ১। ক ২। ঘ ৩। ঘ ৪। গ ৫। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩ : ১। গ ২। ঘ ৩। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪ : ১। খ ২। গ ৩। গ ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৫ : ১। খ ২। ক ৩। ক ৪। ঘ ৫। খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১। নগরায়ণ শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ কোনটি?

ক) Industrilization খ) Urbanization

গ) Socialization ঘ) Generation

২। শিল্প বিপ্লব কোথায় সংঘটিত হয়?

ক) ইউরোপ খ) রাশিয়ায়

গ) জাপানে ঘ) বাংলাদেশে

৩। মেগাসিটি কী?

ক) কোনো শহরের লোক সংখ্যা ১ কোটি বা তদুর্ধ বোঝাতে

খ) কোনো দেশের লোকসংখ্যা ১ লক্ষ বা তদুর্ধ বোঝাতে

গ) কোনো বিভাগের লোক সংখ্যা ৫০ হাজার বা তদুর্ধ

ঘ) কোনো ইউনিয়নের লোক ১০ হাজার বা তদুর্ধ

৪। গ্রাম ছেড়ে শহরে স্থানান্তরিত হওয়ার কারণ-

i. গ্রামে কর্মসংস্থানে অভাব

ii. গ্রামে অর্থনৈতিক সংকট

iii. গ্রামে নদী ভাঙন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। নগরবাসীর প্রধান আয়ের উৎস-

i. চাকুরী

ii. ব্যবসা বাণিজ্য

iii. চিকিৎসা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

খ) সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন

আদৃতা এবার সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। সে তার স্কুল থেকে পাওয়া পাঠ্য বইগুলো দেখে খুব খুশি। বইয়ের রঙিণ কাগজগুলো খুবই উন্নতমানের এবং বাধাইও খুব ভালো। বইগুলো দেখে আদৃতার বাবা বলেন, আমাদের সময়ে বছরের কয়েক মাস পেরিয়ে যেত, তবুও বই হাতে পেতাম না। আমাদের বইগুলো এখনকার বইগুলোর মতো এত উন্নত ছিল না।

ক) নগরায়ণ ও শিল্পায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব কী? ০১

খ) নগরায়ণ ও শিল্পায়নের দুটি প্রভাব উল্লেখ করুন। ০২

গ) আদৃতার পাঠ্য বইগুলোর মধ্যে আপনি কোন সমাজের বৈশিষ্ট্য খুঁজে পান? ব্যাখ্যা করুন। ০৩

ঘ) 'শিল্পায়ন কেবল সুফল বয়ে আনে না, অনেক সমস্যাও তৈরি করে' কীভাবে? ব্যাখ্যা করুন। ০৪

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন
Social Change and Development of Bangladesh

ইউনিট ৯

কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জীবন হচ্ছে চিরায়ত বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্য। এদেশের সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি সবকিছু গ্রামীণ ও কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু সমাজ একটি জায়গায় স্থির থাকে না। বহমান নদী যেমন সাগরের দিকে ছুটে চলে, তেমনি সমাজও সামনের দিকে অগ্রসর হয়, পরিবর্তিত হয়। বস্তুত প্রকৃতিগতভাবেই সমাজ পরিবর্তনশীল। মানুষের চেষ্টা ও চাহিদার সাথে সমন্বয় রেখে এ পরিবর্তন সাধিত হয়। তবে স্থান ও কালভেদে সমাজ পরিবর্তনের গতি ও মাত্রা সমান হয় না। এ পরিবর্তন কোথাও দ্রুত হয় আবার কোথাও মন্থর। আবার অনেক সময় দেখা যায় একই সমাজের সকল অংশে সমান গতিতে পরিবর্তন হয় না। যেমন- বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের বিভিন্ন অঞ্চল এবং ভৌগোলিক অবস্থান ভেদে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর পরিবর্তনের গতি বহুমাত্রিক। সমাজের যে অংশে শিল্পায়ন ও শহরায়ণের প্রভাব, শিক্ষার সম্প্রসারণ, প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ ও উন্নত যোগাযোগসহ নানা ধরনের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা বিদ্যমান সে অঞ্চলে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে।

বর্তমান সমাজের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হচ্ছে উন্নয়ন। উন্নয়নও একধরনের পরিবর্তন। এ পরিবর্তন সমৃদ্ধির ও কল্যাণকর। সাধারণভাবে উন্নয়ন বলতে সার্বিকভাবে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও পরিবেশগত উন্নয়নকে বুঝায়। সনাতন উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় রূপান্তর প্রক্রিয়াকে উন্নয়ন বলা হয়। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিশেষ রূপই হচ্ছে সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক পরিবর্তন। সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে সমাজের মানুষের সমতাভিত্তিক উন্নয়ন। এখানে দারিদ্র্য বিমোচন, সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বন্টন, মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি, সঞ্চয়, মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত। বর্তমান অধ্যায়ে সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৫ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৯.১ : সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের ধারণা
পাঠ-৯.২ : বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ
পাঠ-৯.৩ : বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষা ও গণমাধ্যমের ভূমিকা
পাঠ-৯.৪ : বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে প্রযুক্তির প্রভাব:
উৎপাদন প্রযুক্তি, পরিবহন প্রযুক্তি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
পাঠ-৯.৫ : বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাব

পাঠ-৯.১ সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের ধারণা
Concept of Social Change and Development

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সমাজ, পরিবর্তন, উন্নয়ন, জীবনধারা, সামাজিক কাঠামো, সামাজিক সম্পর্ক।

সামাজিক পরিবর্তন

মানব সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। প্রাচীন সমাজ থেকেই এ পরিবর্তন ক্রিয়াশীল। ফলে সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্যবিষয়ের মধ্যে একটি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন। সাধারণভাবে সামাজিক পরিবর্তন বলতে সমাজ ব্যবস্থা বা সামগ্রিক আচরণের মৌলিক পরিবর্তনকে বুঝায়। সামাজিক পরিবর্তন বলতে সামাজিক কাঠামোর পুনর্গঠন বা রূপান্তরকেও চিহ্নিত করা যায়। তবে 'পরিবর্তন' শব্দটি রূপান্তরমূলক, উৎপত্তিমূলক নয়। বস্তুত সমাজের একটি বিশেষ রূপ থেকে অন্য একটি রূপ ধারণ করাকেই সামাজিক পরিবর্তন বলে। এ রূপান্তর কখনও স্থায়ী আবার কখনও অস্থায়ী হয়। কখনো, দ্রুত গতির আবার কখনো মন্থর। সমাজে অনেক সময় বাহ্যিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, আবার কখনও অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনও দেখা যায়। পরিবর্তনশীলতার কারণেই মানব সমাজ আদিম দশা, বন্য দশা ও বর্বর দশা অবস্থা অতিক্রম করে আধুনিক উন্নত ও যৌক্তিক সমাজে উপনীত হয়েছে। এ পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সমাজ অনাগত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে। সামাজিক পরিবর্তন মূলত সমাজের অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতিসহ সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনকে বুঝায়।

সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা

স্থান-কাল-পাত্রভেদে সামাজিক পরিবর্তন বিভিন্ন প্রকৃতির হয়। সমাজবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন সংজ্ঞায়ও এর প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। যেমন সমাজবিজ্ঞানী স্যামুয়েল কোয়েনিগ বলেছেন, "সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে মানুষের জীবনধারার পরিবর্তন।" সমাজবিজ্ঞানী Robertson এর মতে, "সময়ের ব্যবধানে সামাজিক আচরণ, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান এবং সর্বপোরি সমাজ কাঠামোর ধরনের মধ্যে যে রদবদল হয় তাকে সামাজিক পরিবর্তন বলে।"

নৃ-বিজ্ঞানী ম্যাকেঞ্জি বলেছেন, "সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে নিহিত থাকে সামাজিক সম্পর্কের কাঠামোর পরিবর্তন। অর্থাৎ সামাজিক ভূমিকা ও তাদের সম্পর্কের পরিবর্তন, দল ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার সম্পর্কের পরিবর্তনই সামাজিক পরিবর্তন।"

সমাজবিজ্ঞানী Kingsley Davis এর মতে, "সামাজিক পরিবর্তন হলো সমাজ কাঠামোর কার্যাবলির পরিবর্তন।"

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভারের মতে, "সমাজের অভ্যন্তরে যে সকল সামাজিক সম্পর্কের রদবদল হচ্ছে তাই সামাজিক পরিবর্তন।"

Jon.M Shepard তাঁর Sociolgy গ্রন্থে বলেন,- "Social change is the alterations in social structures that have long-term and relatively important consequences."

T. Bottomore এর মতে, "সামাজিক পরিবর্তন হলো সমাজের আয়তন ও কাঠামো তথা বিশেষ বিশেষ সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন।"

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনধারা, রীতিনীতি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, শিল্পকলা, সাহিত্য, বস্তুগত ও অবস্তুগত এবং অবস্থানগত সকল পরিবর্তনের সমষ্টিই হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন। মূলত মানব সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক রূপের পরিবতনই হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন।

সামাজিক উন্নয়ন

'উন্নয়ন' কথাটি সকল ক্ষেত্রে ইতিবাচক অর্থে প্রয়োগ করা হয়। সামাজিক উন্নয়ন বলতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন, মানব সম্পদের বিকাশ, কাম্যজনসংখ্যা, পরিবেশ ও সামাজিক খাতের পূর্বাবস্থা থেকে অপেক্ষাকৃত উন্নততর অবস্থার পরিবর্তনকে বোঝায়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবনমান, আয়ুষ্কাল, মানবসম্পদ ইত্যাদি খাতে একটা দেশ উন্নয়নের কোন স্তরে অবস্থান করছে তার চিত্র সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

মনীষী James Midgley সামাজিক উন্নয়নকে পরিকল্পিত পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে বলেছেন, "সামাজিক উন্নয়ন হলো গতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমগ্র জনগোষ্ঠীর মঙ্গলজনক অবস্থার উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন আনয়নের প্রক্রিয়া।"

উন্নয়ন প্রসঙ্গে ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, "জীবদেহের উন্নয়ন হলো তার জীবনের উন্নতি, আর সামাজিক উন্নয়ন হলো তার সভ্যদের মধ্যে যে জীবন আছে তার উন্নতি। তাই ব্যক্তিকে কোনভাবেই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না।"

'সামাজিক উন্নয়ন' প্রত্যয়টিকে তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমত, শিল্প বিস্তারের পর থেকে সমবায় আন্দোলন, সামাজিক কর্ম ও কমিউনিটি উৎপাদন। দ্বিতীয়ত, আধুনিকীকরণের সমার্থক হিসেবে, তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে সমাজের বিস্তৃত পরিসরে উন্নয়ন ভাবনা। ষাটের দশক থেকে সামাজিক উন্নয়ন প্রত্যয়টি ব্যবহার হচ্ছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন, দাতাসংস্থা, এনজিও প্রভৃতি প্রত্যয়টির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিক পরিবর্তন ও সামাজিক উন্নয়নের সম্পর্ক নিরূপণ করুন। **সময় : ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজ পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই সমাজ আদিম অবস্থা থেকে আজকের আধুনিক অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। গ্রামীণ ও কৃষিভিত্তিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার স্থানে আজ শহুরে শিল্প অর্থনীতির আধিক্য। আজকের সমাজ আবার বিশ বছর কিংবা একশ বছর পরে পুরনো হয়ে যাবে। গড়ে উঠবে নতুন সমাজ। এটিই সামাজিক পরিবর্তন। সামাজিক উন্নয়ন প্রত্যয়টিও ঘনিষ্ঠভাবে সামাজিক পরিবর্তনের সাথে যুক্ত। তবে উন্নয়ন হচ্ছে সমাজের অগ্রগতি বা ইতিবাচক পরিবর্তন, যেখানে অর্থনীতি এবং জীবনমান বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সমাজ জীবনের অর্থনৈতিক অঙ্গনে ইতিবাচক পরিবর্তনের ফলে কী হয়?

ক) জনসংখ্যাবৃদ্ধি পায় খ) জলবায়ুর পরিবর্তন হয় গ) জীবন যাত্রার মান উন্নত হয় ঘ) শিক্ষার হার বৃদ্ধি পায়

২। সমাজ পরিবর্তনের মুখ্য কারণ হচ্ছে-

ক) ধর্ম খ) সংস্কৃতি গ) প্রযুক্তি ঘ) উৎপাদন ব্যবস্থা

৩। বর্তমান বিশ্বে বহুল ব্যবহৃত প্রত্যয় কোনটি?

ক) প্রগতি খ) উন্নয়ন গ) বিবর্তন ঘ) পরিবর্তন

পাঠ-৯.২ বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ
Causes of Social Change in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অর্থনীতি, সমাজ, রাজনীতি, ভৌগোলিক পরিবেশ, শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, উন্নত প্রযুক্তি।

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনের কতগুলো কারণ রয়েছে যা নিম্নরূপ:

১) জনসংখ্যা বৃদ্ধি: জনসংখ্যা বৃদ্ধি সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। কোন সমাজের জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি এবং গঠন প্রকৃতির পরিবর্তনের ফলে সমাজের পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ও দলীয় জীবনে পরিবর্তনের সূচনা হয়। আমাদের দেশের সীমিত ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে যেটুকু ভূমি রয়েছে তার তুলনায় আমাদের জনসংখ্যা অনেক বেশী। বাংলাদেশ ঘনবসতির দেশ। ভূমির তুলনায় জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়ায় দ্রুত বৃদ্ধির কারণে সমাজে বিভিন্নমুখী পরবর্তন সাধিত হচ্ছে।

২) অর্থনৈতিক কারণ: অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই অর্থনৈতিক অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটলে তা সামাজিক পরিবর্তনকেও ত্বরান্বিত করে। জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন উপাদান যেমন- শিল্পায়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য, ঋনপ্রদান নীতি, মুদ্রাস্ফীতি, জিডিপি, মাথাপিছু গড় আয়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে এ দেশে সামাজিক পরিবর্তন হয়ে থাকে।

৩) সামাজিক কারণ: বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হয়। যেমন সম্প্রতি বাংলাদেশ অনুন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত হয়েছে যার প্রভাবে সমাজে নানা ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এছাড়াও নানাবিধ কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ, সামাজিক উন্নয়নের বাস্তবমুখী নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি সামাজিক কারণগুলোর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, নারী স্বাধীনতা, অপরাধমূলক তৎপরতা নিয়ন্ত্রণ, জঙ্গি, সন্ত্রাস ও মাদক নির্মূল গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদি কারণ অন্যতম।

৪) রাজনৈতিক কারণ: রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণের মুক্তচিন্তা, বাকস্বাধীনতা, সুশাসন, জবাবদিহিতার চর্চা বিকশিত হয়। অন্যদিকে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমাজে স্থবিরতা তৈরি করে। প্রগতিশীল ও মুক্তচিন্তার রাজনৈতিক আদর্শেও সাথে ধর্মভিত্তিক-মৌলবাদী রাজনৈতিক আদর্শের গুণগত পার্থক্য রয়েছে এবং সমাজে এর দৃশ্যমান প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

৫) ভৌগোলিক কারণ: প্রাকৃতিক পরিবেশে ভৌগোলিক কারণে মানুষের জীবন যাত্রা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সম্প্রতি গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া, ও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার প্রভাবে বাংলাদেশে আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও প্রবণতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে যা নান ধরনের নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করছে।

৬) শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব: বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রসার ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা দেশের সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করে তুলছে। এর ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান, জীবনবোধ ও আচার-আচরণে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পাশাপাশি নতুন ধারার সংস্কৃতি সংযোজন বা ভিন্ন সংস্কৃতির অনুপ্রবেশে সমাজে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাতে বিভিন্নমুখী সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

৭) ধর্মীয় প্রভাব: আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই ধর্ম চর্চা করে এবং এদের অধিকাংশ অনুভূতিসম্পন্ন। তাই এ দেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবন ধারায় ধর্মের প্রভাব অনস্বীকার্য। এজন্য বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন ধর্মীয় প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান ও মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে।

৮) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন: বাংলাদেশে নানা ধরনের উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে উৎপাদন ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। মানুষের জীবনধারায় নতুন নতুন প্রযুক্তি নির্ভর অত্যাধুনিক সামগ্রী ও সুবিধার দ্বার উন্মোচিত হয়। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের কারণে শিল্পায়ন ও শহরায়ণ ত্বরান্বিত হয়। এর ফলে সমাজে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়।

৯) প্রাকৃতিক দুর্যোগ: বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, বিশেষ করে নদী ভাঙ্গন, প্রলয়ংকরী অতি বন্যা, আকস্মিক বন্যা, বজ্রপাত, খরা টর্নেডো ইত্যাদির কারণে বহু মানুষ স্থানান্তর করতে বাধ্য হচ্ছে। যে কারণে নগরে ভাসমান মানুষের চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১০) আকাশ-সংস্কৃতির প্রভাব: ঔপনিবেশিক শাসন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ, বিদেশীদের আগমন এবং আচার-ব্যবহার, চাল-চলন প্রভৃতির প্রভাবে বাংলাদেশের সমাজে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যেমন- ইংরেজ শাসন এদেশের মানুষের জীবনধারাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিদেশী শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের ফলে সমাজের মানুষের চিন্তা-চেতনা, শিক্ষা-দীক্ষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, জীবনধারা প্রভৃতি পরিবর্তিত হচ্ছে যা সামাজিক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে।

১১) মনীষীদের প্রভাব: সমাজে প্রতিভাবান ও মনীষীদের আগমন এবং তাদের চিন্তাধারা, আচার-ব্যবহার, লেখনী প্রভৃতি সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রেখে চলেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এদেশে বিভিন্ন পির-ফকিরের আগমন, তাদের আদর্শের প্রচার, বিভিন্ন মনীষীদের লেখনী, বক্তৃতা-বিবৃতি, আন্দোলন প্রভৃতি সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে। পাশাপাশি বেগম রোকেয়ার প্রচেষ্টায় নারীদেরকে শিক্ষায় শিক্ষিত করে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও স্বনামধন্য কবি, সাহিত্যিক ও লেখকের লেখনীর মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তনের নব্য ধারার সৃষ্টি হয়েছে।

১২) বিভিন্ন এনজিও এর কার্যক্রম: সম্প্রতি বাংলাদেশে অনেক বেসরকারী সংস্থা তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। বিশেষ করে তাদের শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কার্যক্রম এবং ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি গ্রামীন জন গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে সহযোগিতা করছে। এর ফলে সমাজে পরিবর্তন সাধিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিক পরিবর্তনের কারণগুলো চিহ্নিত করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। এ পরিবর্তনের পিছনে বহুবিধ কারণ রয়েছে। কোনো একটি সমাজে বিপুল জনসখ্যার উপস্থিতি ওই সমাজকে বদলে দিতে পারে। উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনও সমাজকে পরিবর্তিত করে। শিক্ষা, প্রযুক্তির বিকাশ, আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবেও প্রতিনিয়ত বাংলাদেশের সমাজে পরিবর্তিত হয়। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, ভৌগোলিক প্রভাব, সচেতনতামূলক কার্যক্রমও বাংলাদেশের সমাজকে পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ভূমির তুলনায় জনসংখ্যা বেশি দ্রুত বৃদ্ধির ফলে কী হয়?

ক) উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় খ) জলবায়ুর পরিবর্তন হয়

গ) সমাজে বিভিন্নমুখী পরবর্তন সাধিত হয় ঘ) শিক্ষার হার হ্রাস পায়

২। সমাজে স্থবিরতা দেখা দেয় কেন?

ক) স্বৈরশাসনের ফলে খ) গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রভাবে

গ) মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি হলে ঘ) শিক্ষার প্রসার ঘটলে

৩। সমাজ পরিবর্তনে সাম্প্রতিক উপাদান কোনটি?

ক) শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা খ) আকাশ-সংস্কৃতি

গ) শিক্ষা ঘ) ভৌগোলিক অবস্থা

পাঠ-৯.৩ বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষা ও গণমাধ্যমের ভূমিকা
Role of Education and Mass Media in Social Change of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষা ও গণমাধ্যমের ভূমিকা বুঝিয়ে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বাংলাদেশ, শিক্ষা, গণমাধ্যম, সামাজিক পরিবর্তন, স্ব-আরোপিত নিয়ন্ত্রণ।

সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষার ভূমিকা

শিক্ষা মানুষের আচরণগত পরিবর্তন সাধন করে। সংস্কার থেকে মুক্তির মাধ্যমে সমাজের মূল্যবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রেও শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রেও শিক্ষা অত্যন্ত কার্যকর। সামগ্রিকভাবে শিক্ষা সামাজিক পরিবর্তনের সব থেকে বড় হাতিয়ার। সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষা যেসব ভূমিকা পালন করে সেগুলো নিম্নরূপ:

১) স্ব-আরোপিত নিয়ন্ত্রণ: শিক্ষা মানুষের মূল্যবোধকে সমৃদ্ধ করে। ব্যক্তিকে সচেতন, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষার ভূমিকা অনন্য। শিক্ষা ছাড়া ব্যক্তি তথা সমাজের প্রগতি, পরিবর্তন ও উন্নয়ন অসম্ভব। আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে শিক্ষা কার্যকর ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা মানুষের কু-সংস্কার দূর করে জ্ঞানের মাধ্যমে যৌক্তিক মানুষে রূপান্তর করে। শিক্ষিত ব্যক্তি অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অশোভন কাজ থেকে দূরে থাকে। কারণ, শিক্ষা মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়ক এবং সবধরনের যৌক্তিক দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করে।

২) চরিত্র গঠন ও শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি: শিক্ষা ব্যক্তির চারিত্রিক গুণাবলির বিকাশ ঘটায় এবং চরিত্রকে সমুন্নত করে। উন্নত চরিত্র গঠনের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যক্তির জীবনপ্রবাহকে সাবলিল করে। শিক্ষা উন্নত চরিত্র গঠনে এবং শৃঙ্খলাবোধ নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে সামাজিক ভারসাম্য তৈরি করে।

৩) নৈতিকতার উন্নয়ন: শিক্ষা ব্যক্তির নৈতিকতাকে উন্নত ও জাগ্রত করে তোলে। ব্যক্তির নৈতিকতার বিকাশ ঘটানোর মাধ্যমে সমাজ কাঙ্ক্ষিত পথে পরিচালিত হয়। ভালো-মন্দের পার্থক্য নিরূপণে সহায়তার মাধ্যমে শিক্ষা সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করে।

৪) সচেতন জনগোষ্ঠী তৈরি করে: শিক্ষা বাংলাদেশের সমাজে সচেতন জনগোষ্ঠী তৈরি করে। সচেতন এ জনগোষ্ঠী সমাজের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনে অবদান রাখছে। মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার, সুশাসন, গণতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে সোচ্চার থাকার মাধ্যমে এই সচেতন জনগোষ্ঠী সমাজকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যায়।

৫) গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিয়ামক: সামাজিক পরিবর্তনে অন্যতম নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে শিক্ষা। শিক্ষা মানুষের চরিত্র গঠন, মননশীলতা ও সুকুমারবৃত্তির উন্নয়ন ঘটায়। শিক্ষিত ব্যক্তি অবাঞ্ছিত আচরণ পরিহার করে। তাই বলা যায়, শিক্ষা সমগ্র সমাজব্যবস্থায় অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

৬) পেশাগত উন্নয়ন ঘটায়: শিক্ষা মানুষের পেশাগত উন্নয়ন ঘটায়। একজন নিরক্ষর মানুষের পেশার সাথে শিক্ষিত মানুষের পেশা এবং কাজের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ফলে শিক্ষিত সমাজে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অনেক বেশি হয়।

৭) সামাজিকীকরণে শিক্ষা: একটি শিশু সমাজের বাঞ্ছিত আচরণ সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখে না। শিক্ষার মাধ্যমে তার মধ্যে এ বোধ জাগ্রত হয়, সে ভালো-মন্দের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে। সমাজের দায়িত্বশীল সদস্য বা সুনাগরিক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা সর্বাধিক। যে সমাজে সব মানুষ শিক্ষিত তার সাথে নিরক্ষর একটি সমাজের পার্থক্য অত্যন্ত পরিষ্কার এবং দৃশ্যমান।

৮) পারিবারিক পরিবর্তন: শিক্ষা পরিবার কাঠামোয় পরিবর্তন সাধন করে। আধুনিক ও উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি অনু পরিবারে সাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। শিক্ষিত পরিবারের আর্দশ, আচরণ, মূল্যবোধ ও আত্মমর্যাদা নিরক্ষর পরিবার থেকে অনেক পৃথক।

৯) উৎপাদনমুখী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রনয়ণে শিক্ষা: উৎপাদনমুখী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নে শিক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্যে শিক্ষার প্রভাব অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ যত শিক্ষিত হচ্ছে তার প্রভাব প্রভাব উন্নয়ন কর্মকান্ডে তত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১০) প্রযুক্তি, আধুনিকায়ন ও নগরায়ণকে ত্বরান্বিত করে: শিক্ষা, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, আধুনিকায়ন ও নগরায়ণকে ত্বরান্বিত করে। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং এর সুফল পেতে বেশি তৎপর এবং সক্ষম থাকে। উন্নত নগর জীবনের প্রতিও বাংলাদেশের জনগণের আগ্রহ বেশি। ফলে শিক্ষা আামদের সমাজের আমূল পরিবর্তন করে সনাতন ব্যবস্থা থেকে আধুনিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করতে প্রতিনিয়ত সহায়তা করছে।

সামাজিক পরিবর্তনে গণমাধ্যমের ভূমিকা

আধুনিক ও শিক্ষত সমাজের অনিবার্য উপাদান ও অনুষঙ্গ হচ্ছে গণমাধ্যম। অনেক গবেষক গণমাধ্যমকে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পঞ্চম স্তম্ভ বলে অভিহিত করেন। গণমাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য, সংবাদ, ধারণা, বার্তা, বিনোদন একসাথে বহুসংখ্যক মানুষের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয় যা সমাজ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গণমাধ্যমের প্রধান কয়েকটি প্রচার মাধ্যম হচ্ছে:

ক. শ্রবণ মাধ্যম: রেডিও বা বেতার সর্বোৎকৃষ্ট শ্রবণ মাধ্যম।
খ. মুদ্রিত মাধ্যম: সাময়িকী, সংবাদপত্র, হ্যান্ডবিল, বুলেটিন, বই-পুস্তক ইত্যাদি।
গ. শ্রবণ-দর্শন মাধ্যম: টিভি, কম্পিউটার, ইউটিউিব ইত্যাদি।
ঘ. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম: ফেসবুক, টুইটার, মোবাইল ফোনের হোয়াটস্এ্যাপ, ইমো, ম্যাসেঞ্জার ইত্যাদি।
ঙ. সনাতন মাধ্যম বা গণসম্বোধন (জনসমাবেশে বক্তৃতা)।

সামাজিক পরিবর্তনে গণমাধ্যমে ভূমিকা সর্বজন স্বীকৃত। বস্তুত আধুনিক সমাজে কেউ গণমাধ্যম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে হালনাগাদ তথ্য পেতে আগ্রহী মানুষের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গণমাধ্যম মানুষের এ চাহিদা পূরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। জনমত সৃষ্টির প্রধান বাহন হচ্ছে গণমাধ্যম। জনসচেতনতা তৈরিতেও গণমাধ্যামের বিকল্প নেই। যেকোনো সমাাজিক সমস্যা নিয়ে গণমাধ্যমে আলোচনা হলে তা থেকে দ্রুত উত্তরণ লাভ করা যায়। বিদ্যমান ব্যবস্থার পরিবর্তন, সংস্কার, নতুন আইন বা বিধি প্রণয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে গণমাধ্যম বিশেষ দায়িত্ব পালন করে। সন্ত্রাস, দুর্নীতি, অনিয়মের বিরুদ্ধে গণমাধ্যমের সোচ্চার ভূমিকা সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত কার্যকর। মাদকদ্রব্য, চোরাচালান, যৌন হয়রানি, প্রশ্ন ফাঁস, পরীক্ষায় নকল প্রবণতা প্রভৃতি অপরাধ রোধে গণমাধ্যম শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। সমাজে এর প্রত্যক্ষ এবং ইতিবাচক প্রভাব অনস্বীকার্য। মুক্ত গণমাধ্যম, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সুশাসন, নারীর ক্ষমতায়ন, মানবাধিকার রক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে গণমাধ্যম সোচ্চার ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে একটি সমাজের অগ্রগতি, সমৃদ্ধি এবং উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। বস্তুত একটি সনাতন সমাজের সাথে আধুনিক সমাজের পার্থক্য গড়ে দেয় গণমাধ্যম। সুতরাং সামাজিক পরিবর্তনে গণমাধ্যমের ভূমিকা খুবই শক্তিশালী।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষা ও গণমাধ্যমে ভূমিকা একটি সারণিতে উপস্থাপন করুন। **সময় : ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

শিক্ষা সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে কাজ করে। শিক্ষার মূল দর্শন হচ্ছে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করা। সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষা নিজেই একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পাশাপাশি শিক্ষা এমন অনেক উপাদান সৃষ্টি করে যেগুলো সামাজিক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। গণমাধ্যমও সামাজিক পরিবর্তনে তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদুরপ্রসারী ভূমিকা রাখে। গণমাধ্যম বিভিন্ন সচিত্র প্রচারের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের ধারাকে অনেকাংশে এগিয়ে নিয়ে যায়। গণমাধ্যমে বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণে সমাজে দুর্নীতি ও অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পায়। শুধু তাই নয় শিক্ষার গুণগতমান পরিবর্তনের কারণে মানুষের জীবনযাত্রা তথা সামাজিক ক্ষেত্রে নতুন ভাবধারা সূচিত হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোনটি সমাজব্যবস্থায় অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা পালন করে?
ক) শিক্ষা খ) নগরায়ণ
গ) শহরায়ন ঘ) শিল্পায়ন

২। শিক্ষা মানুষের কিসের উন্নয়ন ঘটায়?
ক) প্রাকৃতিক খ) পেশাগত
গ) আচরণের ঘ) 'খ' ও 'গ' উভয়

৩। নীচের কোনটি গণমাধ্যমের অংশ হিসেবে কাজ করে?
ক) নৌকা খ) টেলিভিশন
গ) মঞ্চ ঘ) ফুটবল

৪। তথ্য প্রচারের মাধ্যমকে কী বলা হয়?
ক) গণমাধ্যম খ) বিপ্লব
গ) গণতন্ত্র ঘ) স্বাধীনতা

পাঠ-৯.৪ বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে প্রযুক্তির প্রভাব
Impacts of Technology in Social Change of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে প্রযুক্তির প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিক পরিবর্তন, প্রযুক্তি, উৎপাদন প্রযুক্তি, পরিবহন প্রযুক্তি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, প্রভাব।

প্রযুক্তির ধারণা

সাধারণত প্রযুক্তি হচ্ছে এমন এক ধরনের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যা যান্ত্রিক উপায়ে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ প্রকৌশলবিদ্যা বা প্রায়োগিক বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে অর্জিত জ্ঞান হচ্ছে প্রযুক্তি। প্রযুক্তিগত জ্ঞান চর্চায় যান্ত্রিক উপকরণের (machinery and devices) ব্যবহার রয়েছে। প্রযুক্তির ব্যবহার ও বিকাশে শিল্পভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অর্থাৎ সনাতন উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উত্তরণের মূলে কাজ করেছে মানুষের প্রযুক্তিগত জ্ঞান। প্রযুক্তির জ্ঞান যত বিকশিত হয়েছে উৎপাদন ব্যবস্থাও তত উৎকর্ষ লাভ করেছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও প্রযুক্তির যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। প্রযুক্তিগত জ্ঞান প্রয়োগের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো:

ক) উৎপাদন প্রযুক্তি: একটা সময় পর্যন্ত উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল সনাতনী এবং মানুষ দ্বারা পরিচালিত। যেমন তাঁতে কাপড় বোনা। শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে সেখানে একসময় মেশিনের মাধ্যমে বস্ত্র উৎপাদন ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ ঘটলো। বস্ত্রকলের সনাতন যন্ত্রপাতির উন্নয়নের পাশাপাশি ডিজিটালাইজেশন, অটোমেশন ইত্যাদি প্রযুক্তি উৎপাদনে অভূতপূর্ব বিপ্লব সাধন করেছে। উৎপাদন খাতে রোবটিক প্রযুক্তিও এখন পরিচিত বিষয়।

খ) পরিবহন প্রযুক্তি: উৎপাদনের ন্যায় পরিবহন খাতেও প্রযুক্তির বৈপ্লবিক প্রয়োগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। ঘোড়ায় টানা এক্কা গাড়ির স্থানে আজ সুপারসনিক বিমান। 'ফ্লাইং কার' এখন আগ্রহের বিষয়। অটোমেশন যুগ পার হয়ে গাড়ি চালাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রোবটের ব্যবহার এখন সময়ের দাবি মাত্র।

গ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি: গত তিন দশকে প্রযুক্তির সর্বাধিক উন্নতি সাধিত হয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ খাতে। এনালগ টেলিফোন এখন যাদুঘরে। বাংলাদেশে মোবাইল ফোন প্রযুক্তির এখন চতুর্থ প্রজন্ম (ফোর জি)। ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, হোয়াটসএ্যাপ, ইমো, ম্যাসেঞ্জার, মোবাইল ব্যাংকিং এখন দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে গিয়েছে।

সামাজিক পরিবর্তনে প্রযুক্তির প্রভাব

প্রযুক্তির একটি অবিস্মরণীয় বিপ্লব বিশ্বের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অঙ্গনে ব্যাপকতর পরিবর্তনের দিকে ধাবিত করেছে। সারাবিশ্বের সাথে যোগাযোগ রক্ষায় বাংলাদেশেও প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমাগত বাড়ছে। স্বভাবতই বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে প্রযুক্তিবিদ্যারও অগ্রগতি ঘটছে। উন্নয়নের অন্যতম নিয়ামক বা উপাদান হলো তথ্য প্রযুক্তি। কৃষি এবং অকৃষি উভয় খাতেই আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। সম্প্রতি বাংলাদেশে ই-কৃষি চালু হয়েছে যার সুফল সকল স্তরের কৃষক এবং ভোক্তা ভোগ করছে। একই সঙ্গে কৃষি উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বাজারজাতকরণের একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। তবে উৎপাদন এবং পরিবহন প্রযুক্তি অপেক্ষা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সমাজ জীবনে বেশি প্রভাব বিস্তার করছে। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হলো কম্পিউটার ও ইন্টারনেট। এ দুই প্রযুক্তির সম্মিলিত রূপ হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। উৎপাদন, পরিবহন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রকেই স্পর্শ করে। সমাজের সর্বত্র এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে এ প্রভাব সব সময় ইতিবাচক না ও হতে পারে। প্রযুক্তির বেশ কিছু নেতিবাচক প্রভাবও সমাজে পরিলক্ষিত হয়। এখানে সামাজিক পরিবর্তনে প্রযুক্তির প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১) যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তন: যোগাযোগ ক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তি যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করেছে। দুই ধমক পূর্বেও অফিসিয়াল যোগাযোগের জন্য যেখানে ফাইল পত্র নির্বাহ করতে মাসের পর মাস সময় লাগতো তা এখন অতি অল্প সময়ে বা কয়েক মিনিটে বা তার চেয়েও কম সময়ে সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন তথ্য আদান প্রদানের প্রয়োজনীয় উপাত্ত এবং

ফাইলসমূহ ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে স্থানান্তর করা হচ্ছে অতি অল্প সময়ে। এসবের ফলে একদিকে যেমন সময়ের অপচয় রোধ হচ্ছে অন্যদিকে যোগাযোগের গতিশীলতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে যা সার্বিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ফলে সমাজ দ্রুত প্রযুক্তি নির্ভরতার দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস পাচ্ছে।

২) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি: প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে অল্প জনবল দিয়ে অধিক কাজ করা সম্ভবপর হচ্ছে। ফলে কর্মী প্রতি ব্যয় কমেছে এবং এখন অল্প ব্যয়ে কর্মীর কাছ থেকে অনেক বেশী করে উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। ফলে বিনিয়োগ কম লাগছে এবং কর্মী ব্যবস্থাপনা সহজ হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে যা কার্যত অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৩) ই-কৃষি: কৃষি উন্নয়নে তথ্যও যোগাযোগ প্রযুক্তি নব দিগন্তের সূচনা করেছে। কৃষি তথ্য, গবেষণা ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে তথ্য প্রযুক্তি বিশেষ ভূমিকা রাখছে। আবহাওয়া, ফসল বপন ও পরিচর্যা, সার প্রয়োগের তথ্য, রোগবালাই দমন ইত্যাদি কৃষি তথ্য অনলাইনের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে কৃষকেরা জানতে পারছে; যা উৎপাদন বৃদ্ধি ও পণ্য বাজারজাত করতে সহায়তা করছে।

৪) ই-কমার্স: অনলাইন যোগাযোগ ব্যবস্থায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনাময় দিক হলো ই-কমার্স। ই-কমার্স হচ্ছে পণ্য কেনাবেচা ও আর্থিক লেনদেনের ইলেকট্রনিক সংস্করণ। ফলে অর্থনৈতিক লেনদেন ও বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় উদ্যোগের পথ সুগম হচ্ছে।

৫) ই-ব্যাংকিং: ব্যাংকিং একটি দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল মাইলফলক। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে ব্যাংকিং যাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও লেনদেন তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর হওয়ায় ব্যাংকের কর্মদক্ষতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাংকগুলো ব্যাংকিং সেবা অনলাইনে এটিএম বুথের মাধ্যমে দিন রাত ২৪ ঘন্টা লেনদেনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ফরেন রেমিটেন্স পাঠানোর ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি এনেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এ সবই অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বড় ধরনের ভূমিকা রাখছে।

৬) ই-গভরনেন্স: সরকারি অনেক ধরনের সেবা অনলাইনে হচ্ছে। ফলে সরকারের নাগরিক সুবিধা জনগন সহজেই নিতে পারছে এবং সরকারের জবাবদিহিতা বাড়ছে। দেশের উন্নয়নের জন্য এ বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

৭) সচেতনতা বৃদ্ধি: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে ঘরে ঘরে তথ্য পৌঁছে যাচ্ছে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে। ফলে ঘরে বসেই মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে জানতে পারছে যা তাদেরকে অধিকার বিষয়ে সচেতন করে তুলছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সুশাসন, নারীর ক্ষমতায়ন, মানবাধিকার রক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি হচ্ছে।

৮) নারীর ক্ষমতায়ন: নারীর ক্ষমতায়নেও তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। প্রযুক্তির মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে । অনেকে ঘরে বসেই উপার্জন করতে পারছেন। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার পাশাপাশি অধিকার সচেতনতা এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন সংস্থার সহায়তা কামনা (হতে পারে ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে) করে নারী সমাজ নিজেদের সক্ষমতা অর্জন করতে পারছেন।

৯) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জনমত তৈরি: ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম জনমত তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মূলধারার গণমাধ্যম কোনো বিষয়কে কম গুরুত্ব দিলেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এটি অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাপক প্রচার পেতে পারে।

১০) বিনোদন: তথ্য প্রযুক্তি মানুষের বিনোদনের ক্ষেত্রেও ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করছে। আবহমান গ্রামীণ লোকজ সংস্কৃতি অনেকটাই হারিয়ে গিয়েছিলো কিন্তু বর্তমানে আবার প্রযুক্তির কারণে ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, পথ নাটক, যাত্রা, পুঁথি,জারি-সারি, যাত্রাপালা অনেকটাই সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। হলে গিয়ে সিনেমা দেখার আগ্রহও দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। ইউটিউব কিংবা মেমোরি কার্ডের মাধ্যমে সুবিধাজনক সময়ে পছন্দমত বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানসমূহ উপভোগের সুযোগ রয়েছে।

১১) আউটসোর্সিং: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে কর্মসংস্থানের বিষয়টিও নতুন মাত্রা পেয়েছে। এখন মানুষ অনলাইনে ঘরে বসেই অনেক কাজ করতে পারছে, ফলে অনেক কাজের ক্ষেত্রেই কর্মস্থলে বা অফিসে আসার প্রয়োজন হচ্ছে না। এতে করে বিনিয়োগকারীদের পক্ষে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে দূরে থেকেও কর্মসংস্থান করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে অনলাইন-

ভিত্তিক এক বিশাল কর্মীবাহিনী গড়ে উঠেছে, যারা প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে কাজ করছে। এতে কর্মী ব্যয় একদিকে কমছে অন্যদিকে বিভিন্ন স্থানে কর্মী বা কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে। এর ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নতুনমাত্রা যুক্ত হচ্ছে।

১২) শিক্ষাক্ষেত্রে: তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষাকে অত্যাধুনিক এবং গতিশীল করেছে। ঘরে বসেই বিশ্বের নামিদামী লাইব্রেরির বইপুস্তক পড়া যাচ্ছে। অনলাইন বা ই-লার্নিং এবং ই-বুক ব্যবহার করে উচ্চশিক্ষা এখন জনপ্রিয়। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা অনলাইন হওয়ায় দূর দূরান্ত থেকে সব ধরনের যোগাযোগ অনেকটা সহজ হয়ে গিয়েছে। পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হয় অনলাইনে। এতে ভোগান্তি যেমন হ্রাস পেয়েছে, তেমনি কমেছে খরচ ও সময়ের বিড়ম্বনা। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি আশীর্বাদ হিসেবে পরিগণিত।

১৩) চিকিৎসা ক্ষেত্রে: তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাকেও উন্নত, সাশ্রয়ী ও কার্যকরী করেছে। মানুষ ঘরে বসেই অনেক সময় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসাও পরামর্শ গ্রহণ করতে পারছে। ডাক্তারগণও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সঠিক রোগ নির্ণয় করে ফলপ্রসু চিকিৎসা দিতে পারছে। নতুন নতুন দূরারোগ্য ব্যাধির কারণ জানাসহ এসব রোগের কার্যকরী ঔষধ তৈরিও সম্ভব হচ্ছে। ফলে একদিকে যেমন সময় ও অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে, অন্যদিকে সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে তথ্য প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব: আগেই বলা হয়েছে, প্রযুক্তির কিছু নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে। প্রযুক্তি কিছু মানুষকে বেকার করে দেয়। প্রযুক্তির বিশ্বায়নের ফলে ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি আক্রান্ত হয়। পর্ণোগ্রাফি মহামারী আকারে বিস্তার ঘটে। হ্যাকিংসহ দুর্নীতি ও প্রতারণার নতুন নতুন ক্ষেত্র চালু হয়েছে। পারিবারিক সম্পর্ক শিথিল হয়ে সমাজে নৈতিক অবক্ষয় দেখা দিচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সময়ের অপচয় করার ফলে উৎপাদনশীল কিংবা সৃষ্টিশীল কাজে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটে। পাশাপাশি অনেকের মানসিক এবং স্নাকুবিক অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি হচ্ছে যা সমাজে নানা ধরনের অপরাধ প্রবণতাও সৃষ্টি করছে। অনেকে ফেসবুককে নেশাদ্রব্যের সাথে তুলনা করেন। বস্তুত ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম একটি 'ডিজুস প্রজন্ম' তৈরি করছে যাদের অনেকে নৈতিক মূল্যবোধ ও আচরণবিধির কোনো তোয়াক্কা করে না। অন্য সংস্কৃতির নাটক, সিরিয়াল, সিনেমা ইত্যাদি সহজলভ্য হওয়ায় অনেকে নিজ সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। নাটক, সিরিয়াল কিংবা সিনেমায় বিভিন্ন ঘটনা দেখে অনেকে সন্ত্রাস, নেশা করা, ধর্ষণসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রযুক্তি কীভাবে সমাজে প্রভাব বিস্তার করে তার একটি তালিকা করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে প্রযুক্তি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির কার্যকরী ভূমিকার সুফল হিসেবে বাংলাদেশের উৎপাদন, পরিবহন ও তথ্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হচ্ছে। প্রযুক্তি শুধু আশীর্বাদ হিসেবে প্রতিফলিত হচ্ছে তাই নয় অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। সুতরাং প্রযুক্তি সামাজিক পরিবর্তনে অনন্য ভূমিকার অধিকারী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়–
ক) বনায়নের খ) বিশ্বায়নের গ) সামাজিক কুসংস্কারের ঘ) সংস্কৃতির

২। সামাজিক পরিবর্তন বলতে বোঝায়–
ক) দালান কোঠা বৃদ্ধি খ) সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন গ) শিল্পায়ন ঘ) নগরায়ণ

৩। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি-
ক) উন্নয়নশীল দেশ খ) উন্নত দেশ গ) রাজতান্ত্রিক দেশ ঘ) স্বৈরতান্ত্রিক দেশ

পাঠ-৯.৫ বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাব
Impacts of Globalization in Social Change of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিক পরিবর্তন, বিশ্বায়ন, প্রভাব, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, বাজার ব্যবস্থা।

বিশ্বায়নের ধারণা

একবিংশ শতাব্দীর আলোচ্য বিষয় হলো বিশ্বায়ন। অনেকের মতে, এটা এমন একটি প্রক্রিয়া যা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির এক বিস্ময়কর বিকাশকে নির্দেশ করে। অনেকে মনে করেন, বিশ্বব্যাপী একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পুঁজিবাদের সংযোজন হল বিশ্বায়ন। বিশ্বায়ন সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে একটি বিশ্ব-গ্রামের (Global village) অধিবাসী করে তুলেছে। এটি বিশ্বের জনগোষ্ঠীকে এনেছে কাছাকাছি আর করছে পরস্পর পরস্পরকে উপর নির্ভরশীল। বিশ্বায়ন সম্পর্কে ম্যাকগ্রে (McGrew) বলেন, 'বিশ্বায়ন হলো হয় আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থার অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে বহুবিধ সংযোগ ও সম্পর্কের নিমিত্তক।' *Oxford Dictionary of Business* গ্রন্থে বলা হয়েছে, বিশ্বায়ন হল বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য বা সেবাসমূহের আন্তর্জাতিকরণের একটি প্রক্রিয়া। Andre Gunder Frank -এর মতে, 'বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া যেমন বাণিজ্য এবং কর্মসংস্থানের, অর্থনীতি তেমনই, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সম্পদ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করার প্রক্রিয়া যা পরস্পরকে প্রভাবিত করছে, আবার এগুলোর মাধ্যমে প্রভাবিত হচ্ছে।' আলব্রো (Albrow) বলেছেন, বিশ্বায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মধ্যে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। বস্তুত, বিশ্বায়ন হলো পুঁজিবাদ বা নব্য-উপনিবেশবাদের একটি অর্থনৈতিক কৌশল, যার মাধ্যমে শিল্পোন্নত দেশগুলো অনগ্রসর দেশের উপর তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারে। বিশ্বায়নে তিনটি মৌলিক উপাদান পরিলক্ষিত হয়। এগুলো হচ্ছে, ক) পণ্যের অবাধ প্রবাহ, খ) তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং গ) শ্রমের অবাধ প্রবাহ।

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাব

বাংলাদেশে বিশ্বায়নের প্রভাব বা ফলাফল ইতিবাচক ও নেতিবাচক।

ক) ইতিবাচক ফলাফল

১. মুক্তবাজার অর্থনীতির সম্প্রসারণ: মুক্ত বাজার অর্থনীতি সম্প্রসারণের ফলে এই দেশের সাথে বিশ্বের অন্যদেশের নির্ভরশীলতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এর ফলে বাংলাদেশের উৎপাদিত পণ্য অপর দেশে যেতে বাধা নেই। বিভিন্ন দেশের দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে মুক্ত বাজার অর্থনীতির সম্প্রসারণ ঘটেছে।

২. প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি: বিশ্বায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে প্রতিযোগিতার সুযোগ পাচ্ছে। সব ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা থাকায় বাংলাদেশের মানুষের জীবনে অবদান রয়েছে ও সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩. যোগাযোগ ব্যবস্থা: বিশ্বায়নের অন্যতম ইতিবাচক দিক হল যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়ন। অতীতের সেই সনাতন যানবাহনের জায়গায় আধুনিক প্রযুক্তি ভিত্তিক দ্রুত গতিসম্পন্ন যানবাহনের ব্যাপকতা বাংলাদেশে লক্ষ্য করার মতো। এতে আভ্যন্তরীণ ও বহি:বিশ্বের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা অধিক গতিশীল হয়েছে।

৪. কর্মসংস্থান সৃষ্টি: বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশে বহুমুখী কোম্পানী এবং বিদেশী বিনিয়োগ বেড়ে গেছে। শিল্পখাতে ব্যাপক বিনিয়োগ থাকায় প্রচুর পরিমাণে শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে। ফলে দেশ বিদেশে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

৫. অর্থনৈতিক স্বাধীনতা: বিশ্বায়ন বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বহুলাংশে গতিশীল করেছে।

৬. শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন: বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এখন সমগ্র বিশ্বের সমমানের এবং এদেশে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর হার বৃদ্ধির মাধ্যমে দক্ষ জনসমস্পদ তৈরি হচ্ছে যার ফলে দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানের পথ সুগম হচ্ছে। বিশ্বায়নের ফলে একদেশ থেকে অন্যদেশে মেধাবীরা পড়ালেখার সুযোগ পাচ্ছে। তারা উন্নত প্রযুক্তির সাথে দিনদিন পরিচিত হচ্ছে। এতে বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষার হার ও গুণগত মান বাড়ছে।

৭. ব্যাংকিং ও বীমা ব্যবস্থার উন্নয়ন: ব্যাংকিং ও বীমা ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশ্বায়নের ভূমিকা অপরিসীম। সহযোগিতার মাধ্যমে ব্যাংকিং ও বীমা ব্যবস্থার অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে। উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে লেনদেন থেকে শুরু করে ব্যাংক ও বীমার নানাবিধ ই-ক্যাশ, ই-ব্যাংকিং ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ফলে সেবার মান অনেকাংশে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সময়, শ্রম ও অর্থের অপচয় হ্রাস পাচ্ছে।

৮. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন: বিশ্বায়নের ইতিবাচক প্রভাব বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উপরও পড়ছে। এ ধরনের প্রক্রিয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থার সংস্কার সাধিত হয়েছে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটছে। উন্নত প্রযুক্তিতে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

৯. মানব সম্পদের মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন: মানব সম্পদ রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বিশ্বায়ন মানব সম্পদ উন্নয়ন ও রপ্তানিতে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের জনসংখ্যা এক সময় ছিলো বোঝাস্বরূপ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে খেন বাংলাদেশের জনগণের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে। ফলে তারা ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে অন্যদেশে গমন করছে বিনিময়ে দেশীয় অর্থনীতিতে বড় ধরনের অবদান রাখছে।

খ) বিশ্বায়নের নেতিবাচক ফলাফল

১. সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন: বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদশে সমাজ ব্যবস্থা অতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। পারিবারিক ভাঙ্গন, বিবাহ বিচ্ছেদ, বিচ্ছিন্নতা, প্রবীন সমস্যা, মাদকাসক্তি, সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ দিন দিন বেড়ে চলেছে।

২. পরিবেশ বিপর্যয়: বিশ্বায়নের প্রভাবে এদেশের পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। বহুজাতিক কোম্পানীগুলো অধিক মুনাফা লাভের আশায় তাদের অধিকাংশ শিল্প কারখানা ও ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট বাংলাদেশসহ অন্যান্য অনুন্নত দেশে স্তাপন করেছে অথচ বিজ্ঞানসম্মতভাবে বর্জ্য পরিশোধন করা হচ্ছে না। পাশাপাশি নগরায়ন ও শিল্পায়ন পরিবেশ দূষণ করছে।

৩. নব্য ঔপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার: বিশ্বায়ন প্রকিয়া ব্যবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য, বাজার ব্যবস্থাপনা, তথ্য প্রযুক্তি ও তাদের উন্নত পণ্য সামগ্রী রপ্তানীর নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশসহ অনুন্নত বিশ্বে নব্য ঔপনিবেশবাদ ধাচে বাজার ও মার্কেট সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের কাজ করছে।

৪. জীবনযাত্রায় অস্থিরতা: বিশ্বায়নের ফলে পশ্চিমা বিশ্বের তথাকথিত উন্নত জীবনযাত্রা, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রভাব জনজীবনে এক ধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। ফলে মানুষের মূল্যবোধের পরিবর্তন হচ্ছে। মূল্যবোধের পরিবর্তনের ফলে সামাজিক অনুশাসন হ্রাস পাচ্ছে।

৫. স্থানীয় উদ্যোগ বিকশিত হতে পারছে না: মুক্তবাজার অর্থনীতির ফলে উন্নত বিশ্ব বাংলাদেশসহ প্রান্তিক দেশগুলোতে অবাধে পণ্য, প্রযুক্তি ও সেবা বিপনন করে। এক্ষেত্রে স্থানীয় বা দেশীয় উৎপাদন, প্রযুক্তি ও সেবাখাত প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে রুগ্ন হয়ে পড়ছে, হারিয়ে যাচ্ছে।

৬. অপসংস্কৃতির বিস্তার: বিশ্বায়ন সমগ্র বিশ্বকে সমন্বয় ও সমন্বিত করেছে। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতিতে পার্থক্য রয়েছে। কোনো দেশের সংস্কৃতি অন্য একটি দেশের জন্য অপসংস্কৃতি বলে প্রতীয়মান হতে পারে। কিন্তু বিশ্বায়নের ফলে অনেক সময় অপসংস্কৃতি আমাদের দেশের মূলধারার সংস্কৃতিতে ঢুকে পড়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

৭. অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে: বিশ্বায়নের সুফল পাচ্ছে এককভাবে শিল্পোন্নত ধনী দেশগুলো। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া উন্নত দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করে। ফলে ধনী দেশগুলোর সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দরিদ্র দেশগুলো ক্রমশ দরিদ্র হতে থাকে। এক্ষেত্রে ধনী দেশগুলো বহুজাতিক সংস্থার মাধ্যমে নিজ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটায়। অনুন্নত দেশগুলো প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে ধনী দেশের বাজারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিশ্বায়নের সুফল ও কুফল সম্পর্কে একটি সারণি প্রস্তুত করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

আধুনিক বিশ্বের এক অনিবার্য বাস্তবতা হচ্ছে বিশ্বায়ন। বিশ্বায়ন সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। এ প্রভাব কখনো ইতিবাচক আবার কখনো নেতিবাচক। তবে বিশ্বায়ন মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক গতি এনে দিয়েছে। একদেশ থেকে অন্যদেশে যোগাযোগ, যাতায়াত, পরিবহন, আমাদানি-রপ্তানী, তথ্যের আদান-প্রদান অনেক সহজতর হয়েছে। সর্বোপরি উন্নয়নের চাকা দ্রুতগতিতে ঘুরছে। তবে সে উন্নয়ন সর্বজনীনি বা সমতাভিত্তিক নয়। দরিদ্র দেশগুলো এক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে। ফলে বিশ্বায়ন বিরোধী জনমতও ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বিশ্বকে এক পাল্লায় এনেছে–
- ক) স্যাটালাইট
- খ) ডিসএন্টিনা
- গ) ইন্টারনেট
- ঘ) ওয়ারলেস

২। বিশ্বায়ন হচ্ছে–
- ক) উপনিবেশবাদ
- খ) বিশেষ অর্থনৈতিক কৌশল
- গ) মানুষে মানুষে সমতা
- ঘ) কোনোটি নয়

৩। বিশ্বায়নের ক'ধরনের প্রভাব রয়েছে?
- ক) দু'ধরনের
- খ) তিন ধরনের
- গ) চার ধরনের
- ঘ) পাঁচ ধরনের

৪। বিশ্বায়নের ফলে–
- ক) উষ্ণায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে
- খ) রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে
- গ) মানুষের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে
- ঘ) অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে

ইউনিট-৯ এর উত্তরমালা:

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১	:	১। গ	২। ঘ	৩। খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.২	:	১। গ	২। ক	৩। খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৩	:	১। ক	২। ঘ	৩। খ	৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৪	:	১। খ	২। খ	৩। ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৫	:	১। গ	২। খ	৩। ক	৪। ঘ
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	:	১। ক	২। খ	৩। ক	৪। ঘ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১। সামাজিক পরিবর্তন বলতে আমরা বুঝি সমাজ কাঠামোর-

ক) পুনর্গঠন খ) পৃথকীকরণ

গ) একত্রীকরণ ঘ) বিকেন্দ্রীকরণ

২। কোনটি বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম কারণ?

ক) রাজনৈতিক ব্যবস্থা খ) উৎপাদন ব্যবস্থা

গ) পারিবারিক ব্যবস্থা ঘ) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা

৩। বিশ্বায়নের প্রভাবে জনগণের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে-

(i) সচেতনতা

(ii) মূল্যবোধ

(iii) অসচেতনতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে–

(i) শিল্প-কল-কারখানার সম্প্রসারণ

(ii) প্রযুক্তির বিকাশ

(iii) অর্থনৈতিক অগ্রগতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

খ) সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন

অহনা, তৃষা ও প্রিয়া তিন বোন। বাবার মৃত্যুর পর তিনজনই শহরে এসে সোয়েটার কারখানায় কাজ করে। বেতন পেয়ে মার কাছে টাকা পাঠাতে খুব কষ্ট হতো। কখনো কারো হাতে, আবার কখনো মানি-অর্ডার করে টাকা পাঠাতো। মায়ের হাতে এই টাকা পৌঁছুতে কয়েক দিন সময় লেগে যেতে। কিছুদিন পর থেকে তারা মোবাইলে টাকা পাঠাতে থাকে। তিন বোনের উপার্জন দিয়ে তারা মহল্লায় একটি বই-খাতা-কলম বিক্রয়ের একটি দোকান দেয়। পরে সেখানে একটি ফটোকপি মেশিন, কম্পিউটার স্থাপন করে। তারা ব্যবসা শুরু করে। এক সময় তারা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

ক) বিশ্বায়ন কী? ০১

খ) সামাজিক পরিবর্তন বলতে কী বুঝায়? ০২

গ) উদ্দীপকে অহনাদের টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়াকে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনের কোন ধারণাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করুন। ০৩

ঘ) 'অহনাদের পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনেরই উৎকৃষ্ট উদাহরণ' কীভাবে? ব্যাখ্যা করুন। ০৪

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা
Social Problem of Contemporary Bangladesh

ইউনিট ১০

বর্তমান যুগ বিশ্বায়নের যুগ। মুক্তবাজার অর্থনীতি, যোগাযোগে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে ব্যাপক প্রসার, প্রযুক্তি ভিত্তিক শিক্ষার প্রসার, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিকাশ ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশ এখন বিশ্ব ব্যবস্থার অন্যতম অংশীদার। বাংলাদেশ একইসাথে অনেক সমস্যা এবং সম্ভাবনার দেশ। তবে অর্থনীতি ও প্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে নতুন নতুন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল বেকার সমস্যা, জনসংখ্যা সমস্যা, যৌতুক, নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, মাদকাসক্তি ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমানে সামাজিক সমস্যায় নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে অন্যান্য ক্ষেত্রে সমস্যার ধরন পাল্টেছে এবং নতুন নতুন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে নারীর সামাজিক নিরাপত্তাজনিত সমস্যা, যৌন নিপীড়ন, সাইবার অপরাধ এবং কর্মজীবী নারীর সমস্যা, জেন্ডার বৈষম্য, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ, বার্ধক্য সমস্যা বিশেষভাবে আলোচিত। নারীরা কর্মক্ষেত্রে এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি জড়িত। ফলে কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তাজনিত সমস্যা দেখা দিয়েছে। একই ভাবে নারীর অবাধ চলাফেরার ক্ষেত্রে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে এমনকি পারিবারিক পরিবেশেও নারীর প্রতি সহিংসতা, নির্যাতন ও শোষণ প্রক্রিয়ার ধরনে পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে সাইবার অপরাধ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। প্রায় সবার হাতে হাতে স্মার্টফোন। দুর্বৃত্তরা অপরাধ সংঘটন করে তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছে। আবার প্রযুক্তি ব্যবহার করে অপরাধী শনাক্তকরণ সহজ হয়েছে। সামগ্রিকভাবে সাম্প্রতিক বাংলাদেশে সামাজিক অপরাধের ধরন, প্রকৃতি এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থায় নতুনত্ব এবং বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হচ্ছে।

	ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ১০.১ : সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ও এর প্রকৃতি
পাঠ- ১০.২ : বাংলাদেশে নারীর সামাজিক নিরাপত্তাজনিত সমস্যা:
যৌন নিপীড়ন, সাইবার অপরাধ এবং কর্মজীবী নারীর সমস্যা
পাঠ- ১০.৩ : জেন্ডার বৈষম্য, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ
পাঠ- ১০.৪ : বাংলাদেশের বার্ধক্য সমস্যা

পাঠ-১০.১ সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ও এর প্রকৃতি
Social Problems of Contemporary Bangladesh and Its Nature

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;

	মুখ্য শব্দ	সামাজিক সমস্যা, সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাসমূহ

সামাজিক সমস্যা হলো এমন এক ধরনের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি যা স্বাভাবিক সামাজিক জীবনাচরণের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং নাজুক সামাজিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে মোকাবেলার ক্ষেত্রে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। সামাজিক সমস্যা সমাজের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে, স্বাভাবিক চলাফেরায় বিঘ্ন ঘটায় এবং সমাজের মানুষের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

বাংলাদেশ অনেক সম্ভাবনা আর বহু সমস্যার দেশ। এদেশে প্রতিনিয়ত উদ্ভুত সামাজিক সমস্যাসমূহের ধরন ও পড়ড়কৃরি পরিবর্তন হচ্ছে। সামাজিক সমস্যার নেতিবাচক প্রভাব প্রতিনিয়ত দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে। একটা সামাজিক সমস্যা সামাল দিতে দিতে আরেকটি সমস্যার সৃষ্টি হয়। মাঝে মাঝে সামাজিক কারণে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যা অন্যান্য সামাজিক সমস্যাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। যেমন-অধিক জনসংখ্যার সমস্যা তীব্র বেকারত্বের সৃষ্টি করে। সামাজিক সমস্যা মূলত সমাজেরই সৃষ্টি এবং সমাজের মাঝেই এর সমাধান নিহিত। এক সময় বাংলাদেশের যেসব সামাজিক সমস্যা ছিলো এখন সেগুলোর প্রভাব কমে গেলেও আবার নতুন নতুন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। পূর্বে যেসব সামাজিক সমস্যা সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে সেগুলোর মধ্যে-জনসংখ্যা সমস্যা, অধিক জনসংখ্যার প্রভাব, বেকারত্ব, দারিদ্র্য, মাদকাসক্তি, দুর্নীতি ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমানে এসব সমস্যাগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার প্রকৃতি পাল্টেছে, আবার সাথে নতুন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। যেমন-সুশাসনের অভাব আগেও ছিল এখনো আছে, তবে এর প্রকৃতি এবং পরিধি পাল্টেছে। সাম্প্রতিককালে আরও যেসব সামাজিক সমস্যা যুক্ত হয়েছে তা হলো, বাংলাদেশে নারীর সামাজিক নিরাপত্তাজনিত সমস্যা; যেমন যৌন নিপীড়ন, সাইবার অপরাধ এবং কর্মজীবী নারীর সমস্যা, জেন্ডার বৈষম্য, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ, বার্ধক্য সমস্যা ইত্যাদি। সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাসবাদ, মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ ইত্যাদি বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সামাজিক সমস্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। বর্তমানে কিছু কিছু সামাজিক সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছ। তার মধ্যে সাইবার অপরাধ অন্যতম। এর প্রধান শিকার নারী। শ্লীলতাহানি কিংবা গোপন যৌন সম্পর্কের ছবি বা ভিডিও অনলাইনে প্রকাশ করার ঘটনা প্রায়ই শোনা যায়। সাম্প্রতিককালে বার্ধক্য সমস্যা নতুন মাত্রা পেয়েছে। যেমন- কর্মস্থলের দূরত্ব, মানুষের নগরমুখিতা, সামাজিক দায়বদ্ধতার অভাব, ব্যক্তিস্বার্থপরতার প্রভাব বৃদ্ধি, অণু পরিবারের প্রতি আগ্রহ, যৌথ বা বর্ধিত পরিবারে অনীহা ইত্যাদি কারণে বার্ধক্য সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। তবে সাম্প্রতিককালে যেসব সামাজিক সমস্যা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে তার মধ্যে দুর্নীতি, জঙ্গিবাদ অন্যতম।

সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি

সময়ের সাথে সাথে বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাসমূহ তার প্রকৃতি পাল্টেছে। নিম্নে সাম্প্রতিক সময়ের বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হলো:

(১) **নগর কেন্দ্রিক সামাজিক সমস্যা:** পূর্বে বাংলাদেশের বেশির ভাগ সামাজিক সমস্যার মূল উৎস ছিল গ্রামীণ সমাজ। কিন্তু সাম্প্রতিককালের সামাজিক সমস্যাসমূহ মূলত শহর বা নগর কেন্দ্রিক। যেমন- অধিক জনসংখ্যার প্রভাব গ্রামীণ জনপদের তুলানয় শহুরে জনপদে বেশি। আর এই অধিক জনসংখ্যার চাপে শহরে ট্রাফিক জ্যামের মতো আরো ভয়াবহ

সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়াও বেকারত্ব বাড়ছে, বস্তি এলাকায় অপরাধমূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে, স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিচ্ছে ইত্যাদি।

(২) **অপরাধকর্মে অধিকহারে শিক্ষিত এবং কমবয়সী জনগোষ্ঠীর সংশ্লিষ্টতা:** সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে সংঘটিত অপরাধসমূহে শিক্ষিত এবং কমবয়সী জনগোষ্ঠীর ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা বৃদ্ধি। উদাহরণস্বরূপ ১ জুলাই ২০১৬ সালে ঢাকার গুলশানে একটি বিদেশি রেস্তোরাঁয় যে হামলা হয়েছিলো তাতে দেখা যায় যে, সেখানে অল্প বয়সী কিছু শিক্ষিত যুবক এই হামলায় অংশ নিয়েছে।

(৩) **বৈশ্বিক সমস্যার সাথে যুক্ততা:** সাম্প্রতিককালের সামাজিক সমস্যাসমূহ কখনো কখনো অনেক বৈশ্বিক পরিস্থিতির সাথে যুক্ত হচ্ছে। যেমন-জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ এবং উগ্র মৌলবাদ মূলত একটি বৈশ্বিক সমস্যা। এসব বৈশ্বিক সমস্যার সাথে বাংলাদেশের অনেক বিপথগামী গোষ্ঠী যুক্ত হয়ে বাংলাদেশেও নানা ধরনের সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করছে। উন্নত বিশ্বের অণু পরিবার বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ বাংলাদেশের মানুষকে অনেক বেশি প্রভাবিত করার কারণে বাংলাদেশের বার্ধক্য সমস্যার মতো নতুন সামাজিক সমস্যা দিন দিন বাড়ছে।

(৪) **অসীম চাহিদার প্রভাব:** বাংলাদেশে দুর্নীতি একটি সামাজিক সমস্যা এবং একটি প্রকট সামাজিক চ্যালেঞ্জও বটে। এই সমস্যার মূল হলো মানুষের অসীম চাহিদা, অস্বাভাবিক ভোগের মানসিকতা, সম্পদশালী হওয়ার তীব্র প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।

(৫) **সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে জন সচেনতার অভাব:** কিছু কিছু বিষয়ে মানুষের মাঝে সচেতনতা কম লক্ষ্য করা যায়। যেমন- আগে বাল্য বিবাহ একটি প্রকট সামাজিক সমস্যা ছিলো। বর্তমানেও এই সমস্যা কিছুটা রয়ে গেছে এবং কিছু কিছু শিক্ষিত মানুষও এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত।

(৬) **সাম্প্রতিক সামাজিক সমস্যার সমাধান যোগ্যতা:** আর যাই হোক, পূর্বের সামাজিক সমস্যাসমূহের মতো সাম্প্রতিককালের সামাজিক সমস্যাসমূহও জন সচেনতা সৃষ্টি ও রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাধান যোগ্য।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালের সামাজিক সমস্যা এবং এর প্রকৃতি সম্পর্কে জানলাম।

	শিক্ষার্থীর কাজ	**বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি সম্পর্কে লিখুন। সময়: ৫ মিনিট।**

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে পূর্ব থেকেই অনেক সামাজিক সমস্যা ভরপুর। সাম্প্রতিককালে আরও অনেক নতুন নতুন সামাজিক সমস্যা যুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশে নারীর সামাজিক নিরাপত্তাজনিত সমস্যা: যৌন নিপীড়ন, সাইবার অপরাধ এবং কর্মজীবী নারীর সমস্যা, জেন্ডার বৈষম্য, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ, বার্ধক্য সমস্যা, জঙ্গীবাদ ইত্যাদি। তবে সাম্প্রতিককালের সামাজিক সমস্যাগুলোর সাথে বৈশ্বিক পরিস্থিতির একটা বিশেষ যোগাযোগ রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি সামাজিক সমস্যা নয়?
(ক) দুর্নীতি (খ) জঙ্গিবাদ (গ) বেকারত্ব (ঘ) দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি

২। বাংলাদেশে সামাজিক সমস্যা বর্তমানে কোন কেন্দ্রিক?
(ক) নগর (খ) গ্রাম (গ) চরাঞ্চল (ঘ) উপরের কোনটিই নয়।

৩। সাম্প্রতিককালের বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে নিচের কোনটির প্রভাব রয়েছে?
(ক) বিশ্বায়ন (খ) উন্নয়ন (গ) শিক্ষা (ঘ) উপরের কোনটিই নয়।

পাঠ-১০.২ বাংলাদেশে নারীর সামাজিক নিরাপত্তাজনিত সমস্যা:

যৌন নিপীড়ন, সাইবার অপরাধ এবং কর্মজীবী নারীর সমস্যা

Social Safety Problems of Women in Bangladesh:

Sexual Harassment, Cyber Crime and Problems of Employed Women

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে যৌন নিপীড়ন জনিত সমস্যা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে সাইবার অপরাধ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন; এবং
- বাংলাদেশে কর্মজীবী নারীর সমস্যা বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	যৌন নিপীড়ন, সাইবার অপরাধ, কর্মজীবী নারীর সমস্যা।

যৌন নিপীড়ন

১৯৯৫ সালে চীনের বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে নারীর প্রতি যেকোনো ধরনের সহিংসতাকে নারী-পুরুষের মধ্যে অন্যতম সমস্যা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। উক্ত সম্মেলনে নারীর প্রতি সহিংসতা বলতে সাধারণত জোরপূর্বক নারীর উপর শারীরিক, মানসিক অথবা যৌন নির্যাতনকে বুঝায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, অসম সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, নারীর প্রতি বৈষম্য, এবং সহিংসতার মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। নানা অজুহাতে নারীকে গৃহে অন্তরীণ রাখা, অসম উত্তরাধিকার ভোগ করা, পরিবার এবং সামজে নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করা, পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি নারীর উপর সহিংসতার একেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। আর এসব সহিংসতা থেকেই লিঙ্গীয় সহিংসতা বা যৌন নিপীড়ন জনিত সমস্যার উদ্ভব। পারিবারিক পরিমন্ডল থেকে শুরু করে সামাজিক পরিমন্ডলে, কর্মস্থলে, গণ-পরিবহনে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, গৃহশিক্ষকের মাধ্যমে নারীরা যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। বর্তমান সময়ে তথ্য প্রযুক্তির নেতিবাচক ব্যবহারের কারণে নারীর প্রতি যৌন নিপীড়নের মাত্রা বেড়েই চলছে। নারীর কোন দুর্বল দিকের সুযোগ নিয়ে অথবা কোনো গোপন বিষয় ফাঁস করার ভয় দেখিয়ে এক শ্রেণির বিকৃত মানসিকতার পুরুষ নারীর উপর যৌন নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে বিশেষ করে ফেইসবুকে বিভিন্ন ভাবে নারীকে যৌন নিপীড়নের ঘটনা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। তবে এ ধরনের ঘটনাসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে ঘটছে এবং এর ব্যাপকতা ততটা ভয়াবহ নয়। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে গ্রাম থেকে শহর এ নারীর প্রতি যৌন নিপীড়নের মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু নারী এখন আর আগের মতো ঘরের কোণে বসে নেই, ঘরের বাইরে পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। তবে এখানে নারীরা নিরাপদ না, সহকর্মী বা কর্মস্থলের কর্তাব্যক্তির দ্বারাও কখনো কখনো নারীরা যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এছাড়াও স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গৃহ শিক্ষকের হাতেও নারীর প্রতি যৌন নিপীড়নের মতো ঘটনা বিক্ষিপ্তভাবে ঘটছে। দেশে পর্যাপ্ত আইন থাকলেও প্রভাবশালীদের ক্ষমতা, রাজনৈতিক প্রভাব, আইন প্রয়োগে জটিলতা, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, পুরুষের ব্যক্তিগত বিকৃত স্বার্থ ইত্যাদি কারণে নারীর প্রতি যৌন নিপীড়নের মাত্রা বেড়েই চলছে।

সাইবার অপরাধ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যাপক প্রসারে সাইবার অপরাধ দিনে দিনে অতিমাত্রায় পৌঁছেছে। মানুষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ভাল কাজের চেয়ে খারাপ কাজে বেশি ব্যবহার করছে। এখন ইচ্ছা করলেই স্মার্টফোনে ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করে কোনো মানুষ পর্ণোছবি দেখতে পারে, যার প্রভাব তার মানসিকতার উপর পড়ে। এসব ঘটনায় প্রভাবিত হয়ে সে নানা রকম অপরাধমূলক কাজে হচ্ছে হয়। পুরুষ নিয়ন্ত্রিত ও মানসিকতাসম্পন্ন সমাজে নারীকে মিডিয়াতে একটি পণ্যে পরিণত করা হয়েছে। অশ্লীল বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে নানা ধরনের যৌন আবেদনময়ী বিজ্ঞাপন মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। অনেক সময় নারীকে ফাঁদে ফেলে অথবা কোনো আপত্তিকর ভিডিও ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়ার ভয় দেখিয়ে নারীকে যৌন নিপীড়নে ঠেলে দেওয়া হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহে কোনো নারীর ছবি দেখা

মাত্রই বিভিন্ন মন্তব্যে ভরে যায়। এসব মন্তব্যের মধ্যে আপত্তিকর বা অশ্লীল মন্তব্যের সংখ্যা কম নয়। অনেক সময় এক ধরনের তরুণ তার বান্ধবী বা প্রেমিকার সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্ক গড়ে তুলে তা ক্যামেরা বন্দি করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

কর্মজীবী নারীর সমস্যা

কর্মজীবী নারীর সমস্যা বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে পুরুষের পাশাপশি নারীদেরকেও সরকারি চাকরিতে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করা হলেও নানা কারণে তা বাধার মুখে পড়ে এবং নারীরা পিছিয়ে পরেছে। বাংলাদেশের সংবিধান পুরুষের পাশাপাশি নারীকে বিভিন্ন সরকারি চাকরি এবং কর্মে অংশগ্রহণের সমান সুযোগ সুবিধা প্রদানের বিধান থাকলেও কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে অনেক সময় ঘরের বাইরে চাকরি করতে অনীহা প্রকাশ করে। আধুনিককালে নারী শিক্ষার প্রসার, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদির ফলে নারীরা ঘরের বাইরে অর্থ উপার্জনকারী হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু এসব কর্মক্ষেত্রে নারীর জন্য রয়েছে অন্য ধরনের ভোগান্তি। নারীরা তাদের সহকর্মী, বন্ধু-বান্ধব, কর্মস্থলের কর্তাব্যক্তি বা অন্য কোনো পুরুষ দ্বারা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এসব নির্যাতন মানসিক এবং লিঙ্গীয়। কখনও অশ্লীল কথা বার্তার মাধ্যমে অথবা শারীরিক স্পর্শের মাধ্যমে, আবার মানসিক চাপ বৃদ্ধিকারক মন্তব্য করে নারীকে নির্যাতন করা হয়। বিবাহিত কর্মজীবী নারীদেরকে কখনও কখনও স্বামী বা পরিবারের অন্য সদস্যদের গঞ্জনা শুনতে হয় শুধু চাকরি করার জন্য। নানাবিদ মানসিক চাপের মধ্যে তারা তাদের চাকরি বা কাজ চালিয়ে যায়। এছাড়াও রাস্তা ঘাটে, ট্রেনে, বাসে বা অন্য কোনো জায়গায় নারীরা নানা ধরনের সমস্যা মোকাবলো করে থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বাংলাদেশে নারীদের প্রতি যে ধরনের সহিংসতা হয় সে সম্পর্কে জানলাম। নারীর প্রতি সহিংসতা বিশ্বব্যাপি মোটামুটি একই ধরনের। তারপরেও আমাদের দেশের মেয়রা শত বাধা অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের নারীর প্রতি যৌন নিপীড়নের ধরনগুলো চিহ্নিত করুন **সময়: ৫ মিনিট।**

সারসংক্ষেপ

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি, অসম সামাজিক অবস্থান এবং সুযোগ সুবিধার কারণে বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। নানা অজুহাতে নারীকে গৃহে অন্তরীণ রাখা, অসম উত্তরাধিকার ভোগ করা, পরিবার এবং সামজে নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করা ইত্যাদি নারীর প্রতি সহিংসতার গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। আধুনিককালে নারী শিক্ষার প্রসার, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদির ফলে নারীরা ঘরের বাইরে অর্থ উপার্জনকারী হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু এসব কর্মক্ষেত্রে নারীর জন্য রয়েছে অন্য ধরনের ভোগান্তি। কর্মজীবী নারীরা অনেক সময় তাদের সহকর্মী বা কর্তাব্যক্তি দ্বারা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বেইজিং সম্মেলন কত সালে অনুষ্ঠিত হয়?
(ক) ১৯৮০ সালে (খ) ১৯৮৫সালে (গ) ১৯৯৫ সালে (ঘ) ২০০৫ সালে

২। বেইজিং সম্মেলন কততম নারী সম্মেলন"
(ক) প্রথম (খ) দ্বিতীয় (গ) তৃতীয় (ঘ) চতুর্থ

৩। সাইবার অপরাধের মূল উপাদান কোনটি?
(ক) ইন্টারনেট (খ) ছুরি (গ) বই (ঘ) কলম

৪। কখন থেকে বাংলাদেশের নারীদেরকে চাকরিতে প্রবেশের জন্য উৎসাহিত করে আসছে?
(ক) স্বাধীনতার আগে থেকে (খ) স্বাধীনতার পর থেকে (গ) ব্রিটিশ আমল থেকে (ঘ) পাকিস্তান আমল থেকে

পাঠ-১০.৩ জেন্ডার বৈষম্য, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ

Gender Discrimination, Dowry and Early Marriage

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে জেন্ডার বৈষম্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে যৌতুকের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করতে পারবেন; এবং
- বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	জেন্ডার বৈষম্য, যৌতুক, বাল্যবিবাহ।

জেন্ডার বৈষম্য

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এদেশের নারীরা পাশ্চাত্যের নারীদের চেয়ে কম সুযোগ-সুবিধা, ক্ষমতা এবং স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। তবে একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের নারীরা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রগতি সাধন করেছে। আমাদের বাঙালি সংস্কৃতিতে নারী-পুরুষের নিজ নিজ ভূমিকা পালনের বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতামত রয়েছে। এই মতামতের কারণেই সমাজে নারী পুরুষের ভূমিকা পালনে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আর সেটি শুরু হয় পরিবারেই শিশুর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে শিশুকে ছেলে আর মেয়ে শিশুতে রূপান্তর করে এবং তার কাজে ভিন্নতা সৃষ্টি করে যা সমাজ ছেলেকে ছেলের মত এবং এর সাথে মেয়েকে মেয়ের মত আচরণ শিখতে অনুপ্রাণিত করে থাকে। এসব কিছুই ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতা বিকাশে সারা জীবনে প্রভাব সৃষ্টি করে। মূলত সমাজের প্রত্যাশা অনুসারে মানুষ তাদের শিশুকাল থেকে নিজেদেরকে তৈরি করে নেয় যা পরবর্তী জীবনে জেন্ডার ভূমিকা পালনে সহায়তা করে যা জেন্ডার বৈষম্যের সৃষ্টি করে। এ ধরনের ব্যবস্থা বহুদিন সমাজে বিদ্যমান থাকার কারণে এক সময় সামাজিক অনুষ্ঠানে-প্রতিষ্ঠানে রূপান্তিরত হয়।

আমাদের সমাজে জেন্ডার বৈষম্যের অন্যতম কারণ হলো ছেলে শিশুর উপর গুরুত্ব বেশি দেয়া। বংশগতি রক্ষা, সম্পত্তির উত্তরাধিকার রক্ষা এবং সম্পত্তি রক্ষা ইত্যাদি কারণে ছেলে সন্তানকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই শিশু জন্মের পূর্বেই অনেক সময় সনোগ্রাফির মাধ্যমে লিঙ্গ চিহ্নিত করে মেয়ে শিশুর ভ্রূণ নষ্ট করে দেওয়া হয়। আধুনিক শিক্ষার প্রসারে এধরনের প্রবণতা বাংলাদেশে হ্রাস পেলেও একেবারে কমে যায়নি।

সমাজে নারী-পুরুষ সমান মৌলিক সুবিধা ভোগ করতে পারে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েরা বঞ্চনার শিকার হয়। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ পর্যায়ের নির্দিষ্ট সময়ের পর বাংলাদেশের অনেক মেয়ে পড়ালেখা থেকে ঝড়ে পড়ে। অনেক সময় মেয়েদেরকে পড়ালেখা করানো ভাল চোখে দেখা হয় না। পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রেও মেয়েদেরকে বঞ্চনার শিকার হতে হয়। অনেক গ্রামীণ পরিবারে মেয়েদেরকে পুরুষের পরে খাবার গ্রহণ করতে হয়ে। পরিবারে ছেলে শিশু থাকলে তার খাবারের দিকে যতটা খেয়াল রাখা হয় মেয়েদের বেলায় তেমনটা রাখা হয় না। এখনও মেয়েদেরকে মনে করা হয় যে তারা শক্ত বা ভারী কাজ করতে পারবে না। তাই তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কাজ থেকে বিরত রাখা হয়। যেমন- পুলিশ বা সেনাবাহিনীর মতো কোনো জায়গায় চাকরি করলে পরিবার বা সমাজে অনেকের আপত্তি থাকে। সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রে মেয়েরা বৈষম্যের শিকার হয়। স্বামী বা পিতা কারো সম্পত্তিতেই মেয়েরা তাদের ন্যায্য অংশীদারিত্ব পায় না।

যৌতুক সমস্যা

যৌতুকের ধারণা বাংলাদেশে নতুন নয়। এটি বাংলাদেশে অনেক দিন ধরে চলে আসছে। বাংলাদেশের অন্যান্য সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে যৌতুক অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে আরোপিত অযাচিত ব্যবস্থা যা যৌতুক প্রদানকারী মেয়েও পরিবারকে নাজুক অবস্থায় ফেলে। বাংলাদেশের হিন্দু এবং মুসলিম উভয় সমাজে যৌতুক এখন সামাজিক প্রথায় পরিণত

হয়েছে। পূর্বে যৌতুক ভয়াবহ রূপ ধারণ করলেও যৌতুক নিরোধ আইন প্রনয়ণ ও প্রয়োগের কারণে এখন আগের মতো এতো বেশি নাজুক পরিস্থিতি নেই।

বাংলাদেশে যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি যা মানুষের স্বাভাবিক সামাজিক জীবনযাপনে বাধার সৃষ্টি করে। যৌতুক শুধু সমস্যা নয়, বরং নানাবিধ সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। যেমন- যৌতুকের কারণে নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতন, পারিবারিক কলহের মতো সামাজিক সমস্যা প্রতিনিয়তই বেড়ে চলছে। গস্থামীণ বাংলাদেশের প্রায় ৮০ ভাগ নারীই যৌতুক সংক্রান্ত বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার। বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশে যৌতুক প্রথা প্রচলিত। এ কারণগুলো হলো:

(ক) দারিদ্র্য
(খ) অশিক্ষা
(গ) সম্পদের লোভ-লালসা
(ঘ) বহু দিনের রেওয়াজ
(ঙ) নারীর অধিকার খর্ব করা
(চ) কন্যাসন্তান জন্মদান
(ছ) নারীর প্রতি অসম আচরণ
(জ) সামাজিক অসমতা ইত্যাদি

আইন ও সালিস কেন্দ্রের (আসক) ২০১৬ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী যৌতুকের কারণে ১২৬ জন নারী হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছে, ১০৬ জন নারী শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে, ৪ জন নারী নির্যাতনের কারণে আত্মহত্যা করেছে। তবে সমগ্র বাংলাদেশের বহু নন রিপোর্টিং কেইস এই পরিসংখ্যানে নেই। যৌতুকের ফলাফল নিম্নরূপ:

(ক) পারিবারিক কলহ বৃদ্ধি
(খ) সন্তানের সামাজিকীকরণ সমস্যা
(গ) মৃত্যু
(ঘ) আত্মহত্যা
(ঙ) স্বাভাবিক সামজিক সম্পর্ক ব্যাহত
(চ) জেন্ডার বৈষম্য সৃষ্টি
(ছ) শারীরিক নির্যাতন বৃদ্ধি ইত্যাদি

১৯৮০ সালে বাংলাদেশে যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন পাস করা হয়। ২০০০ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন আইন বলবৎ করা হয়। ২০০৩ সালে এই আইনটি সংশোধন করা হয়।

বাল্যবিবাহ

বাল্য বিবাহ বাংলাদেশে একটি বড় সমস্যা। ১৯২৯ সালে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ভারতীয় সমাজে বাল্য বিবাহ রোধ করা হয়। ১৯৮০ সালের আইনে বাল্য বিবাহের ক্ষেত্রে ছেলের বয়সকে ২১ বছরের নীচে এবং মেয়ের বয়সকে ১৮ বছরের নীচে ধরা হয়েছে। তবে বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে বাল্যবিবাহ হয়ে থাকে। নিম্নে এই কারণগুলো তুলে ধরা হলো:

(ক) **দারিদ্র্য:** বাংলাদেশে বিবাহ যোগ্য মেয়েকে অর্থনৈতিক বোঝা মনে করা হয়। তাই বিয়ের বয়স হওয়ার আগেই তাদেরকে বিয়ের পিড়িতে বসিয়ে দেওয়া হয়।

(খ) **অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা:** পিতার অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার কারণে বাংলাদেশের মেয়েদেরকে বাল্যকালেই বিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে।

(গ) **শিক্ষার অভাব:** বাংলাদেশে দারিদ্র্য পীড়িত ঘরের মেয়েরা আর্থিক অনটনের কারণে তাদের পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারে না। তাই বাল্যকালেই অধিকাংশ মেয়েকেই বিয়ে দিয়ে দিতে হয়।

(ঘ) **সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ও চাপ:** ঘরের বিবাহ যোগ্য মেয়ে থাকলে আমাদের দেশে অনবরত চাপ আসে মেয়ের বিয়ে দেয়ার জন্য। তাছাড়া নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠী তাদের উঠতি বয়সের মেয়েদের সামাজিক নিরাপত্তা দিতে পারে না।

(ঙ) **যৌন নিপীড়নের ভয়:** যৌন নিপীড়নের ভয়ে অনেক সময় পিতা-মাতা তাদের মেয়ে সন্তানকে বিয়ে দিয়ে থাকে।

বাল্যবিবাহের ফলাফল

(ক) যৌতুক প্রথাকে টিকিয়ে রাখা
(খ) মাতৃমৃত্যু হার বৃদ্ধি
(গ) জনসংখ্যা বৃদ্ধি
(ঘ) শিশু মৃত্যু হার বৃদ্ধি
(ঙ) শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে মেয়ে শিশুর ঝড়ে পরার হার বৃদ্ধি
(চ) মা এবং শিশুর স্বাস্থ্য ঝুঁকি বৃদ্ধি
(ছ) শিশুশ্রম বৃদ্ধি
(জ) শিশু পাচার ইত্যাদি।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশের নানা ধরনের সামাজিক সমস্যার মধ্যে জেন্ডার বৈষম্য, যৌতুক এবং বাল্যবিবাহ অন্যতম।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের জেন্ডার বৈষম্যের কারণগুলো জিহ্বিত করুন। **সময়: ৫ মিনিট।**

সারসংক্ষেপ

বাঙালি সমাজে নারী-পুরুষের নিজ নিজ ভূমিকা পালনে সামাজিকীকরণের প্রভাব সুস্পষ্ট। এই মতামতের কারণেই সমাজে নারী পুরুষের ভূমিকা পালনে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আর সেটি শুরু হয় পরিবারেই শিশুর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। সমাজে নারী-পুরুষ সমান মৌলিক সুবিধা ভোগ করতে পারে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েরা বঞ্চনার শিকার হয়। একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর বাংলাদেশের মেয়েদের পড়ালেখা থেকে ঝড়ে পড়ার হার অনেক বেশি। বাংলাদেশে যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি যা মানুষের স্বাভাবিক সামাজিক জীবনযাপনে বাধার সৃষ্টি করে। যৌতুক শুধু একটি সমস্যা নয়, বরং আরও অনেক সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। বাল্য বিবাহ বাংলাদেশে একটি বড় সমস্যা। ১৯৮০ সালের আইনে বাল্য বিবাহের ক্ষেত্রে ছেলের বয়সকে ২১ বছরের নীচে এবং মেয়ের বয়সকে ১৮ বছরের নীচে ধরা হয়েছে। তবে বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে বাল্যবিবাহের প্রবণতা পূর্বের তুলনায় কমলেও অব্যাহত রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাল্যবিবাহ রোধ আইন অনুযায়ী বিয়ের ন্যূনতম বয়স?
(ক) ছেলে ২১ মেয়ে ১৭ (খ) ছেলে ২০ মেয়ে ১৮
(গ) ছেলে ২১ মেয়ে ১৮ (ঘ) ছেলে ২৪ মেয়ে ১৮

২। আসক এর ২০১৬ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী কতজন নারী হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন?
(ক) ১২৬ জন (খ) ২২৬ জন
(গ) ১২৮ জন (ঘ) ১২৫ জন

পাঠ-১০.৪ বাংলাদেশে বার্ধক্য সমস্যা

Ageing Problem in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে বার্ধক্য সমস্যার কারণ ও এর প্রতিকারের উপায় আলোচনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	বার্ধক্য সমস্যা, প্রতিকার।

বার্ধক্য সমস্যা সাম্প্রতিককালের বাংলাদেশে একটি প্রকট সামাজিক সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এদেশের নানা রকম সামাজিক সমস্যার মত বার্ধক্য সমস্যাতে অনেক রকম সামাজিক উপাদান জড়িত। বার্ধক্য সমস্যা স্বাভাবিক জৈবিক ঘটনা যা প্রত্যেকটি মানুষের জন্য অপরিহার্য যার ফলে ক্রমান্বয়ে মানুষের শারীরিক সক্ষমতা হ্রাস পায় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে আসে।

বার্ধক্য সমস্যা

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটা ক্ষুদ্র অংশ (৬%) প্রবীণ, তবু তাদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাটি বেশ উল্লেখযোগ্য (৭২ লক্ষ) এবং প্রবীণদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশ উঁচু। ১৯১১, ১৯৫১, ১৯৮১ এবং ১৯৯১ সালে দেশে প্রবীণদের সংখ্যা ছিল (৬০ বছর এবং তদূর্ধ্ব) যথাক্রমে ১৩ লক্ষ ৭০ হাজার, ১৮ লক্ষ ৬০ হাজার, ৬০ লক্ষ ৫ হাজার এবং ৪০ লক্ষ ৯০ হাজার। ২০০০, ২০১৫ এবং ২০২৫ সালে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৭২ লক্ষ ৫০ হাজার, ১ কোটি ২০ লক্ষ ৫০ হাজার এবং ১ কোটি ৭৬ লক্ষ ২০ হাজারে দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। জনসংখ্যার এই বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তনের কারণে দেশের সমাজব্যবস্থা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ওপর মারাত্মক পরিণতি সৃষ্টি করেছে।

বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশে বার্ধক্য সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। যেমন-

(১) **প্রকট দারিদ্র্য:** বাংলাদেশে বার্ধক্য সমস্যার একটা বড় কারণ প্রকট দারিদ্র্য। এদেশের অনেক মানুষ তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়। দরিদ্রতার কারণে মানুষ মা-বাবা বা পরিবারের বয়স্কদের ভরণপোষণ করতে সক্ষম নয়। প্রকট দারিদ্র্যের কারণে বার্ধক্য সমস্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(২) **সামাজিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের ক্রম ক্ষয়িষ্ণুতা:** বাংলাদেশের সমাজে সামাজিক এবং ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের অনুভূতি আগের মতো নেই। মানুষ এখন সামাজিক বিষয়াবলির চেয়ে ব্যক্তিগত আনন্দ-উল্লাসের প্রতি বেশি নজর দেয় বিধায় পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের প্রতি সহানুভূতি হ্রাস পেয়েছে।

(৩) **আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন:** নগরায়ন এবং শিল্পায়নের প্রভাবে বাংলাদেশে দ্রুত আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। ফলে মানুষ নগরকেন্দ্রিক বাসস্থানের দিকে বেশি ঝুকে পড়েছে। তাই পরিবারের বয়স্ক সদস্যদেরকে রেখে মানুষ শুধু স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে নগরে বসবাস করছে। ফলে গ্রামে থেকে যাওয়া প্রবীণ স্বজনদের বিশেষ করে বাবা-মাকে দেখভাল করা সম্ভব হচ্ছে না।

(৪) **জনসংখ্যাগত পরিবর্তন:** জনসংখ্যাগত পরিবর্তন বার্ধক্য সমস্যাকে আরও বেশি প্রকট করছে। জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তনের ফলে মানুষের আয়ু পূর্বের তুলনায় বেড়েছে, তাই সমাজে বয়স্ক মানুষের সংখ্যাও বেড়েছে। আর এই বাড়তি জনসংখ্যার জন্য তেমন সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা না থাকায় বার্ধক্য সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলছে।

(৫) **পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব:** বিশ্বায়নের ফলে পশ্চিমা সংস্কৃতি এদেশের মানুষকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে। পশ্চিমা সংস্কৃতিতে পরিবার ব্যবস্থা আমাদের মতো কার্যকরী নয়, কিন্তু ঐসব দেশে সমাজের বয়স্ক সদস্যদের দেখাশোনার জন্য সরকারি বেসরকারি ব্যবস্থাপনা রয়েছে। আমাদের দেশে বয়স্কদের দেখাশোনার সরকারি বেসরকারি ব্যবস্থা না থাকার কারণে বার্ধক্য সমস্যা বাড়ছে।

(৬) **ঐতিহ্যবাহী যৌথ পরিবার ব্যবস্থার ভাঙ্গন:** শিক্ষার প্রসার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কর্মক্ষেত্রে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের উদ্ভব, চাকরির বদলি, ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা ইত্যাদি কারণে গ্রামীণ যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে ভেঙ্গে অনুপরিবারে রূপান্তর হচ্ছে। এসব কারণে পরিবারের লোকজন তাদের বয়স্ক সদস্যদের ভরণপোষণ বা পাশে রাখার জন্য সুযোগ হারাচ্ছে। তাই বাংলাদেশে বার্ধক্য সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বার্ধক্য সমস্যা প্রতিকারের উপায়

(১) **পরিবারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা:** বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের আয় সীমা বৃদ্ধি করা। ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্রের হার কমিয়ে আনা।

(২) **সামাজিক এবং নৈতিক শিক্ষার প্রতি জোর দেওয়া:** সকল সমাজ এবং সকল ধর্মে তার পিতা-মাতাকে দেখ ভালের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। তাই সামাজিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে বাবা-মা বয়োবৃদ্ধদের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার নানাবিধ সৃষ্টির পরিবেশ তৈরি করা দরকার।

(৩) **সরকারি বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ:** বার্ধক্য সমস্যা সমাধান কল্পে বয়স্ক সদস্যদেরকে পুনর্বাসনের জন্য ব্যাপক হারে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করলে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব।

(৪) **যৌথ পরিবার ব্যবস্থার ঐতিহ্য ধরে রাখা:** যৌথ পরিবার ব্যবস্থা বয়স্ক সদস্যদের জন্য আশীর্বাদ। তাই বার্ধক্য সমস্যা সমাধানের জন্য যৌথ পরিবার ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে হবে। যদিও ২০১৫ সালে বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত জাতীয় বেতন স্কেলে বর্ধিত পরিবারের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বেতন কাঠামো ঠিক করা হয়েছে। একটি পরিবারের ছয়জন সদস্য অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী, দুটি সন্তান এবং পিতা-মাতা কে মাথায় রেখে বেতন কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি বার্ধক্য সমস্যা সমাধানে একটি ভাল উদ্যোগ।

(৫) **সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি জোরদার:** বার্ধক্য সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি তৈরি করা যাতে পরিবার তার বয়স্ক সদস্যদেরকে দেখাশোনা না করলেও কোনো সমস্যার সৃষ্টি না হয়। বাংলাদেশে কিছু কিছু সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি সরকার ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বাংলাদেশের বার্ধক্য সমস্যার কারণ এবং প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে জানতে পারলাম। সামাজিক পরিবর্তনের কারণে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কাজের ধরনও পাল্টেছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধের বিকাশ, শিল্পায়ন, নগরায়ন ও নানাবিধ কাজের ধরনের কারণে মানুষ আর আগের মতো পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারে না। তাই এই সমস্যা সমাধান কল্পে কার্যকর ও সর্বাত্মক সরকারি বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি।

	শিক্ষার্থীর কাজ	**বাংলাদেশে বার্ধক্য সমস্যার কারণ ও প্রতিকারের উপায় চিহ্নিত করুন। সময়: ১০ মিনিট।**

সারসংক্ষেপ

এদেশের নানা রকম সামাজিক সমস্যার মধ্যে বার্ধক্য সমস্যা অন্যতম। বার্ধক্য সমস্যা স্বাভাবিক জৈবিক ঘটনা যা প্রত্যেকটি মানব দেহের জন্য অপরিহার্য যার ফলে মানুষের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে আসে। জনসংখ্যার এই বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তনের কারণে দেশের সমাজব্যবস্থা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ওপর মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনবে। বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশে বার্ধক্য সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করছে। আবার বিভিন্নভাবে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বার্ধক্য সমস্যা বাংলাদেশে কোন ধরনের সমস্যা?

(ক) সামাজিক (খ) অর্থনৈতিক (গ) রাজনৈতিক (ঘ) সাংস্কৃতিক

২। ২০১৫ সালের বাংলাদেশের জাতীয় বেতন কাঠামোতে পরিবারের কয়জন সদস্যের উপর গুরুত দেওয়া হয়েছে?

(ক) ৩ জন (খ) ৪ জন (গ) ৫ জন (ঘ) ৬ জন

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১ :	১। ঘ	২। ক	৩। ক		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.২ :	১। গ	২। ঘ	৩। ক	৪। খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৩ :	১। গ	২। ক			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৪ :	১। ক	২। ঘ			
চূড়ান্ত মূল্যায়ন :	১। খ	২। ক	৩। গ	৪। ক	৫। ঘ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১। সাম্প্রতিককালের অন্যতম সামাজিক সমস্যা হচ্ছে–
(ক) বাল্যবিবাহ (খ) সাইবার অপরাধ
(গ) দারিদ্র্য (ঘ) দুর্নীতি

২। বাংলাদেশে যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন পাস হয় কত সালে?
(ক) ১৯৮০ সালে (খ) ১৯৯০ সালে
(গ) ২০০০ সালে (ঘ) ২০১০ সালে

৩। বাংলাদেশে বার্ধক্য সমস্যার মূলে রয়েছে–
(i) দারিদ্য
(ii) গড়আয়ু বৃদ্ধি
(iii) আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন

সঠিক উত্তর কোনটি?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

দেশে পর্যাপ্ত আইন থাকলেও প্রভাবশালীদের ক্ষমতা, রাজনৈতিক প্রভাব, আইনের ফাঁক-ফোকর, আইনের অপপ্রয়োগ, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, ব্যক্তিগত স্বার্থ ইত্যাদি কারণে নারীর প্রতি যৌন নিপীড়নের মাত্রা বেড়েই চলছে।

৪। উদ্দীপকে কোন সমস্যার কথা বলা হয়েছে?
(ক) নারীর সামাজিক নিরাপত্তার অভাব (খ) দারিদ্র্য
(গ) দুর্নীতি (ঘ) বাল্যবিবাহ

৫। উদ্দীপকে সমস্যাকে কিভাবে প্রতিহত করা যায়?
(ক) আইনের কার্যকর প্রয়োগ (খ) নারীর ক্ষমতায়ন
(গ) সামাজিক প্রতিরোধ (ঘ) সবগুলোই সঠিক

খ) সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন

সাামজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক সমস্যারও পরিবর্তন হয়। আগে বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে ছিল বেকার সমস্যা, জনসংখ্যা সমস্যা, যৌতুক, নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, মাদকাসক্তি ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে নারীর সামাজিক নিরাপত্তাজনিত সমস্যা, যৌন নিপীড়ন, সাইবার অপরাধ, জেন্ডার বৈষম্য, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ, বার্ধক্য সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত।

১) বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সময়ের ৫টি সামাজিক সমস্যার নাম লিখুন ১

২) নারীর সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার ক্ষেত্রগুলো কি কি? ২

৩) উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশে পরিবর্তিত সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৩

৪) বাংলাদেশের বার্ধক্য সমস্যা নিরসনে আপনার সুপারিশমালা তুলে ধরুন। ৪